সুনীল কুমার ঘোষ

রাজা গেল রাজ্য গেল

ভ্যারাইটি পাব্লিশার্স
১৫/২-এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ :
১৭-ই ভাদ্র, ১৩৭৫

প্রকাশক:
রামধন চট্টোপাধ্যায়
১৫/২-এ কলেজ রো
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ:
গৌতম রায়

মুদ্রাকর:
গৌরচন্দ্র ভুক্ত
মুদ্রণ ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিমিটেড
১৫৪, তারক প্রামানিক রোড,
কলিকাতা—৬

দাম:
[illegible]ড়ি টাকা ॥

ভারতবর্ষকে ইংরেজরা দুটি মোটা ভাগে ভাগ করেছিল: একটি হচ্ছে ব্রিটিশ-ভারত আর একটি হচ্ছে দেশীয় রাজ্য যাদের সংখ্যা ছিল সাড়ে পাঁচশোর কাছাকাছি। ব্রিটিশ-সরকার ব্রিটিশ-ভারত শাসন করত প্রত্যক্ষ ভাবে, দেশীয় রাজ্যগুলি শাসন করত 'প্যারামাউনটসি'-র মাধ্যমে।

ব্রিটিশ-সরকার যখন ব্রিটিশ-ভারতকে দ্বিধা বিভক্ত ক'রে ভারতীয় য়ুনিয়ন আর পাকিস্তানের হাতে পৃথক পৃথক ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার চরম পরিকল্পনা গ্রহণ করল তখন তার কাছে যে সমস্যাটা সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল তা হচ্ছে এই প্যারামাউনটসি হস্তান্তরের সমস্যা। পনেরই আগস্টের পরে এই প্যারামাউনটসি লোপ পাবে, না, তার উত্তরাধিকারীদের হাতে দিয়ে যেতে হবে।

ভারতীয় নেতারা বললেন; ওই ক্ষমতা স্বাভাবিক ভাবে আমাদের ওপরেই বর্তাবে। রাজারা প্রতিবাদ করলেন, কভী নেহী। ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে আমাদের নাড়ির টান কোনদিনই ছিল না; সুতরাং আনাড়ির মত কথা বলে লাভ নেই। পনেরই আগস্টের পরে প্যারামাউনটসি লোপ পাবে। আমরা সব স্বাধীন হয়ে যাব।

ব্রিটিশ-সরকার কাউকেই অসন্তুষ্ট করল না। তারা বলল, পনেরই আগস্টের পরে নীতিগত ভাবেই প্যারামাউনটসি লোপ পাবে। কিন্তু তাই বলে দেশীয় রাজ্যগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত হবে না। ভারত অথবা পাকিস্তান—একটির সঙ্গে তাদের অন্তর্ভুক্ত হ'তেই হবে।

ব্রিটিশ-সরকারের এই নীতিতে স্বাধীন ভারতের সুবিধেই হল, কারণ বিগত একশ পঞ্চাশ বছর ধরে দেশীয় রাজ্যগুলির যে দায় আর দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের ঘাড়ের ওপরে চেপে বসেছিল প্যারামাউনটসি লোপ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই দায় আর দায়িত্ব থেকে ভারত-সরকার মুক্ত হল। নতুন ভাবে কাজ সুরু করার সুযোগ এল তার।

ব্রিটিশ-ভারতের স্বাধীনতার কথা নিয়ে "স্বাধীনতার হাতবদল" গ্রন্থটিতে আলোচনা করেছি। কেমন করে দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় য়ুনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হল এই গ্রন্থটিতে তারই কিছুটা আলোচনার চেষ্টা করেছি।

ভারতের ইতিহাসে উনিশ শো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ—এই দশটি বছর একটি অগ্নিগর্ভ যুগ। সংশয়, হত্যা, রাহাজানি, অবিশ্বাস, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল এদেশ। সমস্যা যতটা ছিল জটিলতা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। স্তূপাকার দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত না করে সহজ ভাষায় কাহিনীর আকারে মূল তথ্যগুলি পরিবেষণ করার চেষ্টা আমি এখানে করেছি।

এই কাহিনী গ্রন্থণায় অনেক মনীষী এবং চিন্তাশীলদের রচনার সাহায্য আমি নিয়েছি। আমার বিশ্বাস এমন আরও অনেক দলিল রয়ে গিয়েছে যাদের সাহায্য আমি চেষ্টা করেও গ্রহণ করতে পারি নি। যাঁদের সাহায্য আমি পেয়েছি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থটির অনেকখানি মাসিক উল্টোরথ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রকাশনায় যাঁরা আমাকে কেবল উৎসাহ নয়, তাগিদে তাগিদে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলেন তাঁরা হলেন উল্টোরথ পত্রিকার সর্বশ্রী প্রফুল্ল বসু, বিকাশ বসু, এবং দিলীপ নস্কর। এঁরা না থাকলে এ কাহিনী লেখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটির প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীরামধন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আর যাঁদের উৎসাহ আমি পেয়েছি তাঁরা হচ্ছেন আমার কবি ও সাহিত্যিক বন্ধু অধ্যক্ষ শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ডঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীনারায়ণ মণ্ডল। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন আরতি প্রকাশনীর সত্বাধিকারী শ্রীবীরেন নাগ এবং তুলি কলম-এর সত্বাধিকারী শ্রীকল্যাণ কুমার দত্ত যুগ্মভাবে।

কলিকাতা

স্থ. কু. ঘো.

যেখান থেকে এবং যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি

1. The Integration of the Princely states : V. P. Menon
2. Making of the Indian Princes : Edward Thompson
3. Kingdoms of Yesterday : Sir Arthur Lothian
4. Rise and Fulfilment of British Rule in India : Thompson and Garret
5. Indian States Problems : M.K. Gandhi
6. India in Transition : Sir Henry Cotton
7. Mission with Mountbatten : A Campbell-Johnson
8. The Last Days of British Raj : Leonard Mosley
9. The Last years of British India : Michael Edwards
10. Maharaja : Dewan Jarmani Dass
11. The Memoirs of Lord Ismay, Heinemann 1960
12. Jawaharlal Nehru's speeches, 1945-49
13. Auchinleck : John Connell
14. Autobiography : Pandit Nehru
15. Cabinet Mission Memorandum of 26th May, 1946
16. Life of Lawrence—Vol II
17. Butler Committees Report, February 1929
18. Federal Structure Committee Proceedings, 1931
19. Harijan No. 7th October, 1939—M. K. Gandhi
20. An Australian in India : R G. Casey
21. Captive Kashmir : Azih Beg
22. The Grand Hypocrisy : Shivapuri S. N.
23. The End of an Era : K. M. Munshi
24. My Public Life : Sir Mirza Ismail
25. India's Police Action in Hyderabad : V. V. Rao & V. R. Rao
26. The Partition of India : G. V. Subba Rao
27. The Nizam, the origin and Future of the Hyderabad State : Robert Paton Macanfiffe
28. Memoirs of Hyderabad Freedom Struggle : Swami Ramananda Tirtha
29. Hyderabad's Relations with the Dominion of India (Published by the Nizam Govt.)
30. Constitution of India— : Granville Austin

ডঃ অমিয়কুমার সেন

প্রিয়বরেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :

গ্রীণ হাউস মিস্ত্রি

কালনাগ

ব্রিটিশ ডিপ্লোম্যাসীর খুরে নমস্কার!

ও তো খুর নয়, একেবারে গো-খুরো সাপ। যে একবার ছোবল খেয়েছে তারই দফা বিলকুল রফা হয়ে গিয়েছে।

তা না হলে, ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে কেন?

ব্রিটিশরা বলে, আমাদের দোষ নেই দাদা, এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব তোমাদের। চেষ্টার তো ত্রুটি করিনি আমরা; তোমরাই আমাদের সমস্ত সদিচ্ছা কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেছ!

ত্রুটি যে করিনি তার প্রমাণ দেখ ওই ওয়াভেল সাহেব। গান্ধী আর জওহরলালকে তোয়াজ করার জন্যে তাঁর চাকরি আমরা খতম করে দিয়েছি। অথচ কারণটা ছিল কত তুচ্ছ!

যোলই আগস্টের দাঙ্গায় কলকাতায় লোক মরেছে মাত্র কয়েক হাজার, তাদের মধ্যে আবার বুড়ো, বুড়ী, আর শিশুর সংখ্যাই বেশি; আর জখম হয়েছে কয়েক লাখ। বৃহৎ ব্যাপারে ওরকম একটু আধটু অঘটন ঘটেই থাকে। তাতেই ওয়াভেল সাহেবের মত বীরপুরুষের আত্মা ভয়ে খাঁচাছাড়া হয়ে গেল। গান্ধীজি আর জওহরলালকে ডাকিয়ে এনে দু'চারটে অহেতুক কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন তিনি। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, মুসলীম লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার একটা সৎপ্রচেষ্টা না করলে বিপদ হবে।

ওরকম কড়া কথা হজম করার দিন চলে গিয়েছে। গান্ধীজি আর জওহরলালও তা হজম করলেন না। হাতে না মেরে ভাতে

মারলেন ওয়াভেল সাহেবকে, গোপনে-গোপনে কেব্‌ল গেল বিলেতে ; অত বড় চাকরি বিলকুল খতম হয়ে গেল সাহেবের।

সময়টা হল বিশে ফেব্রুয়ারী উনিশ শো সাতচল্লিশ সাল।

ব্রিটেনের সোসিয়ালিস্ট প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এটলি হাউস অফ কমন্স-এ ঘোষণা করলেন, উনিশ শো আটচল্লিশ সালের জুন মাসের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয় সরকারের হাতে ভারতবর্ষের শাসনভার চূড়ান্তভাবে তুলে দেওয়া হবে।

সেই সঙ্গে তিনি আরও জানালেন, ভারতবর্ষের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করেছেন ; এবং তাঁর জায়গায় অ্যাডমিরাল ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেন নতুন ভাইসরয় নিযুক্ত হয়েছেন।

মহামান্য রাজার আত্মীয় বলেই কেবল নয়, কাজের দিক থেকেও মাউণ্টব্যাটেন সাহেব নাকি ছিলেন পয়লা নম্বরের করিৎকর্মা। কথায়-বার্তায়, চালে-চলনে, ধাপ্পি-ধাপ্পায় একেবারে মনোমুগ্ধকর, ইংরিজিতে যাকে বলা হয় 'চার্মিং'। এটলি সাহেবের মতে ভারতীয় নেতাদের জাদু দিয়ে কাবু করার 'ন্যাক' রয়েছে তাঁর।

মাউণ্টব্যাটেন সাহেব অবশ্য প্রথমে কিছুটা গুঁই-গাঁই করেছিলেন। হাজার হোক জলচর তিনি। গভীর জলেই তিনি ভাসতে ভালবাসেন। দিল্লীর খটখটে শুকনো মাটিতে তিনি ঘাঁটি তৈরি করবেন কেমন করে? তাছাড়া, নেভীতে তাঁর 'সিনিয়রিটি' নষ্ট হবে যে।

এটলি সাহেব অভয় দিয়ে বললেন, সে-ব্যবস্থা আমরা করব।

কিন্তু ওই আটচল্লিশ সালের জুন মাস পর্যন্ত। তার বেশি দিল্লীতে থাকতে পারবেন না তিনি।—সাফ কথা জানিয়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওরই মধ্যে একটা হিল্লে করে দিয়ে দিল্লী ছেড়ে চলে আসবেন আপনি।—অভয় দিলেন এটলি সাহেব।

তথাস্তু। কিন্তু ভারতের আসল সমস্যাটা কী?

তার চেয়ে জিজ্ঞাসা করুন, কী নয়? তোজো, হিটলার, মুসোলিনীকে ঘায়েল করে দিলাম, আর ক'টা লেকচারবাজ মানুষ, যুদ্ধ চুলোয় যাক, যুযুৎসুর প্যাঁচ পর্যন্ত যারা জানে না, স্রেফ কথার পটকা ছুঁড়ে ব্রিটিশ-সিংহকে তারা ঘোল খাইয়ে দিল!

অর্থাৎ, ভারতবর্ষকে নিয়ে ব্রিটিশ-সিংহ একেবারে ল্যাজে-গোবরে হয়ে পড়েছে।

উঁহু, উপমাটা বোধ হয় ঠিক উৎরালো না। গোবরটা কোনরকমে ধুয়ে ফেলতে পারলেই ল্যাজ পরিষ্কার হয়ে যায়, কিন্তু এ বস্তু গোবর নয়, গঁদ। শিকারীরা অনেক সময় এমন সব গঁদ ব্যবহার করে, যা অতীব মারাত্মক। একবার গায়ে লাগলে পাখির চোদ্দপুরুষের সাধ্য কি যে নিজেকে সে ছাড়িয়ে নেবে? ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টায় যতই সে ঝটপট ক'রে কসরৎ দেখায়, ততই সে লটর-পটর ক'রে গঁদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে একেবারে গদগদ হয়ে যায়।

ব্রিটিশ সরকারেরও সেই অবস্থা। বল মা তারা দাঁড়াই কোথা! একদিকে আন্তর্জাতিক চাপ, অন্যদিকে ভারতীয় রাজনীতির তাপ— দুটিই খর রৌদ্রে খাইবার পাশের টেমপারাচারকেও ছাপিয়ে উঠেছে। এখন মান আর ইজ্জৎ নিয়ে এদেশ ছেড়ে কোন রকমে পালাতে পারলেই বাঁচোয়া।

কিন্তু গেরো আর কাকে বলে। এ যে একেবারে রামগেরো। গাঁটে গাঁটে জট পাকিয়ে বসে রয়েছে। এক পাশে ছাড়ে তো আর এক পাশে জড়িয়ে ধরে, সেই নাগপাশের বাঁধন থেকে ছাড়ান পাওয়ার মতলবেই মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একটা রফায় এলেন এটলি সাহেব।

কংগ্রেস আর মুসলীম লীগের দৌড় কতটা এবারে তা বোঝা যাবে।

শুধু কি কংগ্রেস আর মুসলীম লীগ? এ হরের নাটে বাটনা

বাটছে না কে ? শিখ বলুন, অনুন্নত সম্প্রদায় বলুন, হিন্দু মহাসভা বলুন, সব গোলে হরিবোল দিয়ে যাচ্ছে। গোদের ওপরে বিষফোঁড়া। সেই সঙ্গে হল্লা জুড়েছে আলালের ঘরের দুলালরা। দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই তারা ধেই-ধেই করে নাচছে, আর 'ইউরেকা', 'ইউরেকা', বলে চেঁচিয়ে বাজার মাৎ করে দিচ্ছে!

এদেরই জন্যে ডাই-হার্ড ব্রিটিশ কনজারভেটিভদের বারবার নিশীথ তন্দ্রা টুটে যাচ্ছে! দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠেছে তারা। এতদিন ধরে জামাই আদরে যাদের তারা পিঠে খাইয়ে এসেছে, স্বাধীনতার গুঁতো তাদের পিঠে সইবে তো ? দুর্ভাবনার কথা তো সেইখানে।

কিন্তু এরা কারা ?

এরাই হল ভারতের মহামান্য রাজন্যবর্গ: ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। ব্রিটিশ সরকারের পেয়ারের লোক। প্রায় নব্বুইটি বছর ধরে এদের জন্যে ওরা টন-টন দরদ খয়রাত করে এসেছে; নতুন পরিস্থিতিতে এদের কী হাল হবে তাই ভেবে ব্রিটিশ সরকারের কলিজা টন-টন করে উঠল।

ভারতে আসার আগে সৌজন্য দেখানোর জন্যে বাকিংহাম প্যালেসে মাউন্টব্যাটেন হাজির হলেন; রাজা ষষ্ঠ জর্জ কথায় কথায় তাঁকে নাকি বলেছিলেন, রাজাদের দিকে একটু নজর দিও।

তা তো দিতেই হবে। নজরানা ওরা তো কম দেয়নি। বেঁচে-বর্তে থাকলে আরও যে অনেক দেবে সেবিষয়েও সন্দেহ নেই কারও।

কিন্তু তাগিদটা কি কেবল ওই কারণেই ?

ব্রিটিশ সরকারের মনের গহ্বরে কী লুকিয়েছিল জানিনে; তবে একথাটা ঠিক যে ভারতের সমস্যা দিন দিন যে রকম জটিল হয়ে আসছিল তাতে সবচেয়ে দুর্ভাবনার কথা ছিল রাজাদের। এ রকম অবস্থা আর কিছুদিন চললে অদূর ভবিষ্যতে তাদের মাথায় ঘোল

চেলে দেশের লোকেরা মহানন্দে ঢোল পেটাতো। এতদিন ধরে দেশীয় রাজারা ব্রিটিশ সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে খুশ মেজাজে মৌতাত করেছে ; তারা ভাবতেও পারেনি যে তাদের সিংহাসনের তলায় ধ্বস নেমেছে। সেই ধ্বস বন্ধ করার জন্যে একটা কিছু করতে না পারলে নীতির দিক থেকে ব্রিটিশ সরকারকে ইতি হতে হবে যে।

কিন্তু ঠিক কোন পথে গেলে সাপও মরবে অথচ লাঠিটা ভাঙবে না, সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের ধারণাটা তখনও বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে নি।

উঠলেও, ভারতীয় নেতাদের কাছে তা ছিল রীতিমত অস্পষ্ট।

তার পেছনে কারণও ছিল যথেষ্ট।

সেই কারণটা হল দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক। উভয়ের মধ্যে গাঁটছড়াটা ঠিক কোথায় বাঁধা ছিল, আর তার জোরটাই বা কত, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দুপক্ষের কারও ছিল কি না সে বিষয়ে হলফ ক'রে কিছু বলা কষ্টকর। মোটামুটি ভাবে আমরা যেটুকু বুঝতে পারি সেটুকু হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সরকার মোট দুটো ভাগে ভাগ করেছিল। একটা হচ্ছে ব্রিটিশ-ভারত ; আর একটা হচ্ছে দেশীয় রাজ্য। ব্রিটিশ-ভারতের জনসাধারণ ব্রিটিশ সরকারের খাস তালুকের প্রজা। স্বাধীনতার সংগ্রাম করছে তারাই। কিন্তু দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণ ব্রিটিশ সরকারেরও প্রজা নয়। তারা প্রজা হচ্ছে দেশীয় রাজার। রাজারাই ছিল নিজেদের রাজ্যে সর্বময় কর্তা।

তবে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এইসব দেশীয় রাজ্যগুলির প্রত্যেকের একটি করে চুক্তি ছিল। তার নাম হচ্ছে 'প্যারামাউন্টসি'। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র যেমন অসংখ্য লিখিত আইনে বিকীর্ণ ; প্যারামাউন্টসি ঠিক সে রকম ছিল না। প্রয়োজন আর নিরাপত্তার খাতিরে উভয়ের মধ্যে অনেক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই চুক্তির জন্ম হয়েছিল বলেই

অনেকে মনে করেন। সেই চুক্তি রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিভূ ভাইসরয়-এর হাতে। ব্রিটিশ-ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ইংরাজ গভর্নর-জেনারেলও এখানে থাকবেন না। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গেও ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত চুক্তি শেষ হয়ে যাবে, ব্রিটিশ ভারতের মত তারাও কোকোটিয়ায় স্বাধীন হয়ে যাবে।

অথচ, কংগ্রেসের যে রকম মতিগতি দেখা যাচ্ছে (মানে, যাদের চোখ রয়েছে তারাই দেখতে পাচ্ছে), তাতে সে যে ওদের অত সহজে ছেড়ে দেবে সে সম্ভাবনা কম ; নেই বললেই হয়। কংগ্রেসের হুমকি এমনিতেই দিন দিন জোরদার হয়ে উঠছে ঃ কভী নেই দেউঙ্গা।

দেশীয় রাজ্যের রাজারাও পাল্টা হুমকি দিচ্ছে ঃ দেখ্ লেঙ্গে।

সমস্যাটা হল এইখানে।

কিন্তু ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি কি ভারতবর্ষের অংশ ? না, ওগুলি মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ?

ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখার মত।

ম্যাপ বা ভূগোলের পাতা খুললেই দেখতে পাবেন ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ ; কিন্তু একটি রাজ্য নয়। কোনদিনই তা ছিল না। ভিন্ন রুচি, ভিন্ন সংস্কৃতি আর আদব-কায়দা নিয়ে এক একটি রাজ্য তার নিজস্ব ঐতিহ্যে ইতিহাস রচনা করেছে। শাসনব্যবস্থার দিক থেকে এত বড় দেশটাকে কেউ কোনদিন 'এক সূত্রে' গাঁথতে পারেনি। অবশ্য, মাঝে-মাঝে সেরকম চেষ্টা যে একেবারে হয় নি সেকথা সত্যি নয় ; হয়েছিল। সে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। মগধের সম্রাট বিম্বিসার আর অজাতশত্রু সে চেষ্টা করেছিলেন। আরও তিনশো বছর এগিয়ে আসুন। মৌর্য রাজাদের আমলে সে-চেষ্টা আর একবার হয়েছিল। বিশেষ করে, মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের একটি মোটা অংশ তাঁর শাসনাধীনে এসেছিল। মৌর্য সাম্রাজ্য বেঁচেছিল প্রায় একশো

বছরের কাছাকাছি। মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পরে আবার সেই ছত্রাকার অবস্থা। আরও পাঁচশো বছর পরে এলেন চন্দ্রগুপ্ত, আর তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত। ভারতবর্ষের অজস্র ছোট আর মাঝারি রাজ্য তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র মেনে নিয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট বলে ঘোষিত হয়েছিলেন।

তারপরে আবার সেই ভাঙা হাটের খেলা। কেন্দ্রীয় শক্তি শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

আর হবে নাই বা কেন? সংহতি, রাজনৈতিক চেতনা আর জন-সংযোগ সে-যুগের ভারতবর্ষে ছিল না বললেই হয়। নিয়মিত সমর-বিভাগ নিয়ে তখন মাথা ঘামাত না কেউ। তখনকার দিনে রাজ শক্তির অর্থই ছিল রাজার শক্তি। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। শ্রেষ্ঠ রাজা পৃথিবীতে আর কটাই বা জন্মায়? জন্মালেও তাঁরা অমর নন। তাঁদের চোখ দুটি বুজে আসার পরই সব সাফ হয়ে যেত। এ যেন নদী মজে যাওয়ার পরে নিজের নিজের সীমানা নিয়ে পুকুর কাটার মত ব্যাপার। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই এদেশে চিরকালই শুরু হয়েছে মারামারি দাঙ্গা আর যুদ্ধ। ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গিয়েছে ভূখণ্ড। ব্যাঙের ছাতির মত গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য রাজ্য।

তার ওপরে ছিল লোকাচার আর দেশাচারের পার্থক্য। হিংসা আর অবিশ্বাসের ব্যাকটেরিয়া গিজ-গিজ করত চারপাশে। শক্তি তাদের যতটা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল ভড়ং।

এই অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে হামলা সুরু হল ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে। মহম্মদ-বিন-কাশেম সিন্ধু জয় করলেন। বারোশো ছ সালে কুতুব-উদ্দীন-আয়বক সুলতান হলেন দিল্লীর। এল পনেরশো ছাব্বিশ; মুলতানের ওপাশ থেকে পাহাড় ডিঙিয়ে হাজির হলেন বাবর। পত্তনি হল মোগল সাম্রাজ্যের। প্রায় দুশো

বছর ধরে এই সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে রাজচক্রবর্তির ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঔরংজেবের রাজত্বকাল থেকেই তা ভাঙতে শুরু করল। তাঁর মৃত্যুর পরেই তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। পাকা ধানে মই দেওয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল চারপাশে। রাজা, মন্ত্রী, উজির হাফ-রাজা, জমিদার, বরকন্দাজ, সিপাহ্‌শলার—বাদ গেল না কেউ। যে যতটুকু বাগাতে পারল তাই নিয়ে 'স্বাধীন নরপতি' বনে গেল।

এল সতের শো সাতান্ন।

মুর্শিদাবাদের সিংহাসন ঘিরে তলে তলে শুরু হল শকুনি মামার চক্রান্ত।

একদিকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা।

আর একদিকে উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, মীরজাফর আর ঘসেটি বেগমের আঁতাত।

সঙ্গে এসে হাত মেলালো ক্লাইভের দল।

পলাশীর প্রান্তরে সব খেল খতম হয়ে গেল সিরাজ-উদ্দৌল্লার।

বণিকের হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মীরজাফর।

ভারতের রাজনীতিতে নিঃশব্দ পদযাত্রা শুরু হল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর।

সতেরশো সাতান্ন থেকে আঠারোশো সাতান্ন। এই একশোটি বছর ধরে কোম্পানী জোর কদমে তাদের বিজয় অভিযান চালিয়ে গেল। সেই অভিযানের সময় তারা ছল, বল, কৌশল—কোন কিছুই বাদ দেয় নি। এমন সংঘবদ্ধ, ধাপ্পাবাজ, শক্তিশালী, আর কূটনীতিতে পোক্ত জাতির সঙ্গে ভারতীয় রাজাদের আর কোন দিন পাঞ্জা লড়াই করতে হয় নি। এরা যুদ্ধ করেছে যত, সালিশী করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। যত লুণ্ঠন করেছে সব ওই অবগুণ্ঠনের আড়ালে। চেঙ্গিশ খাঁ, তৈমুরলঙ, নাদির শাহ্‌, আহমেদ শা দুররাণীর মত বর্বর

এরা নয়। অতি সূক্ষ্ম চারুশিল্পের মত সূঁচ হয়ে ভেতরে ঢুকেছে এরা, বেরিয়ে এসেছে ফাল হয়ে। একটার পর একটা রাজ্যকে আর একটা রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে বানরের পিঠে ভাগ করেছে। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। সারা ভারত জুড়ে একটা গেল-গেল ভাব। কত রাজ্যের সীমানা ওলট-পালট হল, সিংহাসন-হারা হল কত রাজা-মহারাজা, দেশ থেকে নির্বাসিত হল কত রাজপরিবার।

একটু ছল, একটু ছুতো পেলেই হল। অনেক সময় তারও দরকার হয়নি। দেশীয় রাজাদের গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে, কাউকে লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে কাউকে, একটার পর একটা রাজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কোম্পানীর চেলারা। কুর্গের রাজা শাসন করতে জানে না; নিয়ে নাও কুর্গ। সিন্ধু দেশটা আমাদের চাই। হটিয়ে দাও আমীরদের। অপহরণ কর তার স্বাধীনতা। যে অভিযোগ করতে আসবে তারই মাথায় চাঁটি মেরে বসিয়ে দাও। পরস্বাপরহণে দুর্নীতি বলে কোন শব্দ কোম্পানীর অভিধানে ছিল না।

বলিহারি ওয়েলেসলির সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স আর ডালহৌসী সাহেবের ডকট্রিন অফ ল্যাপস-এর গুঁতো। তাদেরই ঠেলায় ঝরাপাতার মত ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলি লোপাট হয়ে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ল ঝাঁসি, ভগত, সাঁতারা, পাঞ্জাব, মহীশূর, নাগপুর, সম্বলপুর। খতম হল মারাঠা শক্তি, নির্মূল হল শিখ, কাশ্মীর রাজ্যটি বেচে দেওয়া হল জম্মুর নেতা ডোগরা রাজপুত গুলাব সিংহের কাছে। কোম্পানীর রাজ্য বিস্তারিত হল আফগানিস্থানের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত। গেল সিকিম। হায়দারাবাদের নিজামের হাত থেকে বেরিয়ে গেল বেরার।

এল আঠারো শো ছাপ্পান্ন সাল। কোম্পানীর লক্ষ্য পড়ল অযোধ্যার ওপরে। হেষ্টিংস-এর চাপে পড়ে ইতিমধ্যেই বেগমদের সত্তর লক্ষ টাকা বার ক'রে দিতে হয়েছে। তাতেও খুশি হয়নি কোম্পানী। হঠাও নবাব ওয়াজিদ আলিকে। প্রজাদের দুঃখে হঠাৎ ড্যালহৌসী

সাহেবের কলিজা টন টন করে উঠল। কুশাসক ওয়াজেদ আলি সাহেব ; সুরা, আতর, আর যুবতী রমণীদের নিয়ে মশগুল হয়ে থাকে সব সময়। হঠাও উসকো। বেচারা নবাব। চোখের জলের সঙ্গে কাজলের কালি মিশিয়ে লখ্‌নৌ ছেড়ে গেলেন ওয়াজেদ আলি :

জব ছোড় চলে লখ্‌নৌ নগরী
তব হালে আলি পর ক্যা গুজরী,
মহল মহল মে বেগম রোয়ে,
জব হুম গুজরে দুনিয়া গুজরী।

রাজ্য-অভিযান শেষ হল কোম্পানীর। সেই অভিযানে এতটুকু সৌজন্য দেখায় নি কোম্পানীর চেলারা। শঠতা, প্রবঞ্চনা, আর উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্রই ছিল তাদের একমাত্র হাতিয়ার। মার-মার করে হাঁক দিয়েছে কোম্পানীর সেনারা। পুরুষদের বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে, মেয়েদের ধর্ষণ করেছে বুক ফুলিয়ে।

কেবল ভারতবর্ষের রাজারাই নয়, চিন্তাশীল ইংরাজরাও কোম্পানীর এই অত্যাচার করার প্রবৃত্তিটাকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। আঠারোশো সাতান্ন সালে সিপাহী যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই, ব্রিটিশ সাংবাদিক হেনরী মিড কোম্পানীর শোষণনীতির তীব্র সমালোচনা করে বেশ কঠোরভাবেই মন্তব্য করেছেন :

The sovereign of what are called independent states live in a state of abject dependence upon the will of the British Agency at their various courts. The whole function of the Government are in most cases exercised by the Resident, in fact, if not in appearance, and the titular monarch sighs in vain for the personal freedom enjoyed by his subjects. (১)

অর্থাৎ, যাঁদের আমরা স্বাধীন নরপতি বলি তাঁরা কি সত্যি

(১) V. P. Menon : Integrationof PrincelyStates.

সত্যিই স্বাধীন? না তাঁদেরই দরবারে অধিষ্ঠিত ব্রিটিশ রেসিডেন্টের মর্জির ওপরেই তাঁদের নির্ভর করতে হয়? প্রকাশ্যে না হলেও, কার্যত এই সব রেসিডেন্টরাই সরকারের সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন। রেসিডেন্ট পছন্দ করছেন না এমন কোন কাজ করার সাহস রাজাধিরাজের ছিল না। নিজের সাম্রাজ্যেই তাঁকে বন্দী থাকতে হয়। প্রজাদের যেটুকু স্বাধীনতা রয়েছে, সেটুকুও তাঁদের নেই জেনে মহামান্য রাজপ্রমুখেরা বৃথাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

অষ্টে নয়, একেবারে সহস্র পাশের বাঁধন। এইসব রেসিডেন্টদের অনেকেই ছিলেন হিটলার-মুসোলিনীর সমগোত্র। নেটিভ রাজাদের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা ছিল আকাশচুম্বী।

পাপের বেতন মৃত্যু। সেই মৃত্যুর ডাক নিয়ে এল আঠারোশো সাতান্ন। শুরু হল সিপাহী যুদ্ধ। সিপাহীদের অভিযোগ ছিল সত্যি কথা, কিছু বাস্তব, কিছু সংস্কারগত। কিন্তু অপমানিত, গদিচ্যুত রাজাদেরও কম হাত ছিল না তাতে। বিদ্যুতের বেগে পুঞ্জীভূত আক্রোশ ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। মীরাট, দিল্লী, ঝাঁসি, কানপুর লাল হয়ে গেল ব্রিটিশ নাগরিকদের রক্তে। স্লোগান উঠল: 'কাম্পানীকা মাল, দরিয়ামে ডাল। 'হর-হর-মহাদেও' আর 'আল্লাহ্ আকবরের' মিলিত চিৎকারে উত্তর ভারত মুখরিত হয়ে উঠল। যায়-যায় অবস্থা কোম্পানীর। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্‌কে সামনে টেনে এনে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখালো সিপাহীরা। দিল্লী চল—দিল্লী চল...। চারপাশ থেকে জনস্রোত দিল্লীর দিকে ধাওয়া করল। মোগল হারেম থেকে বেরিয়ে এলেন বেগমসাহেবা জিন্নৎউন্নিসা। তারপর?

তারপর শুরু হল সুবিধাবাদীদের রংতামাশা। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্‌কে সামনে রেখে চক্রান্তের চাকা ঘুরিয়ে দিল রাজা, উজির আর ওমরাহে্‌র দল। সেই সুযোগে জেগে উঠল বিভীষণের চেলারা। কেবল মীর মুন্সী, রজব আলিই নয়; হাকিম আশানুল্লা আর মির্জা এলাহি বক্সকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কী? বিদেশী সরকারদের জন্যে

গুপ্তচরের কাজ করার মত মানুষের অভাব কোনদিনই হয় নি এদেশে। তখনও হল না; আর তাদেরই কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে কোম্পানী দিল্লী অবরোধ করতে এগিয়ে এল।

ইতিমধ্যে রজব আলির চক্রান্তে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যায়। তারই ফলে সিপাহীদের বিরাট একটি অস্ত্রাগার গেল উড়ে। মাথায় হাত দিয়ে বসল সিপাহীরা। কী নিয়ে তারা শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? হাতিয়ার ছাড়া শুধু হাতে কি যুদ্ধ করা সম্ভব!

দিনটা হল সাতই আগষ্ট।

চোদ্দই সেপ্টেম্বর কোম্পানীর সেনারা আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লী আক্রমণ করল। বিশে সেপ্টেম্বরেই মোটামুটি একটা ফয়শালা হয়ে গেল। পরাজয় অনিবার্য দেখে প্রচণ্ড যুদ্ধ করল সিপাহীরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল; সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের শিথিল হল। বাহাদুর শাহ লালকেল্লা ছেড়ে হুমায়ুনের কবরখানায় পালিয়ে গেলেন। দুর্গ রক্ষার ভার রইল মুষ্টিমেয় কিছু রক্ষীদের ওপরে।

কোম্পানীর সেনারা লালকেল্লার সামনে এসে দাঁড়াল। রুখে দাঁড়াল রক্ষীরা। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! রক্ষীদের জবাই ক'রে কোম্পানীর পল্টনরা ভেতরে ঢুকল। কেল্লার মধ্যে যারা বেঁচেছিল সেই সব অগণিত দুঃস্থ, অসহায় নারী-পুরুষ-শিশুদের পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কাটল তারা। রুগ্ন আর আহতরাও বাদ গেল না। সেই মরা কেল্লার কবরখানা দখল করল ইংরেজরা।

কিন্তু কোথায় সেই বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্! কোথায় সেই জরাগ্রস্ত মুঘল সাম্রাজ্যের কুশপুত্তলিকা? প্রকোষ্ঠে-প্রকোষ্ঠে অনুসন্ধান শুরু হল তাঁর। জীবিত অথবা মৃত, তাঁর দেহ চাই। টমী সেনারা পৈশাচিক উল্লাসে তরোয়াল আর রিভলভার উঁচিয়ে মত্ত দানবের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল চারপাশে।

একুশে সেপ্টেম্বর সার্জেন্ট হাডসনকে হুমায়ুনের কবরখানার পথ

দেখিয়ে নিয়ে গেল হাকিম আশানুল্লা আর মির্জা এলাহীবক্স। বাহাদুর শাহ্‌কে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে এল রাস্তার ওপরে। গোটা দিল্লী শহর হাঁটিয়ে ঘোরানো হল তাঁকে। অজস্র বেদনা বুকে চেপে উন্মত্ত বর্বরদের হাতে নিজেকে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ শেষ মুঘল সম্রাট।

এইখানেই কি শেষ? না, শেষ নয়। কোম্পানীর চেলাদের বর্বরতার শেষ ছিল না কোথাও। প্রতিপক্ষকে সম্মান দেখাতে কোনদিনই তারা এগিয়ে আসে নি। এবারেও এল না। লালকেল্লার ছোট্ট একটি কুঠরিতে বন্দী করে রাখা হল তাঁকে। পরাজিত সম্রাটের খানাপিনার জন্যে বরাদ্দ হল দৈনিক দুআনা পয়সা। কয়েদীর পোশাক উঠল তাঁর গায়ে। কয়েক মাস আগেও যাঁকে কেন্দ্র করে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন জেগে উঠেছিল সেই বাহাদুর শাহ্‌কে উঠতে বসতে সেলাম জানাতে হল ঘৃণ্য টমী শাস্ত্রীদের।

কিন্তু তাঁকে হত্যা করার আদেশ দিল না কোম্পানী। ঘোষণা করা হল, প্রকাশ্য আদালতে তাঁর বিচার হবে। তাঁর অপরাধ? অপরাধ রাজদ্রোহিতার! অধর্ম করতে জানে না কোম্পানীর চেলারা।

আর বেগমসাহেবা জিন্নত-মহল। বেগমসাহেবার চালে কিছু ভুলই হয়েছিল। বাবা আহমেদ কুলী খাঁ আর একমাত্র পুত্র জোয়ান ভকতকে বাঁচানোর জন্যে কোম্পানীর চেলাদের দু'লক্ষ টাকা তিনি ঘুষ দিয়েছিলেন। টাকাটা তারা নিয়েছিল; কিন্তু তাতে তাঁর ইজ্জত বাঁচে নি। নোংরা পোশাক পরিয়ে তাঁকেও তারা লাল-কেল্লার ছোট্ট একটি কুঠরিতে আটকিয়ে রেখেছিল। দিনে-রাতে অশান্তির আর শেষ ছিল না তাঁর। টমীরা চব্বিশ ঘণ্টা পালা করে তাঁর কুঠরির মধ্যে উঁকি দিয়ে অবিশ্রাম কুৎসিত ইঙ্গিত করে যেত, যুবতী রমণীর দেহের ওপরে করত কটাক্ষ।

বাদশা আর বেগমকে তো বন্দী করা হল। কিন্তু শাহ্‌জাদারা

গেল কোথায়? মির্জা এলাহী বক্সকে সঙ্গে নিয়ে আবার হাডসন ছুটল হুমায়ুনের কবরখানায়। বাহাদুর শাহের তিনটি ছেলে তখনও লুকিয়েছিল সেখানে। হাডসন তাদের টেনে বার করে নিয়ে এল। খোলা গা আর খালি পায়ে প্রকাশ্য রাস্তার ওপর দিয়ে কয়েদীর মত হাঁটিয়ে নিয়ে চলল কিছু দূর। তারপরে দিল্লীর কয়েদখানার বাইরে খুনী দরওয়াজার সামনে তাদের বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। রাস্তায় ওপর লুটিয়ে পড়ল শাহ্জাদারা। হাডসন তাদের মাথাগুলি কেটে বাহাদুর শাহের কাছে ভেট পাঠিয়ে দিল। কোতোয়ালিতেতিন দিন ঝুলিয়ে রাখল তাদের মৃতদেহ। ঝাঁকে-ঝাঁকে কাক আর শকুনের দল জমায়েত হল, খোঁচাতে লাগল দেহগুলিকে। পচা গন্ধে কোতো-য়ালির পথ-ঘাট ভরে উঠল। তারপর সেগুলিকে নষ্ট করে দেওয়ার হুকুম হল। ভারতের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মুঘল সাম্রাজ্য।

আর দিল্লী? দিল্লীর অবস্থা আরও ভয়াবহ। বিশে সেপ্টেম্বর থেকে একটি মাস ধরে সেখানে চলল এক অবিশ্বাস্য হত্যাযজ্ঞ! হুকুম হল, নেটিভ দেখলেই জবাই কর। কোন রকম বাছবিচার নেই। অসুস্থ, বিকলাঙ্গ হল তো বয়েই গেল। দিল্লীকে চরম শাস্তি দিতে হবে। ষড়যন্ত্রের পীঠস্থান এই দিল্লী। নিস্তার নেই ওর। নারী দেখলেই ঘর থেকে টেনে এনে তার ওপরে পাশবিক অত্যাচার কর; তারপরে বুটের গুঁতো দিয়ে ফেলে দাও দূরে ছুঁড়ে। নারীদের সম্মান বাঁচানো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে অনেক নারী আত্মহত্যা করল। মতিয়া মহল, ভোজনা পাহাড়ী, আর কুচা খিলানের লোকেরা অপমানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে নিজেদের হাতে আত্মীয়াদের মেরে ফেলল।

কিন্তু তাতে হত্যার আনন্দ কমেনি ইংরেজদের। এক কুচা খিলান থেকেই তারা প্রায় চোদ্দ শ' লোককে মারতে মারতে রাজঘাটে নিয়ে গিয়ে পাইকিরি ভাবে জবাই করেছে; যমুনায় ফেলে দিয়েছে তাদের লাশ।

এই ভাবে গোরা সেনারা যখন হত্যার উল্লাসে তাথৈ-তাথৈ নৃত্য করছে এমন সময় নির্দেশ এল—দিল্লী শহর থেকে সব কালা আদমী হঠাও ; একেবারে শ্মশান করে দাও দিল্লী, নারী আর পুরুষদের পৃথক কর ; ঘাড় ধরে বার করে দাও তাদের।

যে হুকুম, সেই কাজ। একপাশ দিয়ে পুরুষদের বার করে দেওয়া হল ; আর এক পাশ দিয়ে নারীদের। দিল্লীর বাইরে গুণ্ডারা ওৎ পেতে বসেছিল। এ-সুযোগ তারা ছাড়ল না। প্রকাশ্য রাস্তায় নারীদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দিল্লীর ভেতরে কোন পুরুষ কোন নারীকে সঙ্গে নিয়ে পালাচ্ছে বলে সন্দেহ হলেই গোরা সেনারা তাকে ধরে এনে ফাঁসিতে লটকিয়ে দিত।

ফাঁসির প্রক্রিয়াটা একবার লক্ষ্য করলেই সুসভ্য আর সংস্কৃতিবান ইংরেজ বণিকদের আসল চেহারাটা কী তা সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ফাঁসির আসামীকে প্রথমেই বেঁধে ফেলত তারা। তারপরে তার সারা অঙ্গে আগুনে পোড়ানো লাল টকটকে তামা দিয়ে ছ্যাঁকা দিত। সেই ক্ষতগুলিতে নুন আর গুঁড়োলঙ্কা ছিটিয়ে দিত তারা। অসহ্য যন্ত্রণায় লোকটি যখন কুঁকড়ে-কুঁকড়ে উঠত তখন টমীগুলো পৈশাচিক উল্লাসে হাততালি দিত। মরণোন্মুখ মানুষগুলির এই ছটফটানিকে টমীরা নাম দিয়েছিল 'হর্ন পাইপ ড্যান্স'।

মাত্র দুটি মাস। এই দু'মাসের মধ্যে এক দিল্লী শহরেই ইংরেজ কত লোককে হত্যা করেছে জানেন ? সাতাশ হাজারের কাছাকাছি। এই পরিসংখ্যানের মধ্যে নিহত সিপাহীদের সংখ্যা নেই।

দিল্লী শহর ফাঁকা হয়ে গেল। যারা জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিল ঠাণ্ডা আর অনাহারে তাদের মধ্যেও কয়েক হাজার লোক মারা গেল।

আঠারশো সাতান্ন এগারোই মে দিল্লীর লোকসংখ্যা ছিল এক লক্ষ আশী হাজারের মত। সমাজ-জীবন ছিল সহজ, সরল, উৎসব-মুখর, সস্তা ছিল জিনিসপত্রের দাম। দু'বছর পরে আবার যখন দিল্লীর গেটগুলি খুলে দেওয়া হল, তখন দিল্লী শহর শ্মশান হয়ে গিয়েছে।

ফিরে এল তিরিশ হাজারের কাছাকাছি। এসে দেখল কী? দেখল, অত সাধের ঘর তাদের শেয়ালের আড্ডাখানা হয়েছে। জানলা, দরজা, আসবাব পত্র কিছু নেই; একটা নিদারুণ শূন্যতা চারপাশে খাঁ-খাঁ করছে।

ও ছাড়া আর দেখবে কী? দেখার কিছু ছিল কী? সম্পদ যা ছিল সবই লুঠে নিয়েছে ওই কোম্পানীর বীর সেনানীরা। তৈমুরলং, নাদির শাহ, আহমেদ শাহ্ দুররাণীও একসঙ্গে অত সম্পদ লুট করতে পারে নি। এক দিকে যেমন চলছিল হত্যার উৎসব, অন্যদিকে তেমনি চলেছিল লুঠের উল্লাস। গাড়ি-গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে গেল সব সোনা, রুপো, হীরে, মুক্তো, মণি, আর জহরত। মন্দির-মসজিদ রক্ষা পায়নি সেই রাহাজানির হাত থেকে। কেউ রক্ষা পায় নি; এমন কি, যেসব ভারতীয়েরা যুদ্ধের সময় কোম্পানীকে সাহায্য করেছিল তারাও না। কোম্পানীর চেলারা এত সম্পদ সংগ্রহ করেছিল যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে তাদের মধ্যে অনেকেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্রিটেনে ফিরে গেল। সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে ক্ষুদে রাজার মত বিলাসে দিন কাটাতে লাগল। এ সম্বন্ধে লর্ড এলফিনষ্টোন স্যার জন লরেন্সকে লিখেছেন: 'After the seize is over, the outrages committed by our army are simply heart-rending. A wholesale vengeance is being taken without distinction of friend or foe. As regards the looting, we have indeed surpassed Nadir Shah.' (২)

দিল্লীর পর লখ্নৌ।

ইংরেজরা ভেবেছিল দিল্লীর পতনের পর তাদের বিজয় অভিযান সহজ হয়ে যাবে। বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ঝরাপাতার

(২) Life of Lawrence. Vol II, P. 262

মতই ঝরে যাবে। দিল্লীর ওপরে অমানুষিক অত্যাচার করার উদ্দেশ্য ছিল ওইখানেই। প্যাটার্ন অনেকটা চেঙ্গিসখাঁর মত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই লাখখানেক মানুষকে কেটে-কুঁচিয়ে শেষ করে দাও। রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে দাও রাস্তাঘাট। ভয়ে দুর্ভাবনায় শত্রুপক্ষের ধাত ছেড়ে যাবে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা গেল লখনৌতে। এমন প্রচণ্ড বাধা দিল্লীর কাছেও তারা পায় নি। এই প্রতিরোধের সমস্ত গৌরব বোধ হয় নবাব মহিষী হজরত মহলের। ইনি ছিলেন অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলির বেগম। সুযোগ বুঝে অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। দশ বছরের শিশুপুত্র রাজকুমার বীরজিস কাদেরকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যশাসনের সমস্ত ঝক্কি নিলেন নিজের হাতে। স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন তিনি। অযোধ্যার বেগম সাহেবার কাছে এগিয়ে এলেন আমীর-ওম্‌রাহের দল। বিপ্লবী যোদ্ধারা চারপাশ থেকে জমায়েত হলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, নিজেদের জীবন দিয়েও স্বাধীনতা রক্ষা করবেন তাঁরা; দিল্লীর বদলা নেবেন।

কোম্পানীও চুপ করে বসে রইল না। ডাক পড়ল বাঘা-বাঘা জেনারেলদের। পিল সাহেব এলেন, এলেন হ্যাভলক, আউটরাম, দিল্লীর কুখ্যাত হাডসন, ব্রিগেডিয়ার হোপ গ্রান্ট, আয়ার, আর প্রধান সেনাপতি স্বয়ং স্যার কলিন। এল দুর্ধর্ষ বেলুচী-বাহিনী, সঙ্গে এল শিখ আর গুর্খা রেজিমেন্ট।

সাঁড়াশী আক্রমণ শুরু হল লখনৌ-এর ওপরে।

সতেরই নভেম্বর। খুব ভোরে লখনৌ শহরের সমস্ত ঘণ্টাগুলি একসঙ্গে বেজে উঠল : হিন্দুস্তানী ভাই সব, এগিয়ে এস। স্বাধীনতার জন্যে বুকের রক্ত ঢেলে দাও।

সেই ডাকে সাড়া দেয় নি কে? বুকের রক্ত ঢেলে দিতে কার্পণ্য করে নি কেউ। এক সিকান্দারবাগেই যুদ্ধ করতে করতে দুহাজার সিপাহী মারা গেল। দিলখুশা, আলমবাগ, শাহ নজফেও কম সিপাহী মরে নি। বাদ যায়নি কদম রসুল, বেগম কোঠিও।

কোন জায়গাতেই তারা সহজে পথ ছেড়ে দেয় নি ফিরিঙ্গীদের, বিনা যুদ্ধে হটে আসেনি তারা।

সিকান্দারবাগে যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ম্যালেশন সাহেব লিখেছেন : The fight for the possession of the enclosure was bloody and desperate, the rebels fighting with all the energy of despair. Nor did the struggle end when our men forced their way inside. Every room, every staircase, every corner of the towers was contested···and, whenat last the assailants were masters of the place, more than two thousand rebel corpses lay heaped around us. (৩)

শেষ পর্যন্ত পতন হল লখনৌ-এর। কানপুরের যুদ্ধে তাঁতিয়া টোপী আগেই পরাজিত হয়েছেন। বিহার সরীফে কুনোয়ার সিং-ও বিপর্যস্ত।

আঠারোশ' সাতান্নর স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয়ে গেল ভারতের।

কোম্পানী জিতল ঠিকই, কিন্তু নিজেকে জিইয়ে রাখতে পারল না। রাজত্ব তাদের শেষ হয়ে গেল ভারতে। খোদ ব্রিটিশ সরকারের মুসৌলিয়ম উঠল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কবরখানার ওপরে।

কিন্তু এত প্রাণ বলি দিয়েও সিপাহীরা হারল কেন?

হারল অনেক কারণে। তাদের মধ্যে একটি হল ভারতীয় রাজন্যবর্গের 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ভাব। এদের সঙ্গে অনেক রাজাই হাত মেলায় নি।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধে রাজারা তাহলে করছিল কী?

বসে বসে রং-তামাশা দেখছিল। যারা কিছুটা চালাক তারা

---

(৩) [The Indian Mutiny. vol VI. P. 132]

টাকা আর সৈন্য দিয়ে কোম্পানীকে তলে-তলে সাহায্য করেছিল। যারা বেশী চালাক তারা দু'পক্ষকেই তালাক দিয়েছিল। নীতি তাদের সহজ এবং সরল। কী দরকার বাপু, ওসব ঝুট-ঝামেলায়? সিপাহীরাও আমাদের দোস্ত নয়, আর কোম্পানীর বাচ্চাদের সঙ্গেও আমরা গোস্ত খাইনে। ষাঁড়ের শত্রু যদি বাঘে খায় তো বহুত আচ্ছা।

রাজাদের উদ্দেশ্য যত মহতই থাক, তাতে কোম্পানীর লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি। রাসেল সাহেব তাঁর ডায়েরীর এক জায়গায় লিখেছেন:
Our seige of Delhi would have been impossible, if the Rajas of Patiala and Jhind had not been our friends and if the Sikhs had not been recruited in our battalions and remained quiet in the Punjab. (৪)

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজাদের ওপরে যৎপরোনাস্তি খুশি হয়েছিল। ভারতের প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং তো এদের প্রশংসায় একেবারে সহস্রমুখ হয়ে পড়লেন, বললেন:
The native governments proved breakwaters to the storm which would, otherwise, have swept over us in one great wave (৫)

অর্থাৎ দেশীয় রাজারা ঝড়ের মুখে শক্ত বাঁধের কাজ করেছিলেন। অন্যথায়, বিপুল তরঙ্গের একটি ধাক্কাতেই আমরা তলিয়ে যেতাম।

ক্যানিং সাহেবেরও প্রায় বিশ বছর আগে স্যার জন ম্যালকম এই সব রাজাদের জন্যে দরদ দেখিয়ে বলেছেন:

I am decidedly of the opinion that the tranquility, not to say security, of our vast oriental possessions is involved in the preservation of the native principalities which are dependent on us for protection····their co-existence with our rule is of itself a

source of political strength, the value of which will never be known till it is lost. (৬)

আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আমাদের বিরাট প্রাচ্য সাম্রাজ্যের শান্তি—নিরাপত্তার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—আমাদের ওপরে নির্ভরশীল দেশীয় রাজ্যগুলির সংরক্ষণের সঙ্গে জড়িত রয়েছে।... আমাদের পাশাপাশি তাদের সহ-অবস্থানই হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক শক্তির উৎস। সেই শক্তি নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এর মূল্য যে কত তা আমরা বুঝতে পারব না।

ম্যালকম সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী যে কতখানি সত্যি সিপাহী-যুদ্ধের সময়েই তা বেশ বোঝা গেল। দেশীয় রাজাদের কাছ থেকে আরও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এই ভরসায় ব্রিটিশ সরকারের নীতি কিছুটা পরিবর্তিত হল। কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজন্যবর্গকে আশ্বাস দিয়ে বললেনঃ আমরা আর তোমাদের গায়ে হাত দেব না। শুধু যে হাত দেব না তাই নয়, আমরা সব সময়ে চেষ্টা করব 'to respect the rights, dignity and honour of the native princes as our own'.

অর্থাৎ, সোজা বাংলায়, তোমরা আমাদের দোস্ত, স্বগোত্র। তোমরা যাতে বেইজ্জৎ না হও, তোমাদের রাজত্ব যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখব। নির্ঝঞ্ঝাট আর বহাল তবিয়তে রাজত্ব কর তোমরা।

দেশীয় রাজারাও এই ধরনেরই একটা আশ্বাস চাইছিল। মহারাণীর মাভৈ বাণী শোনার পর অনিশ্চিত দিন গোনার পালা শেষ হল তাদের। গোঁফ চুমরে ভুরুতে আতর মাখিয়ে খুসবাই ছড়িয়ে প্রাণের

---

(৪) [My Diary in India by Russell]. (৫) [G. I. Records.] (৬) [Menon's Integration of Princely States,]

আনন্দে তারা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শিস দিতে লাগল। লঙ লিভ হার ম্যাজেষ্টি! হ্যাঁ, এই তো সিংহীর মত কথা। ব্রিটিশ সরকার কোম্পানীর বেনিয়াদের মত আর ছোঁক ছোঁক করবে না। নিরুপদ্রবে রাজত্ব করতে পারবে তারা। কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ! ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

মহারাণীর ঘোষণা মিথ্যে হয় নি। আঠারোশ সাতান্নর পর থেকে ব্রিটিশ সরকার কাগজে-কলমে নীতিগতভাবে আর কোন ভারতীয় রাজ্য গ্রাস করে নি। ভারত সরকারের হামলা থেকে মুক্তি পেয়েছিল তারা।

হ্যাঁ, স্বাধীনই বটে। খানা-পিনা, রেশ, মদ, আর বিলিতি মেয়ে-মানুষের পেছনে দৌড়ে বেড়ানো, কুকুরের বিয়েতে লাখ-লাখ টাকা খরচ করা, প্রজাদের ঠেঙানোর জন্যে লেঠেল-পাইক-বরকন্দাজদের তালিম দেওয়া, ইংরাজ অফিসারদের পদমর্যাদা অনুসারে চাটুকারিতা করা—এসব বিষয়ে রাজারা একেবারে স্বাধীন, স্বরাজ্যে সম্রাট।

কিন্তু! তাই বলে তোমরা 'সভ্‌রেন' নও।—মুচকি হেসে মন্তব্য করল ব্রিটিশ সরকার।

ম্‌-মা-নে !!—আঁতকে উঠল রাজারা।

মানে, আমরা যাকে 'ইনডিপেনডেন্ট বলি, তোমরা তা নও'—স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল ব্রিটিশ সরকার।

অ্যাঁ! তাহলে !! চোখগুলো বড়বড় করে তাকিয়ে রইল রাজারা।—এ আবার কোন দেশী মস্করা বাপধন? গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া?

ব্রিটিশ সরকার হেসে বলল: বৎস, মা ভেতব্যম্।

বৎসই হোক, আর গোবৎসই হোক, ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাবে না এটা কোন কাজের কথা নয়। একে সাদা চামড়া, লাল মুখ, তার ওপরে ইংরিজি ভাষা। এমন ত্র্যহস্পর্শের যোগ যেখানে, সেখানে ভয় পায় না এমন মূর্খ কে রয়েছে?

কিন্তু রাজারা মূর্খ নয়, টাকার মত বুদ্ধিটাও তাদের হয়ে পূর্ব-

পুরুষরা অর্জন করে গিয়েছে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের স্বস্তিবাণীতে তারা এতটুকু আশ্বস্ত হল না।

ভয় করব না কেন সেইটাই আমাদের বুঝিয়ে দাও। তোমাদের চোখ রাঙানির অর্থটা আমরা বুঝি, কিন্তু ঐ হাসি? ও বাবা মিছরির ছুরি। তার ওপরে তোমাদের ঐ ইংরেজী ভাষার খুরে নমস্কার দাদা। তোমাদের মতলবটা কী বুঝিয়ে বল।

জলের মত বুঝিয়ে দিল ব্রিটিশ সরকার: দুটোই খাঁটি। তোমরা স্বাধীনও বটে, আবার ইনডিপেনডেণ্ট নও-ও বটে।

আরও একটু পরিষ্কার করে বল। ঝেড়ে কাশো, দাদা।

এবারে সত্যি সত্যিই ঝেড়ে কাশলো ব্রিটিশ সরকার: আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তোমরা স্বাধীন। ব্রিটিশ সরকারের আইন বা ভারত-সরকারের কানুন তোমাদের প্রজারা মানতে বাধ্য নয়। ভর্তা যদি না-ও হতে চাও, তোমরাই হলে তাদের হর্তা, কর্তা, বিধাতা। সুতরাং তোমরা স্বাধীন।

বহুৎ আচ্ছা, তারপর?

আসল ভেলকীটা তারপরেই।

বাইরের কোন শত্রু আক্রমণ করলে নিজেদের তোমরা বাঁচাতে পারবে? সে-রকম সেনা, সেনাপতি, আর যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম তোমাদের রয়েছে?

নেই তো হয়েছে কী? তৈরি করে নেব।

সে-সামর্থ্য তোমাদের কোথায়?

রাজারাও পিছপা নয়: সে-ব্যবস্থা করা যাবে। ঘোড়া জুটলে চাবুকের অভাব হবে না।

ব্রিটিশ সরকার বিজ্ঞের মত হেসে বলল: বটে বটে! সেই চাবুক নিজেদের পিঠে বসিয়ে রক্তগঙ্গা বওয়াবে, এই তো?

রাজারা বলল: হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে তা নিশ্চয় বওয়াব। ওটাই তো আমাদের কুলকর্ম।

ওই কুলকর্ম করতে গিয়েই তো আজ প্রায় দেড়শো বছর ধরে অকূলে ভাসছ তোমরা। যাক গে, অনেক পণ্ডশ্রম করেছ। এখন সব দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তোমরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও, বাকি সব কাজ আমরা করে দিচ্ছি।

কিচ্ছু করতে হবে না আমাদের?

কয়েকটা চুক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

গোটা কতক চুক্তি করলেই সব ঝামেলা থেকে মুক্তি পাব?

আলবৎ!

আমাদের সম্পদ?

তোমাদের নিজস্ব।

আমাদের সম্মান?

সুরক্ষিত। কেবল সুরক্ষিতই থাকবে না, থাকবে সুলিখিত। তোমাদের কার সম্মান কতটা তা আমরা কামান দেগে সারা ভারতবর্ষকে জানিয়ে দেব। ভুলে যাচ্ছ কেন, স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া তোমাদের দোস্ত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

বহুৎ আচ্ছা! তাহলে, বাতলাও দেখি কী তোমাদের চুক্তি!

বাতলে দিল ব্রিটিশ সরকার। চুক্তি একটা নয় অনেক। তৈরি হল বস্তা-বস্তা দলিল আর দস্তাবেজ। সেই সমস্ত পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্র ঘেঁটে এইটুকু বোঝা গেল, এক খানা-পিনা করা ছাড়া রাজারা নিজ-নিজ রাজ্যের বাইরে অন্য কোন রাজাদের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা করতে পারবে না। দেশরক্ষার খাতিরে দেশীয় রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনমত ভারত-সরকারকে টাকা আর পল্টন যোগান দিতে হবে। ভারত-সরকারের স্বার্থবিরুদ্ধ কোন কাজ যাতে দেশীয় রাজারা করতে না পারে তার জন্যে ব্রিটিশ সরকার সজাগ থাকবে, ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন ছাড়া নিজেদের রাজ্যে রাজনৈতিক কোন সংস্কার তারা করতে পারবে না।

এই কি শেষ?

না, শেষ নয়। স্টেটের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যে তদারকি করার প্রয়োজনে ভাইসরয়-এর অধীনে একটি দপ্তর থাকবে। তার নাম হবে পলিটিক্যাল দপ্তর। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আর প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে চোখা-চোখা অফিসারদের নিয়ে এই দপ্তরটি তৈরি হবে। প্রধান প্রধান স্টেটে পৃথকভাবে এবং কয়েকটি স্টেটে যুগ্মভাবে এই দপ্তর রেসিডেন্ট আর পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত করবে। রাজাদের সমস্ত কিছু ব্যক্তিগত অভিযোগ এই দপ্তরের কাছে পেশ করতে হবে।

অর্থাৎ, রাজারা হল গিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ। পাণ্ডাদের দয়ার ওপরে তাদের অন্নজল নির্ভর করবে, মোদ্দা কথাটা এই রকমই দাঁড়াল তো?

তা-ও না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু, কোম্পানীর 'ভাইস' তোমাদের এই ভাইসরয়-এর মধ্যে কতটা বর্তাবে?

সান্ত্বনা দিল ব্রিটিশ সরকার: কিছু না, কিছু না। তাঁর কাজই হবে আপদে বিপদে তোমাদের 'অ্যাডভাইস' করা, তোমাদের 'ভাইস' 'অ্যাড' করা নয়।

সোজা কথায় একেই বলা হয় 'প্যারামাউন্টসি'; অর্থাৎ, সিন্দুকে যা রয়েছে সব তোমার, কেবল চাবিকাঠিটি আমার। যখন যা দরকার হবে বল, প্রয়োজন মনে করলে আমি তা বার করে দেব।

অগত্যা। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

তাছাড়া, এই ধরনের চুক্তি কিছু স্টেট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে অনেক আগেই করেছিল। আঠারোশ' আঠান্ন সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া সরকারী ঘোষণায় সেইগুলিই মোটামুটিভাবে স্বীকার করে নিলেন। পুরনো মদ নতুন বোতলে চোলাই করা হল, আর সরকারী লেবেল মেরে সেটিকে করা হল অভিজাত।

কিন্তু বাঁধনটাকে শক্ত করতে ভুলল না ব্রিটিশ সরকার।

ভুললে বিপদ হত তারই। মুখে সে যাই বলুক, এই সব রাজাদের চিনতে বাকি ছিল না তার। এরা কেবল দেশেরই রাজা নয়, ষড়যন্ত্র করতে এরা ছিল অদ্বিতীয়। সতেরোশ' সাতান্ন সাল থেকে আঠারশ' সাতান্ন পর্যন্ত সারা ভারত জুড়ে যে খেল এরা দেখিয়েছে তা সত্যিই দেখার মত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে একেবারে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। হায়দর আলি, টিপু সুলতান, বারাণসীর চৈতসিং, মহাদজী সিন্ধিয়া, পেশোয়া বাজীরাও—কোম্পানীকে দিনের পর দিন নাস্তানাবুদ করেছেন। নানা ফড়নবীশ, গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী নেতা তাঁতীয়া টোপী, ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ—এঁরাই তো প্রায় কাত করে দিয়েছিলেন কোম্পানীর পল্টনদের।

সিপাহী-যুদ্ধের পর তাই ব্রিটিশ সরকার আর কোন ঝুঁকি নিতে রাজী হয় নি। রাজারা যাতে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রথমেই তাদের শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হল। সারা ভারতের পঞ্চান্ন ভাগ অংশ তখন ব্রিটিশ-ভারতের অন্তর্ভুক্ত, পঁয়তাল্লিশ ভাগের মত অংশে ছিল এই দেশীয় রাজ্য। তাও সব ছড়ানো-ছিটানো। কেবল ছড়ানো-ছিটানোই নয়, রীতিমত বিপর্যস্ত। এই সুযোগে ব্রিটিশ সরকার আরও শক্ত হাতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করল। কোন রাজাকে শায়েস্তা করার জন্যে এখন আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। একটু ভুরু কুঁচকালেই কাজ শেষ।

কোম্পানীর রাজত্বে যেটুকু ফাঁক ছিল, ব্রিটিশ সরকার তা বন্ধ করে দিল। কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। রাজাদের স্বার্থেই ব্রিটিশ সরকার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল।

A political department was set up under the direct charge of the Governor General. It had at its disposal a *service known as the* Indian Political service, manned by officers taken from the Indian Civil Service and the Army. (৭)

এ ছাড়া ছিল পুলিস বিভাগ। এর জন্যে যা খরচ হ'ত তার কিছুটা দিত কেন্দ্রীয় সরকার, বাকিটা আসত স্টেটের তহবিল থেকে। দেশীয় রাজ্যগুলির সুযোগ-সুবিধা যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যে পলিটিক্যাল দপ্তরের ওপরে ভারত-সচীব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন!

অর্থাৎ স্টেটের ভাল আর মন্দ সব কিছুর তহশীলদার ছিল ব্রিটিশ সরকার।

দুষ্ট লোকেরা বলতে শুরু করল: এ আবার কোন্ দেশী স্বাধীনতা রে বাবা!

একেই বলে খাঁটি বিলিতি স্বাধীনতা! একেবারে মেড টু অর্ডার। আসল কথাটা মাইকেল এডওয়ার্ড সাহেব বলে গিয়েছেন :

In the final analysis, they were not really sovereigns. Their internal affairs were subject to supervision, and the Paramount Power could intervene even to the extent of deposing the ruler, though such intervention was very rare. (৮)

মোটের ওপর, এই সব রাজারা কোন সময়েই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল না। তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি তদারক করার ক্ষমতাও ছিল এই প্যারামাউন্ট পাওয়ারের। ক্বচিৎ কদাচিৎ হলেও, প্রয়োজন মনে করলে এই ক্ষমতার জোরে ব্রিটিশ সরকার যে-কোন রাজাকে তার রাজ্য থেকেও উচ্ছেদ করতে পারত।

সাদা কথায় এরই নাম হল প্যারামাউন্টসি।

এরই দৌলতে গদীতে বসার সুযোগ পেত রাজারা। এরই বলে ব্রিটিশ সরকার রাজাদের জন্যে সম্মানের বাটখারা ঠিক করে দিত। তাদের পদমর্যাদার টোকেন ছিল এরই মুঠোর মধ্যে। এরই ঘেরাটোপ

---

(৭) [G. I. Records].

(৮) [The Last years British of Raj.]

দিয়ে ব্রিটিশ সরকার বিরাট ভারতবর্ষ থেকে এই সব রাজাদের পৃথক করে রেখেছিল। কোম্পানীর চেয়ে ব্রিটিশ সরকার যে অনেক বেশি ধুরন্ধর এই প্যারামাউন্টসির অসিই তার প্রমাণ।

এদেশের অলস, কর্মবিমুখ রাজারাও ব্রিটিশদের অনুগ্রহের দানে পুষ্ট হয়ে নিজেদের অভারতীয় বলে মনে করতে লাগল। আঠারশ' সাতান্নর পর থেকেই তারা জোব্বা-চাপকান-মেডেল সুশোভিত হয়ে পুরানো আসবাবপত্রের সামিল হয়ে উঠল।

'পুরানো আসবাব' বলছি এই কারণে দেশ শাসন আর প্রজা পালনের ব্যাপারে অধিকাংশ রাজাদেরই আগ্রহ ছিল কম। অনায়াসলব্ধ অর্থের প্রাচুর্যে, হীরা-মুক্তা-মানিকের ছটায় বুঁদ হয়ে বসে থাকত তারা। প্যারিস, ভিয়েনা, লণ্ডন, সুইজারল্যাণ্ড-এ বিলিতি ব্লণ্ড সুইটহার্টদের নিয়ে রাত্রির হোটেল রাখত ভরাট করে; মদ আর রেশের মাঠে লাখ-লাখ টাকা খরচ করত। আর সেই টাকা আসতো দরিদ্র প্রজাদের বুকের রক্ত নিংড়ে।

তাদের মধ্যে অনেকেই জানত, পরিশ্রম বৃথা, উদ্যম বৃথা। নতুন পরিস্থিতিতে রাজ্যবিস্তার করা চলবে না; অন্য কোন রাজ্য তাদের সীমানার মধ্যে নাক গলাতে সাহস করবে না। তারা জানত, রাজার সমালোচনা করার ঔদ্ধত্য প্রজাদের নেই; যত অত্যাচারই হোক, বিদ্রোহ ঘোষণা করার চেষ্টা তারা করবে না। একমাত্র ভয় ছিল পলিটিক্যাল দপ্তরকে। তাকে তুষ্ট করতে পারলেই সব ঝামেলার নিরসন। অনেক টালমাটাল খাওয়ার পরে রাজারা বুঝতে পেরেছিল সুখের চেয়ে সোয়াস্তি অনেক বেশি নিরাপদ।

কিন্তু সময়ের চাকা যে এইভাবে ঘুরে যাবে সে-কথা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল? রাজারা নিশ্চয় তা পারেনি। ব্রিটিশ সরকার পেরেছিল কিনা ভগবান জানেন। কিন্তু মুখে তারা সে-কথা কোন-দিনই স্বীকার করেনি। হয়তো তার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কোম্পানীর যুগের মত ব্রিটিশ যুগে দেশীয় রাজারা কোনদিনই

ব্রিটিশ সরকারের সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি; বরং, তারাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিনা মাইনের চাকর।

ব্রিটিশ সরকারের সত্যিকারের কাঁটা হল ব্রিটিশ-ভারত। একে নিয়েই তাদের ঝুটঝামেলার অন্ত নেই আর। যতই দিন যাচ্ছে ততই স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠছে। জেল, গুলি, ব্যাটন, কয়েদ, অ্যাক্ট দিয়েও এখানকার মানুষগুলোকে শায়েস্তা করা যাচ্ছে না; বরং যতই অত্যাচার বাড়ছে ততই প্রতিরোধ-আন্দোলন শক্তি জোরদার হয়ে উঠেছে।

মনে মনে তারা যতই গজরাক, আমেরিকাতে ব্রিটিশ সরকার যে ভুল করেছিল, ভারতে আর যাতে সেই ভুলের খেসারত দিতে না হয় সে-সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল। তারা জানত আজই হোক আর দুদিন পরেই হোক, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসই হোক, বা, পূর্ণ-স্বাধীনতাই হোক, একটা কিছু ব্রিটিশ-ভারতকে দিতে হবে। দিতে যখন হবেই তখন সেটা যতখানি আপসের মধ্যে দিয়ে দেওয়া যায় ততই ভাল। এদেশে ব্রিটিশ সরকারের অনেক টাকার কারবার রয়েছে। সেগুলো যাতে বাঁচে সে-চেষ্টা করতে হবে তো!

যদি ব্রিটিশ-ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে চলে আসতে হয়, তাহলে ভারতীয় রাজ্যগুলির অবস্থা কী হবে? সে-সম্পর্কেও ব্রিটিশ সরকার মোটামুটি রকমের নিশ্চিন্ত ছিল। শাসন-ব্যবস্থার দিক থেকে ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক কোনদিনই ছিল না, অথচ ব্রিটিশরা ভারত থেকে চলে এলে, দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে প্যারামাউণ্টসির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের যে সব লিখিত এবং অলিখিত চুক্তি হয়েছিল সেগুলিও স্বাভাবিক ভাবেই নাকচ হয়ে যাবে। যেহেতু ব্রিটিশ-ভারতের উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বাধীন ভারতীয় সরকারের হাতে তাদের তুলে দেওয়া যাবে না, সেই হেতু ব্রিটিশ-ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজারাও স্বাধীন হয়ে যাবে।

এইটিই ছিল ব্রিটেনের সরকারী নীতি।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই ধরণের একটি অদ্ভুত নীতি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেছিল কেন ?

এই প্রশ্নের দুটি উত্তর হতে পারে।

প্রথমটি হল, ব্রিটিশ ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেশীয় রাজ্য-গুলিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা। এর ফলে, খণ্ডিত ভারত যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে না। দ্বিতীয়টি হল, ব্রিটিশ জাতের রক্ষণশীলতা। পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাকিংহাম প্যালেসের ওপরে ওদের আকর্ষণ দুর্নিবার। রাজা, রাণী, লর্ড বলতে ওরা অজ্ঞান। সব দেশের রাজা-মহারাজদেরই ওরা নির্বিবাদে শ্রদ্ধা করে এসেছে। ভারতীয় রাজাদের ওপরেও ব্রিটিশ সরকারের একটা আঁতের টান জন্মেছিল। হাজার হোক, প্রাচীন রাজবংশ। নির্বিষ সাপ হলেও, ফনাটা তাদের বেশ রংদার, প্রাচীন ভারতের লুপ্ত কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এরা। এদের কথা বলতে গিয়ে মাইকেল এডওয়ার্ড বলেছেন:

The British had a sentimental attachment to the native states, a typical nostalgia for past glories. These 'Kingdoms of yesterday' claimed to be the true heirs of pre-British India, but generally speaking, they were islands of mediaevalism out of touch with the realities of the modern world.

অর্থাৎ, দেশীয় রাজ্যগুলির ওপরে ব্রিটিশ সরকারের একটা আবেগময় আসক্তি জন্মেছিল ; অতীত গৌরবের প্রতি একটা রুগ্ন মোহই এর জন্যে দায়ী। এই সব 'গতকালের সাম্রাজ্যগুলি' নিজেদের প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে দাবি করত, কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে ওইগুলি ছিল মধ্যযুগের ঘাঁটি, আধুনিক যুগের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে ওদের সত্যিকার কোন সম্পর্ক ছিল না।

কথাটা অমূলক নয়। কিছু বড় বড় দেশীয় রাজ্য বিটিশ ভারতের আইন-কানুন আর শাসন-তান্ত্রিক কাঠামো সীমাবদ্ধ-ভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু উনিশ শ' উনিশ সাল পর্যন্ত সে-গুলির সঙ্গে অধিকাংশ স্বৈরাচারী রাজাদের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ কোন মিল ছিল না। কুয়োর ব্যাং-এর মত নিজের-নিজের রাজ্যের মধ্যেই রাজারা হাঁক-ডাক করত, পাশাপাশি রাজ্যের দিকে তাকানোর সময় থাকত না তাদের।

আর তাকাবেই বা কে কার দিকে? সব শেয়ালেরই এক রা। চলা-ফেরা এক, নীতি এক। খাও-দাও স্ফূর্তি কর, আর প্রজাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙো। পলিটিক্যাল দপ্তরকে শিরোপা দিয়ে নিজের শিরটা নিয়ে বেঁচে থাকো, আর মাঝে মাঝে ধড়াচূড়া পরে ভাইসরয়-এর দরবারে গিয়ে নজরানা দিয়ে এস।

প্রথম প্রথম অবশ্য সরকারী অনুশাসনেই ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে রাজাদের মেলামেলা করতে দেওয়া হত না। এমন কি রাজাদের পারস্পরিক মেলামেশাও পছন্দ করত না ব্রিটিশ সরকার; কী জানি, আবার যদি ওরা সবাই জোট বেঁধে ঘোঁট পাকিয়ে তোলে?

কিন্তু এই ভাবে বেশি দিন ওদের অন্ত্যজ করে রাখা সম্ভব হয়নি। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির ধাপে ধাপে পরস্পর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কতকগুলি অর্থ-নৈতিক বিষয়ে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যেই সীমানার দেওয়ালগুলি ভেঙে দেওয়া হল। ডাক-তার বিভাগ, কারেন্সী আর রেলগাড়ি রাজ্যও মানে না, রাজত্বও মানে না। সারা ভারতবর্ষ জুড়েই তাদের অপ্রতিহত গতিবিধি। এতদিন পর্যন্ত দেশীয় রাজারা নিজেদের খেয়ালখুশি মত বৈদেশিক বানিজ্যের জন্যে শুল্ক আদায় করত। ফলে, ব্রিটিশ-ভারত আর খোদ ব্রিটেনে যে-সব পণ্য উৎপাদন হত, দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে তাদের বাজার কমে আসতে লাগল। যাতে তা না হয়, যাতে সহজভাবে পণ্যগুলি

২

সারাভারতের বাজারে ঢুকতে পারে এই উদ্দেশ্যে নিয়ম করা হল, ব্রিটিশ-ভারতে শুল্কের যে হার থাকবে তার চেয়ে বেশি হার ধার্য করার ক্ষমতা কোন দেশীয় রাজ্যের থাকবে না। এইসব নানা কারণ আর প্রয়োজনে দেশীয় রাজ্য আর ব্রিটিশ-ভারতের মধ্যে একটা সহজ লেন দেনের ব্যবস্থা গড়ে উঠল।

সবই সত্যি। সেই সঙ্গে এটাও সত্যি যে উনিশ শ উনিশের আগে ভারতের এই দুটি অঙ্গকে একসঙ্গে গাঁথার কোন পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না; এমন কি উনিশ শ' পঁয়তিরিশের আগে ওরকম কোন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার নিয়ে সক্রিয়ভাবে কেউ মাথাও ঘামায় নি কোনদিন।

ঘামায়নি কেন, তার পেছনে ব্রিটিশ সরকারের একটা নীতি যে বহাল তবিয়তে বলবৎ ছিল সেটা আমরা জানি। সেটা হল প্যারা-মাউন্টসি।দেশীয় রাজ্যগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি প্রতিষ্ঠান, কেউ করদ রাজ্য কেউ বা মিত্র। তাদের টেনে এনে খাস তালুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে রাজন্যবর্গ হৈ-চৈ কিছুটা করতই, তাছাড়া ছিল অনেক শাসনতান্ত্রিক ঝুটঝামেলা, তারও ওপরে ছিল আন্ত-র্জাতিক চাপ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটেনকে একেবারে দ'য়ে মজিয়ে দিয়েছিল। নতুন চাপ সহ্য করা তার পক্ষে কষ্টকর।

দ্বিতীয় কারণ আরও একটু সূক্ষ্ম। ব্রিটিশ ভারতে উনিশ শ উনিশের পর থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে রকম জোরদার হয়ে উঠেছিল তাতে ব্রিটিশ সরকার এমনিতেই বেশ কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে দেশীয় রাজ্যগুলির পৃথক অস্তিত্ব এবং অকংগ্রেসী মনোভাব তাদের কাছে বর হয়েই দেখা দিয়েছিল।

তাছাড়া, রাজারাও এই অন্তর্ভুক্তি মেনে নিতে পারে নি। মেনে নিলে, প্রভুত্বের যে আসনে বংশ-পরম্পরায় তারা জগদীশ্বরের মর্যাদা নিয়ে বসেছিল, সেই অবিসংবাদিত আসন ধ্বসে পড়ত, অবসান ঘটত তাদের স্বৈরাচারের। পৃথিবীতে এমন মূর্খ কে রয়েছে যে নিজের

পায়ে কুড়োলের ঘা বসাতে এগিয়ে আসে ? তাছাড়া, অতুল ঐশ্বর্যই বা তারা শুধু শুধু ছেড়ে দেবে কেন ?

প্রজাদের দিক থেকেও অশান্তি ছিল না কিছু। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা স্বাধীনতা অর্জন করার জন্যে ব্রিটিশ-ভারতের মত কোনদিনই আন্দোলন করে নি। ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকায়, স্বাধীনতাই বা কী, আর আন্দোলন বলতেই বা কী বোঝায় তা তাদের মাথায় ঢোকে নি কোনদিন। রাজা আর রাজপুরুষদের পেট মোটা করার জন্যে সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছে তারা, বিদ্রোহ করে নি তবু। দারিদ্র্যের বোঝা ছেলেমেয়েদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছে। তবু রাজাদের গায়ে হাত তোলার কথা কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি। রাজার হুকুম অমান্য করার মত সাহস ছিল না তাদের। রাজারাই ছিল তাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা, মর্ত্যলোকে ভগবানের অবতার। তাদের বিরুদ্ধে আপীল চলত না কারও, একটি নির্জীব জীবন-যাত্রায় জন্ম-জন্ম ধরে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তারা।

সেই গতানুগতিকতায় কোন রকম ছন্দপতন যাতে না ঘটে, সেদিক থেকে রাজারাও অত্যন্ত সজাগ ছিল। স্টেটের মধ্যে যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না বাঁধে সেদিক থেকেও সচেতন ছিল রাজারা, ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ যাতে দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ঢুকতে না পারে তার ব্যবস্থা করতেও কার্পণ্য করে নি তারা। সেদিক থেকে ব্রিটিশ রেসিডেন্টরাও তাদের যথাশক্তি সাহায্য করেছে।

কিন্তু এই সময়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস করছিল কী ? না, কিছু করে নি। কারণ, এই সব রাজাদের নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামানোর সময় ছিল না তার। তখনও সে অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তখনও তার সংগঠন জোরদার হয় নি। উগ্র বামপন্থী, মুসলীম লীগ, আর গান্ধীজির সত্যাগ্রহ, এই সব নিয়েই জাতীয়তাবাদী দলগুলি তখন নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে। ব্রিটেনের সত্যভাষণ আর

বদান্ততার ওপরে তখনও তারা আস্থা হারায় নি। সেই আস্থার ওপরে নির্ভর করেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে টাকা, সৈন্য, আর রসদ দিয়ে ব্রিটেনকে সাহায্য করেছে কংগ্রেস।

কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে তার প্যাঁচ কষার বহর দেখে কংগ্রেসের চোখ দুটো ট্যারা হয়ে গেল। মহামান্য তিলক গর্জন করে উঠলেন। তাঁরই নেতৃত্বে কংগ্রেসের জঙ্গী সদস্যরা চোখ পাকিয়ে ব্রিটিশ তথা ভারত-সরকারের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। গান্ধীজি এলেন অহিংসা আর সত্যাগ্রহের অস্ত্র নিয়ে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোটি কোটি জনসাধারণ কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় এসে জমায়েত হল।

চুপ করে বসে থাকার বান্দা ব্রিটিশ সরকার নয়। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের টাইট দেওয়ার জন্যে সে-ও কালা কানুনের সঙ্গীন উঁচিয়ে রুখে দাঁড়াল, দু'মুখো সাপের মত ভেলকি খেলতে লাগল। এক মুখে দিল চুমু, আর এক মুখে ছোবল। উনিশ শ' উনিশে শাসন-সংস্কারের নামে ভূষিমাল পাচার করার চেষ্টা হল। এল রাওলাত আর সিডিসন অ্যাক্ট, এল জালিয়ানওয়ালাবাগের ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড, এল সাইমন কমিশন। বয়কট করল কংগ্রেস, বয়কট করল মুসলীম লীগ। কোটি-কোটি মানুষ গর্জন করে উঠল একসঙ্গে। বরবাদ কর কমিশন। জাহান্নামে যাক তোমাদের দান-খয়রাতের দম্ভ। দেশময় শুরু হল তুমুল হট্টগোল, শুরু হল গণবিক্ষোভ। সে-বিক্ষোভ সিপাহীযুদ্ধের মত সশস্ত্র না হলেও, বিচ্ছিন্ন নয়, অনেক বেশী সঙ্ঘবদ্ধ। জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশব্যাপী বিপুল আন্দোলন গড়ে উঠল।

উঠল বটে, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ রইল ভারত-সরকারের খাসতালুকে। দেশীয় রাজাদের ভূমিকা পূর্ববৎ, অর্থাৎ আঠারশ' সাতান্ন সালে তারা যেমন চুপ করে রং-তামাসা দেখছিল, এবারেও তাই দেখল। ঠিক দেখল বলা চলে না, দস্তুরমত প্রতিবন্ধকতা

সৃষ্টি করল। তারই ফলে, ভারত সাম্রাজ্যের আন্দোলন দেশীয় রাজ্যের ভেতরে ঢুকতে পারল না।

কংগ্রেস তা ঢোকানোরও চেষ্টা করে নি, কারণ দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে কংগ্রেস তখনও কোন সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করে নি। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গান্ধীজি বলেছেন :

I have often declared that the Congress should generally adopt a policy of non-interference with regard to questions affecting Indian States······we can put our house in order only when British India has attained Swaraj. (৯)

আমি অনেকবার বলেছি যে কংগ্রেসের নীতি মোটামুটি এমন ভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত যা ভারতীয় স্টেটগুলির পক্ষে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ স্বরাজ লাভ করলে তবেই আমরা আমাদের ঘর ঠিক করতে পারব।

গান্ধীজির এই রকম ঢালোয়া উক্তিতে স্টেটের রাজাদের দুর্ভাবনার কিছু ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় রাজন্যবর্গের মত অদূরদর্শী ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের যত দোষই থাক তারা রাজনীতি বোঝে না এত বড় অপবাদ তাদের শত্রুরাও দিতে পারবে না। কংগ্রেসকে তারা বিশ্বাস করতে পারে নি। তিলকের চেলাদের তিলকে তাল করতে বেশী সময় যায় না। যদিও উনিশ শ' কুড়ি সাল থেকেই গান্ধীজি কংগ্রেসের হাল ধরেছেন, তবু, 'লেখনৌ প্যাক্ট'-এর দৌলতে জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে। উনিশ শ' সাত চল্লিশের কথা ভাবতে না

(৯) Gandhiji's Presidential address at the 3rd Political conference held at Bhavnagar on 8th January 1925. 'The Indian States Problem' by M. K. Gandhj

পারলেও ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল যে এইসা দিন নেহী রহেগা। ঝুট-ঝামেলা কংগ্রেস পাকাবেই। গুলি, ব্যাটন, আকৃট, কমিশন আর রাজার বেশধারী কয়েক শ' বিদূষককে মুলধন করে ওদের বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

গোদের ওপরে বিষফোঁড়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জোড়াতালি দিয়ে ব্রিটেন জিতল বটে, কিন্তু ঘরে-বাইরে প্রেসটিজ বলে তার আর কিছু রইল না। দেনার পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে গেল ব্রিটেন। ওদিকে আবার আমেরিকাকে নিয়ে আর এক ফ্যাসাদ। দুর্দিনের বন্ধু আমেরিকা যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই তার অজস্র জাহাজ পণ্যসম্ভারে বোঝাই করে মাঝদরিয়ায় ভাসিয়ে দিল। এতদিন ধরে বিদেশের হাটে একচেটিয়া ব্যবসা করত ব্রিটেন। সে-সব জায়গায় নাক গলালো আমেরিকা। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হটে গিয়ে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে ব্যবস্থার বাইরে চলে গেল। যুদ্ধ জয় করে দেউলিয়া হওয়ার নজির এক ব্রিটেন ছাড়া পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোথাও নেই।

একেই বলে ভাগ্যের মার। পার্লামেন্টের লেবার সদস্যরা মার-মার কাট-কাট করে উঠলেন। একে ভাঁড়ে মা ভবানী, আবার কেষ্টারে ডেকে আনি। কলোনী তো নয়, এক একটি শ্বেত হস্তি। মারো গোলি। ভারতের পেছনে আর স্টারলিং খরচ করে লাভ নেই। ও আপদ ঝটপট ঘাড় থেকে নামাও। আপনি বাঁচলে তবে তো পিতৃপুরুষের নাম। মানের চেয়ে জানটা অনেক মূল্যবান দাদা।

এই রকম ডামাডোলের বাজারে ব্রিটেনের কনসারভেটিভ সরকার যে নাজেহাল হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী রয়েছে? ভারতবর্ষকে ছেড়ে দেওয়ার মত কলিজা কনসারভেটিভ সরকারের ছিল না। কিন্তু রাজনীতির মত চোরাবালি পৃথিবীতে আর কিছু নেই। তাছাড়া, ঘরের শত্রু বিভীষণ ওই লেবার পার্টি।

অতএব সে রকম দুর্ঘটনা যদি ঘটে, অর্থাৎ ভারতকে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেই হয়, তাহলে অন্য কোন দিক থেকে সে ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে হবে।

অন্য দিক বলতে ভারতবর্ষে তখন ওই একটা দিকই ছিল। সেটা হল দেশীয় রাজ্য। ওখানকার রাজারা গান্ধী, তিলক, লাজপত, চিত্তরঞ্জন, মতিলালের মত ব্রিটিশ-বিদ্বেষী নয়। ব্রিটেনের সত্যিকার মিত্র। ওদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, এবং তা স্বার্থের খাতিরে। ওরাই হবে লর্ড ক্যানিং-এর ভাষায় সত্যিকারের 'break water', যদি না চাপে পড়ে ওরা নিজেরাই শেষ পর্যন্ত চুরমার হয়ে যায়।

কী করে তা সম্ভব হবে? সম্ভব হবে যদি ওদের একটা জোটের মধ্যে আনা যায়। কিন্তু ওই সব আত্মম্ভরী, শিরোপাসর্বস্ব রাজাদের একসঙ্গে মেলানোও যে কষ্টকর। নিজের নিজের এলাকার মধ্যে বসে ধড়াচূড়া পরে ওরা কেবল ঘ্যানর-ঘ্যানর করছে। কিন্তু তাই বলে তো আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। রাজা হয়েও রাজনীতিতে ওরা যে পোক্ত হতে পারে নি তার জন্যে দায়ী ব্রিটিশ সরকার। ওরাই রাজাদের কলের পুতুল বানিয়েছিল। এখন বিপদ বুঝে ওরাই সামনে এগিয়ে এল। ব্রিটেনের কনসারভেটিভ সরকার আর ভারতের পলিটিক্যাল দপ্তর জোট পাকানোর জন্যে রাজাদের ক্রমাগত তাতাতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত চাপে পড়ে উনিশ শ' একুশ সালে দেশীয় রাজারা একটি জোটে মিলিত হল। ওই বছরেরই আটই ফেব্রুয়ারী সরকারী ঘোষণায় 'চেম্বার অফ প্রিনসেস'-এর জন্ম হল। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত মূষিক প্রসব করল পর্বত।

The ceremony of inauguration was performed by the Duke of Connaught, on behalf of the King Emperor, in the Dewan-i-am of the Moghul Red Fort in Delhi.

ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এই জোটই সোচ্চার প্রতিবাদ তুলে বৃহৎ ভারত থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বলে প্রচার করতে লাগল।

জোট একটা তৈরি হল বটে; কিন্তু সবাই জুটল না। হায়দারাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি কয়েকটি বড়-বড় স্টেট সাফ কথা জানিয়ে দিল ঃ ওসব জোট ফোটের মধ্যে আমরা নেই। কয়েক শ' চিল্লাদারদের হাত থেকে নিজেদের রাজ্য বাঁচানোর তাগদ আমাদের রয়েছে। তাছাড়া, ওই সব চ্যাং-ব্যাংদের সঙ্গে একাসনে বসতে আমরা নারাজ। ওতে আমাদের প্রেসটিজ পাংচার্ড হয়ে যাবে।

অগত্যা, মাঝারি ধরণের কয়েকটি স্টেট নিয়েই সংগঠনটি গঠিত হল। ভাইসরয় হলেন এর সভাপতি। ঠিক হল, প্রতি বছর সভ্যদের মধ্যে থেকে চ্যানসেলর আর একজন প্রো-চ্যানসেলর নির্বাচিত হবেন। এর প্রাথমিক সদস্য হল একশ' আট জন। এদের সকলেই ছিল কামান দাগা রাজা; অর্থাৎ, ব্রিটিশ-ভারতের কোন শহরে এরা পায়ের ধূলো দিলে পদমর্যাদা আর কুলগৌরবের অনুপাতে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কামান দাগা হ'ত। এরা ছাড়া ছিল সেই সব রাজারা ভাইসরয় যাদের সভ্য হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করতেন। এদের বাদ দিয়ে ছিল আরও বারো জন সদস্য। ছোট-ছোট রাজ্যের রাজাদের মধ্যে গ্রুপ ভোটিং-এর মাধ্যমে নির্বাচিত করা হ'ত এদের।

এত করেও সবাইকে জোটে ঢোকানো গেল না; বাদ পড়ল অনেকে। ফলে ছোট ছোট রাজাদের কাছে চেম্বারটি মোটেই চিত্তাকর্ষক হয়নি। রুই কাতলাদের ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে নাক গলানো এদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল। এদের সম্মান দেখানোর জন্যে কোন তোপধ্বনি করা হত না, রাজন্যবর্গের সমাজে এরা ছিল সত্যিকারের অন্ত্যজ। অভিজাত সমাজে হরিজনদের ঢুকতে দেওয়াটা ভারতবর্ষের রীতি নয়।

উনিশ শ' একুশ থেকে উনিশ শ' তিরিশ সাল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অগ্নিগর্ভ সময়। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজি তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ জওহরলালকে টেনে এনেছে কংগ্রেসের আঙিনায়। সুভাষচন্দ্র আই, সি, এস-এর চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। জিন্নাসাহেবের সঙ্গে কংগ্রেসের ঘোরতর মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, এবং তিনি কংগ্রেস থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদীতে ছেয়ে গিয়েছে দেশ। বিপুল মাত্রায় বেড়ে উঠেছে কংগ্রেসের জনসংযোগ।

কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা দেখে রাজাদের দল হকচকিয়ে গেল। বাপরে বাপ! এ আবার কোন দেশী যুদ্ধরে বাবা! ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিদেনপক্ষে একখানা ছুরিও নেই। রয়েছে শুধু এক স্লোগান। লাখ-লাখ, কোটি কোটি মানুষ একসঙ্গে স্লোগান তুলে দাপাদাপি করছে। সেই বিরাট জনতরঙ্গকে রোধ করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারেরই কালঘাম ছুটছে, দেশীয় রাজাদের তো ভির্মি যাওয়ার অবস্থা। বাঁধ ভেঙে ওই সব শোনপাংশুর দল একবার ভেতরে ঢুকে পড়তে পারলেই ব্যস্, বিলকুল খতম হয়ে যাবে।

মাথায় হাত দিয়ে বসল দেশীয় রাজারা।

হায়দারাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ওরা না হয় কিছুটা ঠেকা দিতে পারবে, মানে, পারলেও হয়তো পারতে পারে। কিন্তু আমাদের অবস্থাটা কী হবে? শেষ পর্যন্ত ওই গান্ধী, জিন্না, চিত্তরঞ্জন, জওহরলাল আর সুভাষ বোসের হাতে আমাদের ছেড়ে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার পিটটান দেবে না তো?

বড়ই চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল রাজাদের!

কী স্যার, কী হবে আমাদের? কিছু বলুন?

হোগা, হোগা—সাহস দেয় ব্রিটিশ সরকার।

ক্যা হোগা, ক্যাইসে হোগা বলিয়ে তো জি—সংশয়ে মাথা নাড়ে রাজারা।

বলব, বলব। দাঁড়াও না কিছুটা।

আর কত দাঁড়াব? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পায়ে যে বেদনা ধরে গেল।

কথাটা ঠিক।

কিন্তু বলবেই বা কী? আর বলবেই বা কে?

রাজারা কিন্তু নাছোড়বান্দা। ব্রিটেনে তাদের প্রতিপত্তিশালী অনেক মুরুব্বি ছিল। ভারতবর্ষেও তাদের খুঁটি কম জোরালো নয়। এদেরই সমবেত প্রচেষ্টা আর চেম্বারের আর্জি-আপীলে ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

তদানিন্তন ভারতসচিব কনসারভেটিভ লর্ড বারকেনহেড উনিশ শ' সাতাশ সালের ষোলই ডিসেম্বর একটি কমিটি গঠন করলেন।

কমিটির নাম হল, 'বাটলার কমিটি।' এই কমিটির নেতা হলেন স্যার হারকোর্ট বাটলার; সদস্য হলেন অধ্যাপক ডব্লিউ. এস. হোল্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, আর অনারেবল এস. সি. পিল।

ভারতীয় রাজাদের অবস্থা আর চাহিদা পরীক্ষা করে একটি রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ ছিল ওই কমিটির ওপরে।

জোরদার আলোচনা চলল ইংলণ্ডে। তদ্বির তদারকিতে কোন গাফিলতি ছিল না রাজাদের। প্রচুর টাকা খরচ করে একদল ঝানু ব্রিটিশ আইনজ্ঞ নিয়োগ করেছিল ওরা। কেবল আইনের দিক থেকেই ঝানু নয়, ওপরতলার সরকারী মহলের সঙ্গেও তাদের দহরম-মহরম ছিল প্রচুর। এই দলের নেতা ছিলেন স্যার লেস্‌লি স্কট।

আলোচনা বা গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল 'প্যারামাউণ্টসি'; অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ভারতীয় রাজ্যগুলির কী সম্পর্ক ছিল, এবং শেষ পর্যন্ত সেই সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল

সেইটা। আসলে অতীত নিয়ে রাজারা এতটুকু ব্যস্ত ছিল না; উদ্বিগ্ন ছিল ভবিষ্যৎ নিয়ে। ব্রিটিশ-ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে ভারতীয় রাজ্যগুলির অবস্থা কী হবে, সেইটাই স্পষ্ট করে জানতে চেয়েছিল রাজারা।

কাঠ-খড় পোড়ানো হল অনেক। আগুন যতটা জ্বলল তার চেয়ে অনেক বেশী সৃষ্টি হল ধোঁয়া। গাদা-গাদা আইনের বই, 'স্ট্যাটিউটস', 'ইনট্রুমেন্টস' ঘাঁটা হল। পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র এই নিয়ে সেকেলে টিকিধারী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মত কুট-তর্কের সঙ্গে ন্যায়-অন্যায়, জল্পনা-কল্পনার জারক রস মিশিয়ে যে উঁচু পর্যায়ের আলোচনা হল তার সরল ব্যাখ্যাটা আমাদের কাছে বিশেষ বোধগম্য নয়। তবে এটা বেশ বোঝা গেল যে স্কট সাহেব প্যারামাউন্ট-সির যে ভাষ্য করলেন, বাটলার সাহেব তা মেনে নিতে রাজী হলেন না। তাঁর মতে শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে ব্যবহার না করে সমাজ-তাত্ত্বিক অর্থে ব্যবহার করতে হবে; কারণ দেশীয় রাজাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্কটা নিছক কতকগুলি লিখিত মামুলি শর্তের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠেনি, বরং অলিখিত শর্তগুলিই (যাকে আমরা 'ভদ্রলোকের চুক্তি' বলি) সেখানে ছিল বেশী। ঘটনা আর দুর্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, যুক্তি, চিন্তা, আর পারস্পরিক বোঝাপড়া, ইতিহাস এবং বাস্তব জগতের প্রয়োজনভিত্তিক নানা জটিলতার ভেতর দিয়ে উভয়ের মধ্যে যে নিগূঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাকে অত সহজে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। সম্পর্কটি একদিন জীবন্ত বৃক্ষের মত অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই পল্লবিত হয়ে উঠেছিল, আর সেই সম্পর্ক এখনও এতটা মৃত হয়নি যে তাকে তাড়াতাড়ি কবরস্থ করতে না পারলে পচা গন্ধে চারপাশ ভরে উঠবে।

সবই সত্যি। কিন্তু কোন্‌টা বৃক্ষ আর কোন্‌টা তার শাখা?

বাটলার সাহেবের মতে এ-প্রশ্ন অবান্তর। যার চোখ রয়েছে সে-ই বলে দিতে পারে কোন্‌টা কাণ্ড আর কোন্‌টা কুষ্মাণ্ড। যাঁরা

বলেন ব্রিটিশদের সংস্পর্শে আসার আগে দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন ছিল, তাঁরা ইতিহাস পড়েন নি। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি বলতে যা বোঝা যায়, তা কোনদিনই এই সব দেশীয় রাজ্যের ছিল না। তাদের কেউ ছিল মুঘল সম্রাটের অধীন, কেউ-কেউ বা মারাঠা শক্তির তাঁবেদার; আবার কেউ-কেউ ছিল শিখ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। কোন কোন রাজ্যকে ব্রিটিশ সরকার শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করে আশ্রয় দিয়েছিল; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ভেঙে-চুরে নতুন সাম্রাজ্য গঠন করেছিল।

It was not historically correct to assume that when the States came into contact with the British Power they were independent, each possessed of full sovereignty···In fact, none of the States had ever had international status. Nearly all of them were subordinate or tributary to the Moghul Empire, the Mahratta Confederacy or the Sikh Kingdom, and were dependent on them. Some were rescued by the British and others were created by them. (৭)

এই দেশীয় রাজ্যগুলির উৎপত্তি কী করে হল সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কে. এম. মুন্সী বলেছেন:

Most of the States have their origins and existence due to the blessings of the British Raj. Only 18 of the states and estates were in existence in the middle of the 17th century. Of those, only a few could look back to kingly lineage. The premier family, besides that of Travancore, was that of Guhilaputras or Gheloto, to which the rulers of Partapgarh, Vansvada, and Dungarpur belonged; its main branch, the Sisodia, ruled over Udaipur.

The Guhilaputras could trace their descent back to Bappa Rawal who had carved out for himself the principality of Mewad after the dissolution of the Gupta Empire in the

---

(৭) V. P. Menon : Integration of the Princely States—P. 23

6th century. Rana Protap was a descendent of this family.

The founders of the houses of Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Sirohi, Bundi etc. acquired their principalities in the 9th and the 10th centuries as the feudatories or generals of the Imperial Gurjaras of the Pratihara Clan, who ruled from Kanauj as the Maharajadhiraj of the Aryavarta.

The founders of other Rajput States were refugees who had bravely escaped with their followers from the grasping tentacles of the Sultanate of Delhi to found small principalities in inaccessible tracts. Among these were the Houses of Orcha, Datia, Samthar, and Sikkim.

The only pre-Mughal Muslim State of Inda in 1935 was Kalat.

The only Hindu State founded through military resistance to the Mughals was Shivaji's. But the sovereignty which he acquired by great statesmanship and courage, was given up when his successors got their rule validated by recuring a grant from the Mughal Emperors. The sole representative of Shivaji's line in 1935 was the Maharaja of Kolhapur.

Most of the remaining States came into existence after the break-up of the Mughal Empire due to the Britlsh policy.

At no time did the States claim or possess sovereign power. Such quasi-independence as they enjoyed was rendered possible by the British support. Mysore, the premier Hindu State of the south was reformed by the British in 1881, while the State of Benares in 1911. (৮)

ব্রিটিশ রাজের আশীর্বাদেই অধিকাংশ ভারতীয় রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল ; তাদের অস্তিত্বও বজায় ছিল তারই বদান্যতায়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্টেট আর এস্টেট মিলিয়ে মাত্র আঠারোটি রাজ্য বর্তমান ছিল। তাদের ভেতরেও মাত্র কয়েকটি সরাসরি রাজবংশ থেকে এসেছিল। ত্রিবাঙ্কুর ছাড়া আর যেটি প্রাচীন

---

(৮) K. M. Munshi : The End of an Era.

রাজবংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল সেটি হচ্ছে গুহিলাপুত্রদের রাজ্য। প্রতাপগড়, বংস্বদ, আর ডুংগরপুরের শাসনকর্তারা এই রাজ্যের মানুষ। এদেরই একটি প্রধান শাখা শিশোদীয় বংশ উদয়পুর শাসন করত।

বাপ্পারাও-এর বংশধর এই গুহিলাপুত্রেরা। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পরে বাপ্পারাও এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশেই রাণা প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আর্যাবর্তের মহারাজাধিরাজ ছিল প্রতিহার বংশের গুর্জর রাজ-বংশ। এই বংশের রাজধানী ছিল কনৌজ। এদের অধীনস্থ শাসনকর্তা বা সৈনাধ্যক্ষ হিসাবে জয়পুর, যোধপুর, জয়শলমীর, সিরোহী, বুন্দি প্রভৃতি দেশের রাজারা নবম আর দশম শতাব্দীতে তাঁদের রাজ্যের পত্তনি করেন। এই সব রাজারা ব্রিটিশ রাজত্বের সময়েও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মোটামুটি অনেকাংশে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দিল্লীর সুলতানের সর্বগ্রাসী কবল থেকে বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে পালিয়ে এসেছিলেন আর কিছু রাজপুত বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দুর্গম পাহাড়ের উপত্যকায় তাঁরা ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই বংশের কয়েকটি নাম হচ্ছে অর্কা, দাতিয়া, সম্থর, আর সিকিম।

উনিশ শ' পঁয়তিরিশ সালে ভারতে প্রাক-মুঘল যুগের একটি মাত্র মুসলিম স্টেট বর্তমান ছিল। তার নাম হচ্ছে কালাত। মুঘলদের সঙ্গে লড়াই করে একমাত্র শিবাজীই স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজনৈতিক দূরদর্শীতা আর সাহসের সঙ্গে তিনি যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর বংশধরেরা মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করে পরবর্তীকালে সেই সার্বভৌমত্ব নষ্ট করে ফেলেন। উনিশ শ' পঁয়তিরিশ সালে শিবাজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হচ্ছেন কোলাপুরের মহারাজা।

মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর ব্রিটিশ নীতির পরিপোষক হিসাবেই বাকি স্টেটের অনেকগুলিই জন্মগ্রহণ করেছিল।

কোন সময়েই এই সমস্ত স্টেট নিজেদের সার্বভৌম বলে স্বীকার করে নি; সার্বভৌমত্ব কখনও তাদের ছিল না। তারা যেটুকু আধা-স্বাধীনতা ভোগ করত, সেটাও ব্রিটিশদের দৌলতে। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য মহীশূর আঠারো শ' একাশীতে ব্রিটিশরাই নতুন করে গড়ে দিয়েছে, বেনারসের নতুন সীমানা নির্ধারিত করেছে, উনিশ শ' এগারোতে।

সুতরাং দেশীয় রাজারা যে 'স্বাধীনতা স্বাধীনতা' বলে চেঁচাচ্ছে সেটা কী? তারা কোন্ জন্মে স্বাধীন ছিল? ব্রিটিশ সরকার তাদের যেটুকু স্বাধীনতা দিয়েছিল তা যে-কোন সময়ে মাথায় গাঁট্টা বসিয়ে কেড়ে নিতে পারত। তাই, বাটলার কমিটির মতে 'প্যারামাউন্টসি' একটা নিছক চুক্তি নয়; ওর সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের অনেক দায় আর দায়িত্ব জড়িয়ে রয়েছে। ওই শব্দটাকে পরিষ্কার করে বিশ্লেষণ করা যায় না।

The Committee refused to define paramountcy but asserted that 'paramountcy must remain paramount'; It must fulfil its obligations, defining or adapting itself according to the shifting necessities of the time and the progressive development of the States. (১)

অনেক আলোচনা আর শলা-পরামর্শের পরে বাটলার সাহেব তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন; তিনি মেনে নিলেন স্যার লেসলি স্কটের চাহিদাগুলি। প্রথম চাহিদা হল, ভারতীয় আইন সভার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য এমন কোন ভারতীয় সরকারের হাতে তার সম্মতির বিরুদ্ধে কোন দেশীয় রাজ্যকে তুলে দেওয়া হবে না—That the rulers should not be handed over without their

---

(১) V. P. Menon : Integration of Princely States.

prior agreement to an Indian Government in British India responsible to an Indian legislature। দ্বিতীয় চাহিদা হল, স্টেটগুলির নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ভবিষ্যতে আর ভারতীয় সিভিল সার্ভিস অথবা ভারতীয় সৈন্য বিভাগ থেকে কোন রাজপুরুষ নির্বাচিত করা উচিত হবে না। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তাদের যেন সরাসরি স্টেটগুলিতে নিয়োগ করা হয়।

The Committee also suggested 'to recruit separately from the universities in England for service in the states alone' instead of the prevailing practice of recruiting for political service from the Indian Civil Service and Indian Army. (১)

অর্থাৎ, ভারত সরকারের সঙ্গে ভারতীয় রাজন্যবর্গের কোন সম্পর্ক নেই। এইটা প্রমাণ করার জন্যেই এত কাঠ-খড় পোড়ানোর চেষ্টা।

বাটলার সাহেবের সুপারিশ এদেশের জাতীয়তাবাদী নেতাদের ভাল লাগল না। অন্যথায়, তাঁরা এটিকে একটি বিপদের সঙ্কেত বলেই ধরে দিলেন। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের উদ্যোগে নিখিল ভারত 'স্টেট পিউপিলস কনফারেন্স'-এর জন্ম হল। স্টেটের রাজাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিনিধিমূলক সংগঠনের ভেতর দিয়ে যাতে প্রতিটি স্টেটে দায়িত্বশীল এবং জনসাধারণের আস্থাভাজন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় সেই উদ্দেশ্যে এই কনফারেন্স-এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। কথাটা সত্যি যে তখনও পর্যন্ত স্টেটের অগণিত জনসাধারণের মধ্যে কোন রাজনৈতিক সংগঠণ দানা পাকায় নি। তবু দেশের এই বিরাট অংশটিকে ছেঁটে বাদ দেওয়ার কথা কংগ্রেসের নেতারা কল্পনাও করতে পারেন নি। কিন্তু নিজের সমস্যা নিয়েই কংগ্রেস তখন এতই ব্যস্ত ছিল যে ঠিক কী ভাবে চললে স্টেটের জনসাধারণ নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, আর কংগ্রেসই বা তাদের কতটুকু সাহায্য করতে পারবে, সে-সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা তার ছিল না।

(১) V. P. Menon : Integration of the Princely State.

ওটা ছিল নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বুকে কয়েকটা ঢিল ছোঁড়ার মত। ঢেউ যদি কিছু ওঠে তো উঠুক। জনসাধারণই তো দেশের প্রকৃত সম্পদ। এই ইঙ্গিত পেয়ে তারা কী ভাবে দেখাই যাক না। জনসাধারণ যদি কিছুটা আত্মসচেতন হয় তা-ই বা মন্দ কী।

কিন্তু বাটলার কমিটি সে-ধার দিয়েই গেল না। সিংহাসনের দামটাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল, আর ব্রিটিশ সরকারও সেই নীতিটি মেনে নিল।

উনিশ শ' আঠাশ সালে ভারতীয় নেতাদের সর্বদলীয় একটি সম্মেলন বসল। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের জন্যে একটি ডোমিনিয়ন শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরী করা। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরী করার জন্যে যে কমিটি তৈরী হল তাকে বলা হয় 'নেহেরু কমিটি'। ধর্ম, সমাজ, আর ইতিহাস, এবং অর্থনীতির দিক থেকে ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে স্টেটের জনসাধারণের যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে এই কথাটাই সম্মেলনের বিবরণীতে যথেষ্ট জোর দিয়ে বলা হয়, এবং যারা এ-দুটি দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির আয়োজন করছে তাদেরও সেই সঙ্গে বেশ কড়া ভাষায় সতর্ক করে দেওয়া হয়।

'It is inconceivable that thc people of the States who are fired by the same ambitions and aspirations as the people of British India will quietly submit to the existing conditions for ever, or the people of British India bound by the closest ties of family, race, and religion to their brethren on the other side of an imaginary line will never make any common cause with them.' (১০)

অর্থাৎ, অচলায়তনের বেড়া থাকলে হবে কী? মূলত, আমরা এক এবং অভিভাজ্য। তাদের আশা-ভরসা আর আমাদের

(১০) K. M. Munshi: The End of an Era.

আশা-ভরসার মধ্যে কোন ফারাক নেই। আমরা একই দেশের অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ, একই আলো আর বাতাসের মানুষ।

বেশ বোঝা গেল স্বৈরাচারী সামন্ত রাজাদের হাতে ভারতীয় স্টেটের অগণিত শোষিত মানুষদের নির্বিবাদে ছেড়ে দিতে কংগ্রেস রাজী নয়। আর, হবেই বা কেমন করে? রাজী হলে, কেবল যে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের আভিজাত্য থেকেই কংগ্রেস বিচ্যুত হ'ত তা নয়, নীতির দিক থেকেও তা হ'ত সর্বৈব গর্হিত।

কংগ্রেসের চালটা একেবারে বানচাল হয়ে গেল না। আগুন একবার কোথাও জ্বললে আশেপাশের জিনিসগুলিকে পোড়াতে না পারলেও, তাদের কিছুটা তাতিয়ে দেয়। কংগ্রেসের আন্দোলন দিন দিন যতই শক্তিসঞ্চয় করতে লাগল, স্টেটের জনসাধারণের মধ্যে যতই তার প্রভাব অনুপ্রবেশ করতে শুরু করল, ততই তারা নিজেদের বিষয়ে একটু একটু করে সচেতন হয়ে উঠতে লাগল।

সত্যি কথা বলতে কি দেশীয় রাজ্যগুলির কোটি-কোটি মানুষ এতদিন সংস্কার-বর্জিত অন্ধ গুহার মধ্যে বাস করছিল। অবশ্য কিছু কিছু সংস্কার যে কোথাও-কোথাও একেবারে হয় নি তা নয়; কিন্তু প্রজাদের কোন প্রগতিশীল অভীপ্সাকে রাজারা প্রশ্রয় দেয় নি। সে শিক্ষা বা সামর্থ্যও ছিল না অনেক রাজার। মহীশূর বা হায়দারাবাদের মত কিছু কিছু বড় স্টেটে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র পরিমিত ভাবে গ্রহণ করা হলেও সে-সব রাজ্যেও জনসাধারণের নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তখনও রাজারা ছিল জগদীশ্বরের কাছাকাছি। রাজ্যের মন্ত্রী, উজির, সেপাই, শান্ত্রীর অখণ্ড প্রতাপ ছিল তাদের ওপরে। সেই প্রতাপকে প্রজারা দলবদ্ধভাবে অস্বীকার করে নি; বরং মেনেই নিয়েছিল, কোথাও কুসংস্কারের জন্যে, কোথাও বাধ্য হয়ে। এদের সামাজিক আর রাজনৈতিক জীবন ছিল অনেকটা চাঁদের 'সি অফ ট্রানকুইলিটি'র মত।

সেইখানে ঢিল ছুঁড়ল কংগ্রেস। দেশীয় রাজ্যের কিছু অংশ

কংগ্রেস নেতাদের ক্রিয়াকলাপকে পিঁড়িলাক্ষের সঙ্গে তুলনা করে গোঁফ চুমরালো বটে, কিন্তু কংগ্রেসের কৌশল একেবারে নিষ্ফল হল না। অনেক রাজ্য (ওদের মধ্যে যাদের মগজে কিছুটা বুদ্ধি ছিল) কিছুটা আশঙ্কিতও হল। স্বাধীনতা জিনিসটা যে ছোঁয়াচে রোগের মত তারা তা জানত। যতই ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখ না কেন, এপিডেমিক কালনাগিনীর মত দেওয়াল ফুটো করে ভেতরে ঢুকে পড়বে। আর কোন রকমে একবার ঢুকে পড়তে পারলে তারাও রেহাই পাবে না। এই তথ্যটা তাদের অজানা ছিল না বলেই, তারা সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের কাছে ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করল : ঐ সব কংগ্রেসী গুণ্ডারা আমাদের শান্তির সংসারে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে। তোমরা ওদের শায়েস্তা কর।

পারুক আর না পারুক, ব্রিটিশ সরকার নিজের গরজেই তা করে এসেছে। কিন্তু লাঠি, ব্যাটন, গুলি—কোন কিছু দিয়েই ওই সব গুণ্ডাদের ঠাণ্ডা বানানো গেল না। ধাপ্পি-ধাপ্পা দিয়ে, চোস্ত চোস্ত ইংরাজী বুলি কপচিয়েও মন ভেজানো গেল না ওদের। ঘুষ-ঘাস দেওয়া হল, অ্যাক্ট, রিফর্ম ঘোষণা করা হল। উঁহু, গুণ্ডাগুলো কিছুতেই টোপ গিলছে না। ভারতের মাটি থেকে পাততাড়ি গোটাতেই হবে ; আজ, না হয়, কাল।

তবু যে ক'টা দিন থাকা যায়। চোরের রাত্রিবাসই লাভ।

কিন্তু তার উপায়ই বা কী ?

উপায়ই বলুন, আর হাতিয়ারই বলুন, তখন ব্রিটিশ চাঁইদের হাতে ওই একটি মাত্র অস্ত্রই ছিল। ভারতকে টুকরো টুকরো করে ফেলা। হাতে মারতে না পার, ভাতে মারার চেষ্টা কর। ওদিকে তো মুসলীম লীগ ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে। সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে ভারতের বুক থেকে দু-চার খাবলা মাংস না নিয়ে তারা শান্ত হবে না। তারপরে এই দেশীয় রাজারা। জিন্নাসাহেবের পাকিস্তান চাহিদার ভেতরে আবদার যতটা ছিল, আইন ছিল তার চেয়ে কম,

নীতি ছিল আরও কম। রাজাদের চাহিদার ভেতরে সবটাই ছিল আইনের (হোক তা ব্রিটিশের তৈরী করা আইন) কথা। পৃথিবীর কাছে যুৎসই সাফাই গাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। প্যারামাউন্টসি হল ব্রিটিশ সরকারের একটি সম্পত্তি। কংগ্রেস চুলোয় যাক, ভারত সরকারেরও কোন এক্তিয়ার তার ওপরে নেই।

মনে-মনে সে যাই ভাবুক, প্রকাশ্যে এইটিই হল তার সকল কথার সেরা কথা। সুতরাং হ্যান্ড্‌স অফ; অর্থাৎ হাত গোটাও, দেশীয় রাজ্যের দিকে নজর দিও না। ওগুলো হল বিদেশী সাম্রাজ্য।

কিন্তু দেশীয় রাজাদের এত সহজে খুশি করা গেল না। কাঁটার খচখচানি কোথায় তারা তা ভালভাবেই জানত। কেবল জানত না তাদের ভবিষ্যৎটা কী? শেষ পর্যন্ত 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা'-র মত হবে না তো?

আরে না, না। আইনের গাঁটছড়ায় তোমরা বাঁধা রয়েছ। সে-আইন বড় জটিল।

কিন্তু যদি হ্যাঁচকা টানে সব ছিঁড়ে যায়?

ছিঁড়লেই হল! মগের মুল্লুক নাকি!

কথাটা একেবারে অসার নয়। মগের বলুন, বর্গীর বলুন—সে সব মুলুক অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন দিন এসেছে ব্রিটিশরাজের। বোঝা বইবার মানুষ ওরা নয়। নিজেদের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে না ওরা।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কংগ্রেস মগও নয়, বর্গীও নয়। আরও শক্তিধর। স্রেফ লেকচার দিয়েই রাজাদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেবে ওই সব পাগড়ীর বারোটা বাজিয়ে। এই সব রাজাদের জন্যে কংগ্রেসের জঙ্গী নেতাদের কোন রকম দরদ ছিল না। আসল বিপদটা যে সেইখানেই। চাপে পড়ে এখন চুপচাপ থাকলেও ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্য মূর্তি ধরবে।

এই রকম বিপদে ভবিষ্যতে যাতে দোস্তদের পড়তে না হয় তারই জন্যে ব্রিটিশ সরকার একটা মতলব ভাঁজল। এই দুটি শিবিরের মধ্যে অসন্তোষ যে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পেরেই ব্রিটিশ সরকার দুটি দলকে একটি সমঝোতায় আনার চেষ্টা করল। উনিশ শ' পঁয়তিরিশ সালের সংবিধানে 'ফেডারেল স্ট্রাকচারটি' এই সব রাজাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্যেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নি। বিশেষজ্ঞদের মতে মুষিক-প্রসব করেছিল মাত্র।

সংবিধানের কেন্দ্রীয় অংশটি যে কার্যকরী হল না তার একটা কারণ এই যে ভারতীয় নেতারা যেটুকু ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষীপাতী ছিলেন, ততটুকু নিতে রাজারা রাজী হয় নি। তারা চিরকালই প্রজাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে এসেছে; এখন নির্বাচনের ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তাদের দ্বারস্থ হবে কেমন করে! ভোট ভিক্ষে চাইতে যাবে কোন্ লজ্জায়! আর চাইবেই বা কেন? দেশীয় রাজ্যগুলিতে তখনও পর্যন্ত গণ-আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। কংগ্রেসের উস্কানিতে যেটুকু আন্দোলন হয়েছিল, বড়-বড় রাজ্যগুলিতে তা পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। তাছাড়া, তখনও পর্যন্ত ঐ আইন ছিল ওদের পক্ষে। ব্রিটিশ সরকার কোন সময়ই বলে নি যে প্যারামাউন্টসির চুক্তি সে মানবে না, বরং এই কথাটাই সে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হাবে-ভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে রাজারা যদি স্বইচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, এবং সুস্থ মস্তিষ্কে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগ দিতে রাজী না হয়, তাহলে তাদের দিয়ে জোর করে কিছু করানো হবে না।

ব্রিটিশ সরকারের মনে স্টেটদের নিয়ে গোলমাল পাকানোর যে দুর্বুদ্ধি উঁকি দিচ্ছে তা কংগ্রেসের নেতারা বেশ কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরোক্ষে কিছু প্রতিবাদ জানানো ছাড়া তাঁরা এ-বিষয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু বলতে চান নি। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা।

সেই সুযোগ এল। উনিশ শ' পঁয়তিরিশ সালের সংবিধানে

বিস্তৃত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রদেশগুলিতে যে নির্বাচন হল তাতে পাঁচটি প্রদেশে বিপুল ভোটাধিক্যে প্রাদেশিক আইন সভায় কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। কংগ্রেসের এই সাফল্যে কেবল কংগ্রেস নেতারাই হকচকিয়ে গেলেন না, স্টেটের অসংখ্য জনসাধারনের মধ্যেও বিপুল উত্তেজনা দেখা দিল। বিশেষ করে, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কাশ্মীর, হায়দারাবাদ, জয়পুর, রাজকোট, এবং উড়িষ্যার কিছু স্টেটে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, বিপুল আকার ধারণ করল গণ আন্দোলন। উড়িষ্যা স্টেটগুলিতে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল; রাণপুরে পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর বাজালগেধ নিহত হলেন। মহীশূরের উত্তেজনা চরমে উঠল। কংগ্রেসও চুপ করে বসে রইল না। কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসল। সেই অধিবেশনে মহীশূর সরকারের অত্যাচার আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানানো হল; সেই সঙ্গে স্টেট আর ব্রিটিশ ভারতের জনসাধারণকে নির্দেশ দেওয়া হল তাঁরা যেন সর্বশক্তি নিয়োগ করে মহীশূরের জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সফল করায় সাহায্য করেন।

কেবল গান্ধীজি কংগ্রেসের এই নীতি-ঘোষণায় সুখী হলেন না; কারণ, স্টেটের বিরোধিতা করবে না বলে কংগ্রেস যে নীতিটি এতদিন গ্রহণ করেছিল, এটি তার বিরোধী। তবে তিনিও বেশী দিন অসুখী রইলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মত পরিবর্তিত হল।

জয়পুরে তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী যমনালাল বাজাজ গ্রেফতার হলেন। উনিশ শ' আটতিরিশ সালের জানুয়ারি মাসে এই ঘটনাটিকে নিয়ে তিনি হৈ-চৈ করবেন বলে শাসালেন। তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন কংগ্রেসের সাহায্যের অভাবে জয়পুরের জাতীয় আন্দোলন যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে কংগ্রেস তার কর্তব্যে অবহেলা করেছে।

ঐ বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেস আরও

জোর গলায় স্টেটের গণ-অভ্যুত্থানগুলিকে তার অভিনন্দন জানাল। তবে একথাটাও জানিয়ে দেওয়া হল যে, বর্তমান অবস্থায় বাইরে থেকে সক্রিয়ভাবে তাদের সাহায্য করার মত ক্ষমতা বা সুযোগ কংগ্রেসের নেই; সুতরাং, এ-কাজ তাদেরই করতে হবে। তবে কংগ্রেস-কর্মীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যদি কিছু করেন, কংগ্রেস তাতে বাধা দেবে না।

সুতরাং, কংগ্রেসের মনোভাবও যে দিন দিন বেশ শক্ত হয়ে আসছিল সেদিক থেকে কোন সন্দেহ ছিল না। ওই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে কংগ্রেস কমিটির যে সভা বসল সেইখানেও ত্রিবাঙ্কুর, হায়দারাবাদ, কাশ্মীর আর উড়িষ্যা স্টেটগুলির শাসন কাজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড উষ্মা দেখানো হল। উনিশ শ' আটতিরিশ সালে কংগ্রেসের মনোভাব জানিয়ে রাজাদের সাবধান করে দিলেন গান্ধীজি:

They would do wise to cultivate friendly relations with an organisation (Congress) that bids fare in the future, not very distant, to replace the paramount power—let us hope, by friendly arrangement.

যে সংগঠন [কংগ্রেস] অদূর ভবিষ্যতে সার্বভৌম শক্তির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পথে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা করলে তাঁরা [রাজারা] নিজেদেরই বিজ্ঞতার পরিচয় দেবেন। আশা করি, সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবস্থার ভেতর দিয়েই সে-সম্পর্ক গড়ে তোলা যাবে।

Lord Linlithgo realised that unless some radical reforms were brought about in the States, it would only be a question of time before they succumbed to the congress agitation *

ভারতের গভর্নর জেনারেল তখন লর্ড লিনলিথগো। এদিক

* Govt. of India Records.

থেকে গান্ধীজির সঙ্গে তিনিও একমত ছিলেন। তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে স্টেটগুলির আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসের ধাক্কায় সেগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস 'অল ইণ্ডিয়া পিউপিলস্ কনফারেন্স' জোরদার করে তুলেছে, বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণ-আন্দোলন দানা পাকিয়ে উঠেছে। এই আন্দোলনগুলিকে পরোক্ষভাবে পরিচালনা করছেন কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণীর নেতারা; কিন্তু বিগত নব্বুইটি বছর ধরে ব্রিটিশদের পরোক্ষ সাহচর্য আর বিশেষ ক্ষেত্রে উসকানিতে দেশীয় রাজারা কাচের ঘরে উন্মত্ত বলীবর্দের মত ঘুরে বেড়িয়েছে। 'স্টেট পিউপিল'দের তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে কেন? যখনই সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা দেশীয় রাজাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে স্টেটের মধ্যে মুক্তি-আন্দোলন জোরালো করার চেষ্টা করেছেন তখনই ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজাদের পক্ষ নিয়ে পরোক্ষভাবে সেই সব আন্দোলন দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কিন্তু এসব ধাপ্পাবাজিতে ভুলতে রাজী হলেন না। দেশীয় রাজাদের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের হৃদয়-কন্দরে ভারত-বিদ্বেষী দরদ লুকিয়ে রয়েছে তা তিনি জানতেন। আর চুপ করে থাকলে ব্যাপারটা মেনে নেওয়া হবে এই ভেবে এবং মেনে নেওয়া হলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের পক্ষে সেটা রীতিমত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে চিন্তা করে উনিশ শো উনচল্লিশ সালে দেশীয় রাজন্যবর্গকে লক্ষ্য করে তিনি বেশ জোর গলাতেই বলে দিলেন:

We recognise no such treaties (between the States and the Crown) and we shall in no event accept them···The only paramount power that we recognise is the will of the people.

অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার আর দেশীয় রাজাদের মধ্যে কোন

চুক্তিকেই মানিনে ; এবং কোন অবস্থাতেই আমরা সেগুলিকে স্বীকার করে নেব না। যেটিকে আমরা সার্বভৌম শক্তি বলে স্বীকার করি সেটি হল জনগণের ইচ্ছা।

সোজা কথা সহজ ভাবে বলে দিলেন জওহরলাল। দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ কীভাবে নির্ধারিত হবে তা ঠিক করার চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে রাজ্যের জনগণের। অর্থাৎ, সার্বভৌম শক্তির একমাত্র অধিকারী হচ্ছে জনগণ। এ বিষয়ে কোন কথা বলার এক্তিয়ার রাজাদের নেই ; ব্রিটিশ সরকারের তো নেই-ই।

জওহরলালের কথাটা যে ফাঁকা আওয়াজ নয়, তার মধ্যে যে জোর রয়েছে সেটা দেশীয় রাজ্যের রাজারা স্বীকার না করলেও, ব্রিটিশ সরকার মনে-মনে তা অস্বীকার করতে পারেনি। এদেশে বিভিন্ন ভাষা আর ধর্মের মানুষ রয়েছে সত্যি কথা ; তাদের চালচলন, আচার ব্যবহার আলাদা, তাও মিথ্যে নয় ; তবু, ভৌগলিক পরিবেশের দিক থেকে তারা সবাই ভারতীয় ; এবং একটি প্রগতিশীল গণতন্ত্রের সরকার হওয়ার ফলে, দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা যে জনগণের, সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধিও তাদের ছিল। তাছাড়া, মুখে তারা যাই বলুক সত্যিকার স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায়, দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সরকার কোন দিনই তা দেয়নি। এক প্যারামাউন্টসির খুঁটিতে ওদের সমস্ত টুটি টেপা ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা পায়, তাহলে সেই প্যারামাউন্টসি নীতিগতভাবে স্বাধীন ভারতের ওপরে-ই পড়া উচিত। এদিক থেকে দ্বিমত থাকার কথা নয়।

এটা হল নীতির কথা। কিন্তু চুক্তি হল অন্য জিনিস। সেটা হল লেখাপড়ার ব্যাপার, তারই ভিত্তিতে আইন তৈরী হয়েছে। সেই আইন বলছে ভারত সরকারের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির কোন সম্পর্ক নেই। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা ব্রিটিশ সরকারেরও প্রজা নয় ; দেশীয় রাজ্যের কী হবে তা নিয়ে অনর্থক মগজ মারার ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নেই।

থাকলেও, কংগ্রেস তা মেনে নেবে না। ও-সব ব্রিটিশ বুজরুকি। বেশ, দেশীয় রাজ্যগুলিতে নির্বাচন হোক। দেখা যাক তাদের রায়টা কী?

রায়টা কী হবে তা কারুরই অজানা ছিল না। ওইখানেই ছিল কংগ্রেসের তুরুপের তাস। দেশীয় রাজ্যের কোটি-কোটি মানুষ দুর্বিনীত রাজাদের স্বাধীন করার জন্যে নিজেদের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার ছাড়তে রাজী হবে না, কাজীর বিচারকে মেনে নিতে রাজী হবে না তারা।

স্টেট পিউপিলস্ কনফারেন্সের দৌলতে তারা কেবল নিজেদের অধিকার সম্বন্ধেই সচেতন হয়নি, সঙ্ঘবদ্ধও হয়ে উঠেছে যথেষ্ট।

ব্রিটিশ সরকার তা জানত। তারা আরও জানত, ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা পায় (আজ হোক আর কাল হোক স্বাধীনতা সে পাবেই) তাহলে ওই কংগ্রেসই মিলিটারী দিয়ে সব রাজাদের গুঁড়িয়ে শেষ করে দেবে! নিজেদের বাঁচানোর মত শক্তি ওদের নেই। ওদের বাঁচাতে পারে একমাত্র ওদের প্রজারা। এতদিন ওই প্রজাদেরই ওরা নির্বিবাদে শোষণ করে এসেছে। কিছুই ভোলেনি তারা। সুতরাং, প্রয়োজন হলে তারা যে রাজাদের জন্যে একটা আঙুলও তুলবে না সেকথা দিনের মত পরিষ্কার, ঝরঝরে। রাজারা তা জানত কিনা জানিনে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তা হাড়ে-হাড়ে বুঝত।

বুঝত বলেই, এক রকম উনিশশো সাঁইতিরিশ সাল থেকেই পলিটিক্যাল দপ্তর রাজাদের পাকে-প্রকারে সাবধান করে দিয়ে আসছিল। রাজ্যের শাসনতন্ত্র সংস্কার কর, চেষ্টা কর অন্তত কিছুটা জনপ্রিয় সরকার গঠন করতে। প্রজাদের কাছ থেকে ষোল আনার ওপরে বাড়তি দু-আনা আদায় না করে তাদের কিছুটা অন্তত দাও। হাঁসকে বাঁচিয়ে রাখলে তবেই তো সোনার ডিম পাড়বে!

এসব যে তাদের নিজেদেরই জন্যে এই কথাটাও বার বার তাদের বলে দেওয়া হল। প্রজাদের যদি তারা নিজেদের দলে টানতে

পারে—ধোলাই দিয়ে নয়, কিছুটা সুযোগ-সুবিধে দিয়ে—তাহলে পরবর্তী ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাদেরই শক্তি বৃদ্ধি পাবে, অন্যথায় তাসের ঘরের মত তাদের সাম্রাজ্য ঝুর ঝুর করে মাটিতে ভেঙে পড়বে।

কিন্তু শুনবে কে? চোরকেও হয়তো ধর্মের কাহিনী শোনানো যায়, কিন্তু এই সব সামন্ত রাজাদের? হরি, হরি, কো তব দৈব দুরাশা! ঢাল-তরোয়াল নেই বা রইল, গোঁফজোড়া আর চাপকান তো রয়েছে। তার ওপরে জগদীশ্বর ইংরেজ রেসিডেণ্ট রয়েছে; চুকলি-কাটানেওয়ালার অভাব কী রাজাদের? এ হেন খুঁটি থাকতে রাজাদের ঘুঁটি বানচাল করে কে?

ব্রিটিশ সরকারও ওদের ওপরে বিশেষ চাপ দিতে পারেনি। তার প্রথম কারণ, রাজাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আর বিভিন্ন কারণে যে সব চুক্তি হয়েছিল সেগুলিকে ভেঙে দেওয়ার জন্যে রাজাদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে চায়নি সরকার, তাতে চুক্তিভঙ্গের জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হতো তাদের। দ্বিতীয় কারণটা হল মর্যাদার ব্যাপার। রাজারা ভাবল, সরকারের উপদেশ মেনে নেওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজেদের অসম্মান করা। এমন কি ছোট-ছোট বালখিল্য রাজারাও নিজেদের স্বৈরাচার ছেড়ে দিতে রাজী হল না। অগত্যা, অদূর ভবিষ্যতে কী ধরনের বিপদ আসতে পারে তারই একটা আভাস দিয়ে চুপ করে গেল ব্রিটিশ সরকার।

তাতেও কিছু যেত আসত না, যদি ব্রিটিশরা এদেশে থাকত। কিন্তু ভগবানের মার দুনিয়ার বার। পর পর দুটো বিশ্বযুদ্ধই ব্রিটেনকে কাত করে ফেলল। সুতরাং চোখ রাঙিয়ে বাজিমাত করার দিন তার চলে গিয়েছে। ভারতের সঙ্গে রফা তাকে একটা করতেই হবে; আর সেই রফাতেই দেশীয় রাজ্যগুলি শেষ হয়ে যাবে। ওদের বাঁচানো সম্ভব হ'ত যদি ওদের একটা জোটের মধ্যে ফেলা যেত। অবশ্য চেম্বার অফ প্রিনসেস রয়েছে সত্যি কথা কিন্তু তার বাইরেটা যেমন চকচকে,

ভেতরটা তেমনি মরচেধরা। ওদের নিয়ে বড়-বড় ভোজের আয়োজন করা যায়, বল-ডান্সের খরচ যোগাতে ওদের মত পেট্রন খুব কম রয়েছে জগতে, কিন্তু এক ডিনার-বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া ওদের দিয়ে যে আর কোন কাজ করানো যাবে না, সে বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার নিশ্চিন্ত ছিল।

তাছাড়া, সারা ভারত জুড়ে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যাও প্রায় সাড়ে পাঁচশোর কাছাকাছি। ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে তারা চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, প্রয়োজন মত নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করাও তাদের পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর। সেই ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং শত্রুভাবাপন্ন স্বাধীন ভারতের সঙ্গে পাঞ্জার লড়াই করে ওরা পারবে কেন?

ব্রিটিশ সরকার তাই চেয়েছিল কোন রকমে ওদের যদি একবার ফেডারেল কাঠামোর মধ্যে জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে বাঁচোয়া। ওদের এই বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই উনিশশো পঁয়তিরিশ সালের ফেডারেল সংবিধান। ছুটি বছর তাই রে না রে করার পরে, উনচল্লিশের যুদ্ধ সব কিছু ধামাচাপা দিয়ে দিল। ঐ সালের এগারোই সেপ্টেম্বর ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ঘোষণা করলেন:

The compulsion of the present international situation···· has compelled us to hold in suspense the work in connection with the preparation for Federation.

'বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ফেডারেশনের প্রস্তুতিটিকে সাময়িকভাবে মুলতুবি রাখতে আমাদের বাধ্য করেছে।'

এই সঙ্গে সঙ্গে নব্য ভারতের ইতিহাসে একটি জটিল অধ্যায়ের ওপরে যবনিকাপাত হল। সে-যবনিকা আর ওঠে নি। দীর্ঘ বারোটি বছর ধরে কত আলাপ, কত আলোচনা, কত অর্থক্ষয় —সব বরবাদ হয়ে গেল। মূষিক প্রসব করতে করতে বিরাট ভূমিকম্পে পাহাড় গেল ধ্বসে।

শুরু হল যুদ্ধ। সব স্থগিত রেখে ব্রিটেন তখন যুদ্ধের জন্যে

তোড়জোড় করছে। নেভিল চ্যামব্যারলেন পদত্যাগ করেছেন। ব্রিটেনে যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। উনসটন চার্চিল সাহেব হয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু য়েরোপের এই যুদ্ধের সময় রাজারা চুপচাপ বসেছিল না। জার্মান বোমার ধাক্কায় ব্রিটেন যে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তা তারা বুঝতে পেরেছিল। কংগ্রেসের চাপে ভারতবর্ষে ব্রিটেন যে দিন দিন কোণঠাসা হয়ে পড়ছে সে-সংবাদটাও তাদের অজানা ছিল না। যুদ্ধে নামল জাপান। পূর্ব দরিয়ায় ব্রিটেন-অ্যামেরিকা নাজেহাল হয়ে পড়ল। সুভাষচন্দ্র বোস জার্মানী থেকে জাপানে এসে হাজির হলেন। সংবাদ এল, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি নিয়ে জাপানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের দিকে কদম-কদম এগিয়ে আসছেন। সিঙ্গাপুর গেল, বর্মা গেল, সিলোন গেল, আন্দামান নিকোবরও গেল। কোহিমার সীমান্তে হাজির হল ভারতের জাতীয় সেনারা। কংগ্রেস হুমকি দিল ব্রিটেনকে—ভারত ছাড়!

দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা ব্রিটেনকে গ্রাস করে ফেলল। এখনও যদি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে খোলাখুলিভাবে কিছু একটা আদায় করা না যায়, তাহলে রাজাদের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

সুতরাং, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত; ওঠো, জাগো। হঠাৎ টনক নড়ে উঠল রাজাদের। 'চেম্বার অফ প্রিনসেস' এতদিন ছিল রাজা-মহারাজাদের 'শো ক্লাব'। এবারে সেটাকে করিতকর্মা করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগল রাজারা। কিন্তু দুচারটে বড়-বড় রাজ্য ছাড়া নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে সংগঠণটিকে জোরদার করার অসুবিধে ছিল অনেক।

উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে চার্চিল সাহেবের প্রতিনিধি হিসাবে স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ এলেন ভারতবর্ষে। প্রেস কনফারেন্স করে বললেন, ভারতবর্ষকে তিনি স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যে এসেছেন, পকেটে তাঁর মোটা অঙ্কের একখানা চেক রয়েছে।

দোসরা এপ্রিল, উনিশশো বিয়াল্লিশে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌-এর সঙ্গে দেখা করলেন রাজারা। এলেন 'চেম্বার অফ প্রিনসেস' এর চ্যানসেলর নবনগরের জামসাহেব, এলেন বিকানিরের মহারাজা স্যার যাদবিন্দ্র সিং, আর এলেন নিজামের প্রতিনিধি ছত্রীর নবাব বাহাদুর।

আর্জি পেশ করলেন তাঁরা—আমাদের সমিতি, সংগঠন, অর্থাৎ, য়ুনিয়ন তৈরী করার অধিকার দেওয়া হোক।

কেন, আপনাদের তো চেম্বারই রয়েছে।

হ্যাঁ, তা রয়েছে, কিন্তু ওর কোন স্বাধীন সত্তা নেই। ব্রিটিশ সরকার আর তার প্রতিনিধি ভাইসরয় ওকে যেভাবে নাচাচ্ছেন, কলের পুতুলের মত সেইভাবে ও নাচছে। এতে আমাদের কোন লাভ নেই। আমরা ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে রয়েছি।

কিসে আপনাদের লাভ তাহলে?

রাজারা ভাবতে লাগল: অর্থাৎ যা বলল, অন্তত বলার চেষ্টা যতটুকু করল, তা থেকে বোঝা গেল যে কংগ্রেস বা মুসলীম লীগের ধাঁচে তারা একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে চায়।

অর্থাৎ, ঠাট বজায় রেখে আর তাদের চলবে না; ব্রিটিশদের বদান্যতার ওপরেও অনিশ্চিত ভাবে আর বেশী দিন নির্ভর করে বসে থাকাটা উচিত হবে না তাদের। নিজেদেরই সুবিধে নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে। ভিক্ষে করে আর যাই কিছু করা যাক, আত্মসম্ভ্রমের সঙ্গে বেশীদিন অস্তিত্ব বজায় রাখা যায় না।

সুতরাং, তারা মনে করে, 'They [the Princes] should have the right to form a union of their own with full sovereign status, সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিতে য়ুনিয়ন তৈরী করার অধিকার তাদের থাকা উচিত।

ক্রীপ্‌স্‌ সাহেব ঘাড় নেড়ে বললেন: না, না, ওরকম কোন সম্মতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের দিতে পারব

না···মানে···সরকারী ভাবে, সে অধিকার-চার্চিল সাহেব আমাকে দেন নি। তবে···

চুপি চুপি বললেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ঃ তবে, আপনাদের এই প্রস্তাবটি সরকার নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন।

ক্রীপ্‌স্‌ সাহেব রাজাদের ভাঁওতা দেওয়ার জন্যেই ওকথা বলেছিলেন, না, সত্যি সত্যি তাঁরও মনের গভীরে ঐ ধরনের একটি বাসনা উঁকি দিচ্ছিল ভগবান জানেন, কিন্তু যে-কোন চক্ষুষ্মান মানুষই ভারতের মানচিত্রের দিকে একবার মাত্র চোখ ফেরালেই বুঝতে পারত বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ভৌগলিক দূরত্বটা এত বেশী যে এক পাগল ছাড়া ও-রকম জমজমাট কোন পরিকল্পনার কথা কেউ কল্পনাও পারত না।

আসল কথাটা হল ব্রিটেন তখন নিজেকে বাঁচাতেই অস্থির হয়ে উঠেছে। য়েরোপ তো ছিলই। এক জার্মানীকে নিয়েই সে নাজেহাল। মরার ওপরে খাঁড়ার ঘা। প্রাচ্যে আবার জাপান হামলা শুরু করেছে। প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্ত্যে ঠেলা সামলাতে গিয়ে ব্রিটিশ সিংহের অবস্থা তখন 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা'-র মত। তার ওপরে ভারতীয় কংগ্রেস সেই যুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্য তো করেইনি, উপরন্তু ব্রিটেনের শত্রু জাপানকে সসম্মানে ভারতের মাটিতে ঢুকতে দেওয়ার স্বীকৃতি দিয়ে ব্রিটেনকে হুমকি দিচ্ছে। বুঝিয়ে বাঝিয়ে লোভ দেখিয়ে কংগ্রেসকে জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো সম্ভব কি না তাই বাজিয়ে দেখার জন্যেই ক্রীপস্‌ সাহেবকে চার্চিল সাহেব ভারতে পাঠিয়েছিলেন। ভারত-শাসনের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার সময় রাজাদের কী অবস্থা হবে সে কথা ভাববার মত সময় তখন তাঁর ছিল না। ব্রিটিশ সরকার কেবল একটা কথাই তখন বলেছিল [যে কথাটা সে অনেকবারই পাকে-প্রকারে বলে এসেছে] যে, স্বাধীনতা হস্তান্তরের সময় প্যারামাউণ্টসিটা পরবর্তী ভারত সরকারের হাতে সে নীতিগতভাবে তুলে দেবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। কোয়ালিশন সরকার থেকে ব্রিটেনের লেবার পার্টি সরে দাঁড়াল। সাধারণ নির্বাচন শুরু হল ব্রিটেনে। চার্চিল সাহেবের সমস্ত আশা-ভরসা বানচাল করে ব্রিটেনের অধিবাসীরা কনসারভেটিভ পার্টিকে হটিয়ে দিল, লেবার পার্টির ওপরে দেশের শাসনতন্ত্র পরিচালনার ভার দিল তুলে। এটিলি সাহেব হলেন প্রধানমন্ত্রী।

তারপর থেকে ভারতের মাটিতে ঘটনা বা দুর্ঘটনার স্রোত প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খেতে লাগল।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বাধীনতার প্রস্তাবগুলি নিয়ে শলা-পরামর্শ করার জন্যে তদানীন্তন ভাইসরয় লণ্ডনে হাজির হলেন। সেখান থেকে ফিরে এসেই তিনি ঘোষণা করলেন যে ক্রীপস্ সাহেবের প্রস্তাটির কোন রদ বদল করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা সে-বিষয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক আইনসভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করার নির্দেশ নিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন। এইটিই হল বিয়াল্লিশের প্রস্তাব। কংগ্রেস আর মুসলীম লীগ দুদলই এটিকে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছিল। গান্ধীজির ভাষায় সেই 'পোস্ট-ডেটেড চেক'-এর ওপরেই আলোচনা চলবে, সেই আলোচনায় তিনি কেবল কংগ্রেস, লীগ, শিখ, অনুন্নত শ্রেণী, ছোট-বড় অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকেই যে আমন্ত্রণ জানাবেন তা নয়, দেশীয় রাজাদেরও তিনি বাদ দেবেন না।

দেশীয় রাজাদের সঙ্গে কী বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেনঃ **Discussins will be undertaken with the representatives of the Indian States with a view to ascertain in what way they can best take their part in the constitution making body.***

অর্থাৎ, সংবিধান-রচনাকারী দলটির সঙ্গে কী ভাবে ভারতীয়

রাজন্যবর্গ সহযোগিতা করতে পারেন সেই বিষয়টি নিয়ে তিনি তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা করতে চান।

ভাল কথা, কিন্তু স্টেটের প্রতিনিধি কী ভাবে নির্বাচিত হবেন?

আলোচনাতে বসার আগেই কংগ্রেস স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল যে স্টেটের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কাজ করতে তাঁদের আপত্তি নেই, তবে জনসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের নির্বাচিত হতে হবে। অন্যথায় নয়।

ব্যাস! ক্ষেপে উঠল রাজারা। তারা গোঁফ ফুলিয়ে চোখ পাকিয়ে সুর্মা-টানা ভুরু কুঁচকিয়ে বলল: বটে, বটে! এত বড় আস্পর্ধার কথা কংগ্রেসের! আমরা হলাম গিয়ে রাজা-মহারাজা। স্টেটের ওপরে সার্বভৌম ক্ষমতা আমাদের। স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার আমাদের সেই জন্মগত অধিকারে হাত দিতে সাহস করেন নি, আর কংগ্রেসের চ্যাংড়া মস্তানরা বলে কিনা প্রজাদের কাছে দয়া ভিক্ষে করতে! তাদের অনুগ্রহের ওপরে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে? মারো গোলি! কংগ্রেসের শয়তানিতে আমরা নেই। ওদের ফাঁদে আমরা পা দেব না।

এক জাঁদরেল রাজা তো ক্ষোভে আর রাগে সোজাসুজি বলেই ফেলল:

We fought and sacrificed our blood to win power and we mean to hold it. If the Congress wants to rob us, if the British should let us down, we will fight. *

এই ক্ষমতা অর্জন করার জন্যে আমরা যুদ্ধ করেছি, ক্ষয় করেছি আমাদের রক্ত এবং আমরা সেই ক্ষমতা কায়েমি করে রাখতে বদ্ধপরিকর। কংগ্রেস যদি সেই ক্ষমতা জোর করে ছিনিয়ে নিতে চায়, বা ব্রিটিশ সরকার আমাদের সঙ্গে যদি নেমকহারামি করে, আমরা তা সহ্য করব না; যুদ্ধ করব।

---

* V. P. Menon : Integration of the Princely States.

তোফা কথা, এবং বীরের মত কথা, সন্দেহ নেই। তা বাপু, কংগ্রেসের সঙ্গে কোন্ অস্ত্র দিয়ে তোমরা যুদ্ধ করবে? কংগ্রেসের অস্ত্র হচ্ছে তার মনোবল, আর জনবল। তোমাদের মনোবলও নেই, জনবলের মাত্রা আরও কম। নিধিরাম সর্দারের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত-পা কচলালেই যদি যুদ্ধ হত, তাহলে সার্কাসের বুড়ো বাঘটাই হত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা; তর্জন-গর্জনটাই যদি মানুষের সেরা হাতিয়ার হত তাহলে বোমা-ট্যাঙ্ক কার্তুজের দরকার হত না এতটুকু।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজাদের অভিযোগ ছিল, সত্যি কথা। কংগ্রেসের নেতাদের চিরকালই ওরা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এসেছে, সে কথাও মিথ্যে নয়, কিন্তু তাই বলে ব্রিটিশদের ওপরে রাজারা হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠল কেন?

ওটা আসলে হল অভিমানের কথা। ব্রিটিশ সরকার বার বার ওদের বলে এসেছে তোমাদের কোন ভয় নেই। যাওয়ার আগে তোমাদের হিল্লে একটা করে দিয়ে যাব আমরা। এতদিন ধরে তোমরা আমাদের রসদ জুগিয়েছ; আজ তোমাদের আমরা কতকগুলো বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে যাব না।

মানলাম, সে কথা তোমরা কম করে হাজারবার বলেছ। কিন্তু তাতে আমাদের সুরাহাটা হচ্ছে কোথায়? কংগ্রেসকে তোয়াজ করতেই তোমরা ব্যস্ত। কংগ্রেস কোন বিষয়ে একবার 'না' বললে তাকে তোমরা 'হ্যাঁ' করাতে পারছ? শুধু মুখের কথায় চিঁড়ে ভেজে? না, তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? কভী নেহী।

অভিযোগটা মিথ্যে নয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারই বা কী করবে? নিজেরাই তারা হালে পানি পাচ্ছে না, অন্য লোকের হাল ধরবে কেমন করে? ভারতবর্ষকে ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলবে এই আশ্বাস দিয়েই না চার্চিল সাহেবের দলকে লেবার পার্টি হঠাতে সক্ষম হয়েছে। তা ছাড়া, সৈন্যবহরই বা তার এত কোথায়? যা রয়েছে তাদেরও তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কতদিন তারা আর

বিদেশে পড়ে থাকবে ? দেরী হচ্ছে দেখে এমনিতেই তো ব্রিটেনে হৈ-চৈ শুরু হয়েছে। সুতরাং বাঁচতে গেলে ভারতের যেটি সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক দল সেই কংগ্রেসের সঙ্গে তাকে একটা মীমাংসায় আসতে হবে। কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসার অর্থই হচ্ছে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। আর স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থই হচ্ছে তাকে তাড়াতাড়ি লোটা-কম্বল নিয়ে চলে আসতে হবে। প্যারামাউন্টসি কংগ্রেসের হাতে না হয় দেওয়া না-ই হল ; তাতে তোমরা বাঁচবে কেমন করে ?

কিন্তু রাজাদের গোঁ, কিছুতেই তারা ওসব কথা শুনতে রাজী নয়। তারা চায়, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও স্বাধীন হয়ে যাবে ; এবং ব্রিটিশ সরকারকে লিখিত ভাবে তাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। প্যারামাউন্টসির চুক্তি অন্তত সেই কথাই বলে। এতদিন ব্রিটিশ সরকার তা-ই স্বীকার করে এসেছে। এখন আবার নতুন গাওনা কেন ?

এই রকম একটি টাল-মাটাল অবস্থায় চেম্বার অব প্রিনসেস-এর বার্ষিক অধিবেশন শুরু হল। দিনটা হচ্ছে উনিশশো ছেচল্লিশের সতেরোই জানুয়ারী। অধিবেশনে পৌরোহিত্য করলেন ওয়াভেল সাহেব। অধিবেশনটি বার্ষিক ছিল সত্যি কথা ; কিন্তু রাজাদের উদ্দেশ্য ছিল বেশ কিছুটা ধানাই-পানাই করা। রাজকীয় পোশাক পরে, বুকের ওপরে পূর্বপুরুষদের অর্জিত (অপহৃত !) গণ্ডাকতক সোনার মেডেল সেঁটে গলায় মুক্তোর মালা ঝুলিয়ে, আর মাথার ওপরে আভিজাত্যের টুপী চড়িয়ে রাজারা সভাটিকে বেশ সরগরম করে তুলল। সরকার যে তাদের মত নাবালকদের জন্যে কিছু করছেন না এই কথাটাই হাবে-ভাবে, আকারে ইঙ্গিতে তারা ওভায়েল সাহেবকে জানিয়ে দিল।

ওভায়েল সাহেব কোন দিনই বেশী কথা বলার মানুষ ছিলেন না। তিনি ব্রিটিশ সরকারের পুরনো আশ্বাসটাই নতুন করে কচলিয়ে

দিলেন, বললেন: আপনাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল তার এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। অজস্র চুক্তি, আর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকার আপনাদের হয়ে যে সার্বভৌম ক্ষমতা সংরক্ষণ করছেন, আপনাদের বিনা সম্মতিতে সেই ক্ষমতা আর কারুরই হাতে তুলে দেওয়া হবে না।

ঠিক কথা। তবে সেই সঙ্গে আর একটা কথাও তিনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বিশ্বাস করেন 'that the States should take their full part in the constitutional discussions, which were to be held later in the year, as well as in the proposed constitution-making body. He also impressed upon them the necessity of placing their administrations on modern lines for the welfare of their subjects. *

তাঁর বিশ্বাস, ওই বছরেই, পরে, শাসনতান্ত্রিক যে আলাপ-আলোচনা চলবে, এবং শাসনতান্ত্রিক নীতি তৈরী করার জন্যে যে সংসদ গঠন করা হবে তাতে তাঁরা পূর্ণভাবে যোগ দেবেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁদের এই কথাটাও বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রজাদের মঙ্গলের জন্যেই তাঁদের শাসনতন্ত্রের কাঠামোটিকে আধুনিক পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানো উচিত।

রাজারা ঘাড় নেড়ে বলল: সে-সব কথা পরে ভাবা যাবে। আমাদের স্বাধীনতা দেওয়ার কথাটা কী হবে তাই আমাদের বলুন?

ওয়াভেল সাহেবের হয়েছে যেন এক জ্বালা। ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে পথে-প্রান্তরে রাজনীতিবিদরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বার্লিনের সম্বন্ধে একটা প্রবাদ রয়েছে, থ্রো এ স্টোন ওভার বার্লিন, অ্যান্ড ইট উইল হিট এ ডগ অর এ ডক্টর। ভারতবর্ষের অবস্থাও তাই। একেবারে পালে-পালে রাজনীতিবিদ পঙ্গপালের মত সারা দেশটাকে ছেয়ে ফেলেছে। আর সব চেয়ে মজার কথা হচ্ছে এদের

* V. P. Menon: Integration of the Princely States.

কেউ দেশের কোটি-কোটি জনসাধারণের কথা ভাবে না ; ভাবছে সব সময়ে নিজেদের কথা। এরা সবাই ওই যাকে বলে কেরিয়ারিস্ট। কি কুক্ষণেই যে তিনি ভাইসরয় হয়ে এসেছিলেন ! রাজাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলবেন কী ? যা বলবেন সেকথা তো অনেক বারই বলা হয়েছে।

ওয়াভেল সাহেবকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে রাজারা বলল : আপনি একবার বলছেন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পরে প্যারামাউণ্টসি লোপ পাবে ; তার অর্থই হচ্ছে আমরা স্বাধীন হয়ে যাব ; আর একবার বলছেন কনসটিটিউয়েণ্ট অ্যাসেমবলীতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে কংগ্রেস আর মুসলীম লীগের সঙ্গে বসে সারা ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করতে। কোন্‌টা আপনাদের আসল কথা ; কোন্‌টা ফাঁকির ?

রাজারা ঠিক কথাই বলেছিল, ও-দুটির কোন্‌টা আসল, আর আর কোন্‌টা নকল ? ব্রিটিশ সরকারের কাছেও সত্যিকার সমস্যা ছিল ওইখানে। সত্যি কথা বলতে কি আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপে পড়ে, আর ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের 'যা কিছু ব্রিটিশ তার সব কিছুর ওপরে তীব্র অনাস্থার' ফলে ব্রিটিশ সরকার বিরাট একটা ফাঁপরে পড়েছিল। ভারত ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নিয়েই খুশী হোক, বা পূর্ণ স্বাধীনতাই চাক, কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের ওপরেই জোর দিক, অথবা মুসলীম লীগের পাকিস্তান নীতি মেনে নিয়ে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ড করারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক, তার একটা মোকাবিলা শেষ পর্যন্ত হবে; কারণ, তার সব দায় আর দায়িত্ব ভারতীয় নেতাদের। কিন্তু এই রাজাদের সব ঝুট-ঝামেলা তাঁকেই পোয়াতে হচ্ছে। এই সব তালপাতার সেপাইদের নিয়ে তিনি করবেন কী ? এক ঘ্যানর-ঘ্যানর করা ছাড়া সত্যিকার কোন কাজ এদের নেই। থাকলেও, তা করার মত ক্ষমতা নেই এদের। স্বাধীনতা দেওয়াটা বড় কথা নয় ; বড় কথা হল তাকে রক্ষা করা। সে-শক্তি কি রাজাদের রয়েছে ? নেই। ব্রিটিশ

সরকারের হয়েছে যেন সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। গিলতেও পারে না, আবার উগরে দিতেও কষ্ট হয়।

কিন্তু বুদ্ধি যোগান দেওয়ার মত বুদ্ধিমান মানুষের অভাব ছিল না ব্রিটেনে। নির্বাচনে হারলেও চার্চিল সাহেবের সাকরেদরা কেউ কিছু কমতি ছিলেন না। তাঁদের চেলারা, ঐ যাঁদের ছুদে আই সি এস. বলা হত, তাঁরাও ছড়িয়ে ছিলেন ভারতবর্ষে। তাঁদের মতে গান্ধী একটা উলঙ্গ ফকির, জহওরলাল আপস্টার্ট, জিন্নাহ্ ফ্যানটাসটিক। তাঁরাই দিন-রাত কানের কাছে ঘেন্‌টি পিটতে লাগলেন। ভারত জাহান্নমে যাক, দেশীয় রাজাদের বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের কর্তব্য। কতকগুলি নেটিভদের খপ্পরে রাজাদের ঠেলে না দিয়ে আমাদের তদারকীতে থাকলে ওরা ভালই থাকবে। ওদের বাঁচিয়ে রাখতে পারলে আমাদেরও রুজি-রোজগার চলবে বহাল তবিয়তে, আর ভারতও টাইট থাকবে। সুতরাং প্যারামাউন্টসি লোপ করে কোন লাভ নেই।

কথাটা তো ভালই; কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ব্যথা তাতে কমবে না। এত হৈ-চৈ করে পর্বতের মুষিক প্রসব করতে সে রাজী নয়। তাছাড়া, পৃথিবীর দেশগুলোই বা বলবে কী? আর ঐ যে অ্যামেরিকা। বন্ধু হলে কী হবে? এদিকে জ্ঞানটা তার টনটনে। ওই রকম কোন ব্যবস্থা করতে গেলেই চেঁচিয়ে উঠবে: দেখ, দেখ, ব্রিটেনের সোসিয়ালিস্ট সরকারের কাণ্ডটা দেখ একবার। স্বাধীনতা দেওয়ার লম্বা লম্বা আস্ফালন করে শেষ পর্যন্ত দেশীয় রাজাদের বাঁচানোর ধুয়া তুলে ভারতবর্ষের একটি বিরাট অংশে (মানে, প্রায় পাঁচ ভাগের দু'ভাগ) কেমন তোফা আরামে বসে রইল। তা বাপু, চার্চিল সাহেব দোষটা করেছিলেন কোথায়? তাকে তোমরা ডিগবাজি খাওয়ালে কেন?

অ্যামেরিকাকেও না হয় বাদ দেওয়া গেল। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষ তা মেনে নেবে? হিন্দুস্থানই হোক্ আর পাকিস্তানই হোক, দু'দলই

ওদিকে শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে বসে-বসে দিন গুণছে। ব্রিটিশরা একবার জাহাজ ভাসালেই ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপরে।

আর ঝাঁপিয়ে যদি না-ই পড়ে তাহলেই বা সুরাহাটা হচ্ছে কোথায়? স্বাধীন ভারতের ভৌগলিক সীমানার মধ্যেই যে-সব দেশীয় রাজ্য পড়ছে, তাদের সংখ্যাও কম নয়। তাদের বাঁচার উপায়টা কী?

তাছাড়া, একটা স্বাধীন দেশের মধ্যে যদি এই ধরনের ছোট ছোট পকেট থাকে তাহলেই বা দেশের অখণ্ডতা বজায় থাকে কী করে?

কংগ্রেস বা মুসলীম লীগের পক্ষে এ ধরনের বিজাতীয় রাজ্যের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া কষ্টকর। 'বলকানাইজেশন' সব সময়েই দেশের অখণ্ডতা নষ্ট করেছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ঠিক কথাই বলেছেন :

It is inconceivable to me that any State will be independent and outside the limits of the Union.'

'আমি ভাবতেই পারিনে যে কোন স্টেট স্বাধীনভাবে ভারতীয় যুনিয়নের বাইরে চলাফেরা করবে।' তাঁর মতে, এবং কংগ্রেসের মতও তাই, যে দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পর্কের ওপরে নির্ভরশীল, সেই সম্পর্কের রদবদলের ফল দেশীয় রাজ্যের ওপরেও প্রতিফলিত হবে। এই অমোঘ যুক্তির ভিত্তিতেই কংগ্রেস দাবী করেছে স্বাধীনতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের প্যারামাউন্টসি স্বাধীন ভারতের ওপরেই বর্তাবে। 'ব্রিটিশদের ব্যাখ্যা আমরা মানতে রাজী নই।'

বর্তাক আর নাই বর্তাক, রাজারাও জানত ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া আশার চেয়ে কংগ্রেসের হুমকি অনেক বেশী সোজাসুজি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের নেই। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই রাজাদের অগ্রাহ্য করতে শুরু করেছে। সে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত নয় এমন কোন রাজ্যের

প্রতিনিধি কনসটিটিউয়েনট অ্যাসেমবলীতে এলে তাকে সে মেনে নেবে না।

কেন মেনে নেবে না সে-কথা উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের তিরিশে ডিসেম্বর জওহরলাল নেহেরু পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছেন, 'এই সব রাজারা হচ্ছেন প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষ, ব্রিটিশ শক্তির ওপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ভারতবর্ষের ওপরে প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যেই ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছে করে এঁদের সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফেলে রেখেছে।···যে সব চুক্তি একশো বছর আগে স্বাক্ষরিত হয়েছে তাদের পেছনে কোন দায়িত্বশীল মানুষই আত্মগোপন করে থাকতে পারে না,···অন্যান্য অনেক সমস্যার মত, এই সব চুক্তিগুলির অবস্থা কী দাঁড়াবে তা শেষ পর্যন্ত ভারতবাসীদেরই ঠিক করে নিতে হবে।'

এই ভারতীয় রাজ্যগুলির শেষ পরিণতি কী হবে সে-বিষয়েও তাঁর চিন্তাধারা বেশ স্পষ্ট ছিল। তাঁর মতে : ভারতের বেশীর ভাগ রাজ্য-গুলিকেই তাদের পাশাপাশি রাষ্ট্রগুলির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। যে-সব রাজাদের রাজ্য নষ্ট হবে ভাতা দিয়ে তাদের অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে আর যে সব রাজ্যগুলি বড়, এবং যেখানে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তারাই কেবল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে নিরপেক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে।*

সুতরাং, তম্বিই কর, আর হম্বিই দেখাও, লাফালাফিই কর, বা, ঝাঁপাঝাঁপিই কর, তোমাদের আমরা অত সহজে ছেড়ে দেব না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে হিড়হিড় করে টেনে আনব।

এদিক থেকে মুসলীগ লীগ বরং অনেক ভাল ; মানে, রাজাদের দিক থেকে। কংগ্রেসের অভিমত লীগের অভিমত নয় ; এবং তা স্বাভাবিকভাবেই। কংগ্রেস যা বলবে লীগকে তার উলটো কথা বলতে হবে সেই নীতি অনুসারে লীগ জানিয়ে দিল পাকিস্তানের ধারে-কাছে

*[R. G. Casey : An Australian in India. P. 88]

যে সব দেশীয় রাজ্যের সীমানা পড়েছে, তাদের সঙ্গে সে বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া বজায় রাখবে। জিন্নাহ্‌সাহেব এদিক থেকে অত্যন্ত সচেতন; বেফাঁস একটি কথাও বলতে তিনি রাজী নন। এক কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে কোন কথা তিনি চড়া সুরে বলেননি। তিনি সকল রাজাকেই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, যে-কোন রাজার কাছেই পাকিস্তানের দরজা দরাজ ভাবে খোলা থাকবে, যে-কেউ সেখানে আসতে পারেন এবং সসম্মানে। পাকিস্তান কারও ওপরেই কোন জোর খাটাবে না।

সুন্দর কথা, বেশ মিষ্টি সুরে বললেন জিন্নাহ্‌সাহেব, একেবারে দিলদরিয়া মেজাজ। তুষ্ট মানুষে বলে, দরিয়ায় ভাসছিলেন জিন্নহ্‌ সাহেব; মেজাজটা দিলদরিয়া হবে না কেন? তাছাড়া, অধিকাংশ রাজারাই তো হিন্দু; বেশির ভাগ রাজ্যের অধিবাসীই হিন্দু। সেই সব হিন্দু রাজা আর হিন্দু প্রজাদের নিয়ে তিনি করবেন কী? সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময়ে খাল কেটে ঘরে কুমীর ঢোকাবেন তিনি? পাগল আর কাকে বলে! তবু জেসচার তো একটা দিতে হবে। তাছাড়া, তিনি জানতেন কোন হিন্দু রাষ্ট্রই পাকিস্তানে যেতে চাইবে না। মিষ্টি কথা বলার সুযোগ তাঁর ছিল; এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন তিনি।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল থেকেই বেশ বোঝা গিয়েছিল ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে-সম্বন্ধে কারও কোন সঠিক ধারণা না থাকলেও, এটা ভেবে নিতে কারও কোন অসুবিধে হয়নি যে ভাঙা হাটের খেলা শীগ্‌গীরই জমে উঠবে। সেই ভাঙা হাটে কে কতটা লটবহর নিয়ে ভাগবে তারই মহড়া শুরু হল জোর কদমে। লুটের জিনিস; যার তাগদ যত সে ততটা নিয়ে ভাগবে।

সেই মহড়ায় রাজারাও যেন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলেন।

এতদিন ধরে পলিটিক্যাল দপ্তর বিপদের যে আশঙ্কায় রাজাদের বার-বার সাবধান করে দিয়েছিল, রাজারা হঠাৎ সেই বিপদের দৈত্য চোখের সামনে দেখে শিউরে উঠলেন। আর এ-দৈত্য যে সে-দৈত্য নয়, একেবারে ব্রহ্মদৈত্য, ঘাড় না মটকিয়ে ও সহজে ঘাড় থেকে নামবে না।

ব্যাপারটা মগজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। উনিশশো ছেচল্লিশ সালের জানুয়ারী মাসে চেম্বার অফ প্রিনসেস-এর চ্যান্সেলর ভূপালের নবাব কোন্-কোন্ বিষয়ে রাজাদের তখনই নজর দেওয়া উচিত তারই একটা তালিকা ঝটিতি তৈরি করে ফেললেন। তালিকার মধ্যে একটাই ছিল সব চেয়ে বড় জিনিস; সেটি হল শাসন-সংস্কার। যে যার নিজের নিজের রাজ্যে শাসনতন্ত্র ঢেলে সাজ, প্রজাদের নিয়ে শলা-পরামর্শ কর। কী ভাবে কী করতে হবে সে বিষয়ে কতকগুলি নির্দেশও সেই তালিকাটিতে ছিল।

These included 'popular institutions with elected majorities to ensure the close and effective association with the governace of the States'—'without, of course, impairing the continuance of the ruling dynasty.'

রাজবংশটিকে অক্ষত রেখে জন-সরকার গঠন কর। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রিয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে রাজ্য-পরিচালনার ব্যবস্থা কর।

প্রিনসেসদের তরফ থেকে রাজ্যশাসনের জন্যে যে নয়া নীতিগুলি গ্রহণ করা হল তাদের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে:

(১) আইনের অনুমোদন ছাড়া কারও স্বাধীনতা অপহরণ বা তাকে তার নিজস্ব বাসভূমি অথবা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

(২) যুদ্ধ, বিদ্রোহ, অথবা রাজ্যের মধ্যে সঙ্কটজনক অবস্থা দেখা

দিলেই জনসাধারণের এই মৌলিক অধিকারগুলি সাময়িকভাবে তুলে নেওয়া হবে।

(৩) প্রত্যেকটি মানুষের বাক্-স্বাধীনতা থাকবে, আর থাকবে পরস্পরের সঙ্গে অবাধ মেলামেলা করার অধিকার। আইন-শৃঙ্খলা ভাঙার জন্যে যুদ্ধজোট এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া জনসাধারণ শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হতে পারবে।

(৪) আইন-শৃঙ্খলা না ভেঙে অথবা দুর্নীতির আশ্রয় না নিয়ে প্রতিটি মানুষ তার বিবেকসম্মতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে, অকপটে প্রকাশ করতে পারবে নিজের মতামত, আর পারবে নিরুপদ্রবে ধর্মচর্চা করতে।

(৫) আইনের চোখে জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই সমান বলে গণ্য হবে।

(৬) কেবলমাত্র জাতি আর ধর্মের ভিত্তিতে চাকরির ক্ষেত্রে কাউকে অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হবে না।

(৭) কোন স্টেটে অতঃপর বেগার প্রথা থাকবে না।

রাজাদের নির্দেশ দেওয়া হল : আপনারা নিজের নিজের রাজ্যে নয়া পত্তনি শুরু করুন। প্রজাদের নিজের দলে টেনে আনুন, কংগ্রেসের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে প্রস্তুত হোন।

কিন্তু তখন আর সময় নেই। শিয়রে শমন, করিবে দমন, তুমি অভাজন করিবে খোদন। তোমার কিছু করার নেই। যা করার সে-ই করবে। পিঁড়িলাফই দাও আর আকাশে হাত-পা-ই কচলাও, পুতনা রাক্ষসীর শরণাপন্নই হও আর বকাসুরকেই তোয়াজ কর, নিস্তার তোমার নেই। তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

এডওয়ার্ড সাহেবের কথাও তাই, 'But by then it was too late, though it is doubtful whether any time after 1940 would have been early enough.'

উনিশশো ছেচল্লিশ সালের উনিশে ফেব্রুয়ারি মন্ত্রীসভার নির্দেশে

এটিলি সাহেব ঘোষণা করলেন যে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক আলোচনার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ভারতবর্ষে তিনজন 'বিজ্ঞ' মন্ত্রীকে পাঠানো হবে। পনেরোই মার্চ ভারতীয় রাজ্যগুলির উদ্দেশ্যে তিনি বললেন: I hope that the statesmen of British India and of Princely States will be able to work out a solution of the problem of bringing together, in one great policy, these disperate constituent parts. There again, we must see that the Indian States find their due place'*

উনিশশো ছেচল্লিশ সালের চব্বিশে মার্চ ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যরা নতুন দিল্লীতে এসে হাজির হলেন। তাঁরা হলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্, লর্ড পেথিক লরেন্স, এবং এ. ভি. আলেকজান্দার। উনিশশো বিয়াল্লিশের মত, বিশেষ কোন প্রস্তাব তাঁদের পকেটে ছিল না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এখানে এসে আলাপ-আলোচনা করে যা হোক একটা কিছু ঠিক করে যাবেন। তাছাড়া, তাঁদের করারই বা ছিল কী? সব কাজই তো করার কথা ভারতীয় নেতাদের।

তবে এই আলোচনার সময় রাজাদের সঙ্গেও কিছু কথা বলার ইচ্ছে রয়েছে তাঁদের। রাজাদের বক্তব্যটাও শুনতে হবে তো।

সাংবাদিক সম্মেলনে কোন সাংবাদিক ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আচ্ছা, এই ফেডারেল শাসনতন্ত্রে স্টেট থেকে কী ভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন? রাজারাই তাঁদের নির্বাচিত করবেন তো?

ভাসা জবাব দিলেন লর্ড পেথিক: আমরা নতুন কিছু তৈরি করতে পারি নে, বর্তমানে যা রয়েছে তাই আমাদের মেনে নিতে হবে। 'We can not create new structures. We have to take the position as we find it.'*

*G. I. Records.

বোঝা গেল, নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে তখনই কিছু কবুল করতে তিনি নারাজ।

সাংবাদিকটি থামলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন: কিন্তু এই সহযোগিতা কি স্টেটের দিক থেকে বাধ্যতামূলক ?

হাসলেন ভারত-সচিব , বললেন : আমরা তো আমন্ত্রণ জানাব।

আসা না-আসা তাহলে তাদের ইচ্ছাধীন ?

ধরুন, আপনাদের আমি ডিনারে নিমন্ত্রণ করলাম। আসা না আসাটা নিশ্চয় আপনার অর্থাৎ যে নিমন্ত্রণ করে তার ইচ্ছাধীন নয় ; যে আসে তার।

তাহলে, না-আসার অধিকার রাজাদের রয়েছে ?

নিঃসন্দেহে।

কথাটা পরিষ্কার করে লর্ড পেথিক লরেন্স তাঁর মাতৃভাষায় বুঝিয়ে দিলেন 'What we plan is to invite Indian States to take part in discussions for the setting up of machinery for framing the future constitutional structure. If we invite you to dinner, it is not obligatory for you to come. *

অর্থাৎ জোর করে আমরা কিছুই করব না ; তবে আমন্ত্রণ জানাব সবাইকে ; তাঁরা যদি আসেন, ভালই ; না আসতে চান তো নাই এলেন।

তবে তিনি আশা করেন কেউ এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন না।

কথাটা সত্যি ; আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে নি রাজারা।

তারা এসেছিল। বঁড়শীর কাঁটা গলায় বিঁধতে পারে জেনেও 'চারে'র লোভ সামলাতে পারে নি তারা।

কী করে সামলাবে বলুন ? পেয়ে-পেয়ে তাদের লোভ এতই

---

* G. I. Records.

বেড়েছিল যে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতাও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না তাদের। শুধু ভোগের আয়োজনে তাদের জীবন ছিল ভারাক্রান্ত। কতটা ভারাক্রান্ত তা রাজা-মহারাজাদের কীর্তি কলাপের কিছু কাহিনী শুনলেই বুঝতে পারবেন। এই কাহিনীগুলি যে কেবল রোমাঞ্চকর তাই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রীতিমত নক্কারজনক। তাদের অসংখ্য কাহিনী বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে একখানা অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতেও কুলোবে না। ব্যাসদেবের ক্ষমতা আমার নেই। অতএব কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করেই আমি থেমে যাব। এইগুলি থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন উনিশ শ' সাত চল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের আগে এই সব রাজা-মহারাজারা কত দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন!

পাঞ্জাবের একটি দেশীয় রাজ্য হচ্ছে ঝিন্দ। এই রাজ্যের শাসন-কর্তার নাম কর্নেল হিজ হাইনেশ ফরজন্দ-ই-দিলবান্দ [প্রিয় পুত্র] রসিকুল-ইতিকাদ [বিশ্বস্ত বন্ধু] দৌলত-ই-ইঙ্গলিসিয়া রাজ-ই-রাজন [রাজ চক্রবর্তী] মহারাজা স্যার রণবীর সিং রাজেন্দ্র বাহাদুর, সি-জি-আই-ই, কে-সি-এস-আই ইত্যাদি ইত্যাদি। নামের মত তাঁর আর একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য ছিল ; সেটি হচ্ছে তাঁর বধিরত্ব। কানে তিনি একেবারে শুনতে পেতেন না। এই অবস্থায় পঁচাত্তরটি বছর বহাল তবিয়তে কাটিয়ে তিনি পরলোকে প্রস্থান করেছিলেন। বিরাট সমারোহের সঙ্গে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎযাপন ক'রে ইংলণ্ডের রাজা এবং ভারতবর্ষের মহামান্য রাজাধিরাজের কাছ থেকে তিনি প্রচুর উপঢৌকন লাভ করেছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর তাঁর বিপুল দক্ষতায় (!) পরম পরিতুষ্ট হয়ে মহারাজার মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই দক্ষতা কিসের ? তাঁর দৈনন্দিন জীবনের তালিকা দেখলেই তা বোঝা যাবে।

মহারাজার ঘুম ভাঙতো বিকাল চারটায়। ঘড়ির কাঁটা ধরে ওই সময় তাঁর বিলিতি মহারাণী ডোরোথী এবং হারেমের একদল ভারতীয়

সুন্দরী যুবতী বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর পায়ে সুড়সুড়ি দিত। সেই সঙ্গে সুরু হোত সুরেলা কণ্ঠে মৃদু সঙ্গীত। শুনতে তিনি কিছুই পেতেন না বটে ; কিন্তু তাই ব'লে লাস্যময়ী সুন্দরী যুবতীদের সুরেলা কণ্ঠে গান গেয়ে মহারাজার ঘুম ভাঙানোর প্রাচীন রীতিটিকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি।

এইভাবে কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে মহারাজা বাহাদুর ধীরে ধীরে চোখ খুলতেন, তাকিয়ে থাকতেন সুন্দরীদের মুখের দিকে। এখানেও তাঁর বিশেষ একটি নীতি ছিল। ঘুম থেকে উঠে তিনি যার-তার মুখ দেখতেন না। তাঁর দরবারে থাকতেন দৈবজ্ঞ পণ্ডিত করণ চাঁদ। প্রতিটি দিন তিনি পাঁজি-পুঁথি আর মহারাজার ঠিকুজি-কুষ্ঠি নিয়ে বসতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গবেষণা করার পরে তিনি ঠিক করতেন পরের দিন কোন্ কোন্ মহিলার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠলে মহারাজার আগামী চব্বিশটি ঘণ্টা ভালভাবে কাটবে। ঠিক সেই সেই মহিলা ছাড়া তাঁর ঘুম ভাঙার সময় অন্য কেউ তাঁর সামনে উপস্থিত থাকতো না।

ঘুম ভাঙার পরে ধীরে ধীরে উঠে বিছানায় বসে মহারাজা চা পান করতেন।

চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী তাঁর শোওয়ার ঘরের বাইরে এসে অপেক্ষা করতেন। রাজকার্যের গুরু দায়িত্ব তাঁর মাথায় ; অথচ মহারাজার নির্দেশ চাই। তাঁর পিছু পিছু ফাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন অন্যান্য মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা ; কিন্তু তখনও মহারাজার সময় হয় নি।

রণবীর সিংহ ধীরে সুস্থে তৈরি হতেন। আসতো তাঁর প্রাতরাশ, সেই সঙ্গে আসতো স্যাম্পেনের বোতল। এই সময়ে রাজদর্শন প্রার্থীর ডাক পড়তো একের পর এক। মেজাজ সরিফ থাকলে দর্শনপ্রার্থীদের অভিবাদন তিনি হাসি মুখে গ্রহণ করতেন ; অন্যথায়, তাঁদের তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলতেন। তখনই বোঝা যেতো

মহারাজ-কারও সঙ্গে কথা বলতে নারাজ। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে যে যার পথ দেখতেন। তাঁরা জানতেন রাজাকে খুশী করাই এজগতে সেরা রাজকার্য।

কয়েক বোতল স্যাম্পেন আর তারই মাঝে-মাঝে কয়েক কাপ চা উদরস্থ করার পরে মহারাজা গাত্র মর্দনের জন্যে প্রস্তুত হতেন। সুন্দরী যুবতীরা সুবাসিত নারকেল তেল দিয়ে তাঁর সারা অঙ্গ দলাই মালাই করে দিত। দলাই-মলাই শেষ হলে "ফ্রেঞ্চ বাথ সলট" দিয়ে সুগন্ধ জলে স্নান করতেন। তারপরে ধড়াচূড়া পরে দরবারে হাজির হতেন। দরবারে মহারানী, তাঁর ছেলেমেয়েরা, আর প্রধান প্রধান পরিষদেরা অপেক্ষা করতেন। সেইখানে বসে স্যাম্পেন খেতে-খেতে তিনি তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করতেন। তিনি কানে শুনতে পেতেন না বটে, কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে পরিচিত-পরিচিতাদের মুখ নাড়া দেখে বুঝতে পারতেন কে কী বলতে চায়।

রাত্রি সাড়ে এগারটা নাগাদ তাঁর রাত্রির খাবার আসতো। খানা পিনা চলতো দুটি ঘণ্টা ধরে। তারপরে পরিষদ আর অতিথিদের সঙ্গে মহারাজা তাস খেলতে বসতেন শুধু তাস নয়; বিলিয়ার্ড খেলতেও তিনি ভালবাসতেন। সেই খেলাতে প্রতিদিনই প্রায় কয়েক হাজার টাকা নষ্ট করতেন তিনি। সেই খেলা চলতো রাত্রি চারটে পর্যন্ত। কখনও-কখনও খেলা ভাঙতে সকাল হয়ে যেতো। এই সময়ের মধ্যে মহারাজা পঁচিশটি বড় পেগ ব্র্যানডি উদরস্থ করতেন তারপরে প্রিয় মহারানীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করতেন। পরের দিন বিকাল চারটের আগে সেই কক্ষ থেকে বেরোতেন না।

মাঝে-মাঝে তিনি যে এই প্রথার পরিবর্তন করতেন না তা নয়। করতেন; সেটা কেবল শিকারের তাগিদে। শোনা যায় মহারাজা নাকি খুব ভাল শিকারী (!) ছিলেন। শিকারের সময়ে তিনি সকাল

আটটায় উঠতেন; প্রাতঃকৃত্য আর জলযোগ সেরে সোজা বেরিয়ে যেতেন পক্ষীশিকারে। তিতির পাখি মারতেন, ময়ূর মারতেন, আর মারতেন ঘুঘু। এগারটায় ফিরে এসে লাঞ্চ খেতেন; ঘণ্টা দুই বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে যেতেন; ফিরতেন রাত্রি আটটায়। তারপরে সেই এগারটা-বারোটা পর্যন্ত চলতো মদ্যপান। গোটা শীত আর সারা গ্রীষ্মকালটা এইভাবে তাঁর কাটতো। তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল ওই সময়ে কেউ যেন রাজকার্য নিয়ে তাঁকে বিরক্ত না করে। বছরের মধ্যে একশ তিরিশ দিনই তিনি শিকারে ব্যস্ত থাকতেন; বাকি দিন-গুলি অন্যান্য আমোদ প্রমোদে ভরিয়ে দিতেন। রাজকার্য করার মত তাঁর সময় কোথায়?

তা ছাড়া রাজকার্য করার জন্যে মাইনে দিয়ে প্রধান মন্ত্রী রাখা হয়েছে কেন? সেই প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগ স্বয়ং ভাইসরয় অনুমোদন করেছেন। তার পরেও যদি প্রজাদের কথা ভেবে আমোদ প্রমোদে ব্যাঘাত ঘটে তাহলে আর রাজা হয়ে লাভ কী? ওসব বাজে কাজ করার পাত্র তিনি নন।

এসব বাজে কাজে তিনি সময় নষ্ট করতেন না বলেই ব্রিটিশ সরকার তাঁর গলায় খেতাবের মালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। যত রকমের সামরিক আর বেসামরিক খেতাব রয়েছে সব পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর একমাত্র গুণ ছিল ভাইসরয় আর পলিটিক্যাল দপ্তরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কোন কাজ করতেন না।

পাতিয়ালার রাজপ্রমুখ ছিলেন মহারাজা ভূপিন্দর সিং বাহাদুর। দর্শন, বেদান্ত, রাজনীতি, কূটনীতি কোন দিক থেকেই তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। হিন্দু বলুন, শিখ বলুন, বৌদ্ধ বলুন, খৃষ্টান বলুন, মুসলমান বলুন—সব ধর্মেই তাঁর সমান অনুরাগ। অন্তত, কারও বিরুদ্ধে তাঁর

কোন অভিযোগ ছিল না। পৃথিবীতে যা কিছু জানার রয়েছে সব ছিল তাঁর মগজে। এক কথায় তাঁকে সর্বশাস্ত্রে আর অশাস্ত্রে বিশারদ বলা যায়।

মহারাজা ভূপিন্দর সিংহের বাবা মহারাজা স্যার বাজিন্দর সিং অত্যধিক মদ্য পানের ফলে মাত্র আঠাশ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। পাছে ভূপিন্দর সিং পিতৃদেবের পথ অনুসরন করে অকালে মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করেন এই ভয়ে তাঁর উপদেষ্টারা প্রথম থেকেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু বেশী দিন সেই চেষ্টা ধোপে টেকে নি। কিছুটা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনেশা, সুরা আর সাকি, তাঁকে গ্রাস করে বসলো। মৃত্যুর আগে তারা তাঁকে রেহাই দেয় নি।

যৌবনের শুরু থেকেই মহারাজা এই রংদার খেলায় মেতেছিলেন। নিরিবিলিতে সেই রমনীরমণ খেলায় আত্মনিয়োগ করার জন্যে তিনি একটি প্রমোদ উদ্যান তৈরি করিয়েছিলেন। নাম তার লীলাভবন। এর ভেতরে ঢোকার প্রধান পথ ছিল একটি। সেই পথের মুখে ছিল একটি বিরাট লোহার গেট। সেই গেট পেরিয়ে অনেকখানি আঁকা বাঁকা রাস্তা বাঁকের মুখে-মুখে বড়-বড় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গাছ ফলে দেওয়ালের বাইরে থেকে দেখার চেষ্টা করলে রাস্তার সামান্য একটু অংশ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না। ওই আঁকা বাঁকা পথ পেরিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে একটি সুন্দর বাগান চোখে পড়বে। অত সুন্দর বাগান তামাম ভারতে খুব কমই রয়েছে। এই বাগানের ভেতরে একটি প্রাসাদ, সুন্দর আর বেশ দামি-দামি আসবাবে সাজানো। এই প্রাসাদে শোওয়ার ঘর অনেক। সেগুলির সামনে-পেছনে চওড়া বারান্দা। বারান্দাগুলিতে য়েরোপীয় সংস্কৃতির ছাপ সর্বত্র।

এই ঘরগুলির মধ্যে সব চেয়ে মনোরম ঘরটি হচ্ছে মহারাজার নিজস্ব। তার নাম হচ্ছে 'লভ চেম্বার'। ঘরের দেওয়ালগুলিতে

কামকেলির বিভিন্ন প্রক্রিয়ার অনেক প্রাচীন এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য ছবি টাঙানো। বাকি অংশগুলি কিন্তু পুরোপুরি ভারতীয় পদ্ধতিতে সাজানো। মেঝের ওপরে পুরু কার্পেট ; সেই কার্পেটের গায়ে নানা রঙের দামি মনি, মুক্তা, রুবি বসানো থাকতো। বালিশ ছিল অনেক ; আর তাদের সব ক'টিই নীল ভেলভেটে মোড়া। সেই ভেলভেটের চারধারে দামি-দামি পাথর গাঁথা থাকতো। এক কথায় ঘরটিকে কামকেলির উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়েছিল।

প্রাসাদের ঠিক বাইরে ছিল একটি সুইমিং পুল। পুলটি বেশ চওড়া। এতটা চওড়া যে দেড়শ জন মেয়ে আর পুরুষ স্বচ্ছন্দে সেখানে সাঁতার কাটতে পারতো।

মহারাজা ভূপিন্দর সিং বাহাদুর মাঝে-মাঝে সেখানে পার্টি দিতেন। সেই পার্টিতে তিনি তাঁর প্রিয় মহিলাদের নিমন্ত্রণ করতেন। দু'চার জন অতি বিশ্বস্ত অনুচর আর কিছু আত্মীয় স্বজন ছাড়া ওখানে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না।

গ্রীষ্মকালে পুলের জল আসতো কমে। আশেপাশে নদী-নালা, আর সঞ্চিত জলাধার থেকে জল তুলে সেটিকে ভর্তি করা হোত। এই সময়ে জল খুব গরম থাকতো বলে টনটন বরফের চাঙড় তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হোত। ফলে, জলের উষ্ণতা কমে আসতো অনেকটা। সেই ভাসমান বরফের চাঙড় ধরে নারী আর পুরুষেরা মহানন্দে সাঁতার কাটতো। কখনও-কখনও সেই চাঙড়গুলির ওপরে বসে এক হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে আর এক হাতে অন্যের গায়ে জল ছিটোতো সবাই। পঞ্চাশ থেকে ষাট জন যুবতী পাতলা ফিনফিনে পোষাক পরে নানা ঢঙে বরফের চাঙড়গুলির ওপরে বসে, কখনও বা ভাসতে ভাসতে অন্যদের হাতে মদের পেয়ালা আর খাবারের প্লেট যোগান দিত ; উচ্ছ্বাস আর কলহাস্যে একজন আর একজনের গায়ে পড়ত ঢলে। যৌবনের উচ্ছলতা আর কড়া ফ্রেঞ্চ সুগন্ধে আলোড়িত হ'ত চারপাশ।

এই ধরনের হুল্লোড় প্রায় সারারাত ধরে চলতো। কোথাও কোথাও উলঙ্গ পুরুষ আর রমনীরা জলকেলিতে মসগুল হয়ে থাকতো; কেউ কেউ আবার ওপরে উঠে গান গাইতো, নাচতো ; আবার কোথাও কোথাও বা অর্দ্ধ উলঙ্গ যুবতীরা গাছের তলায় বসে উদাস মনে গুণ গুণ করে বিশেষ কোন গানের কলি আওড়াতো।

খানাপিনায় কোন রকম কার্পন্য বরদাস্ত করতেন না মহারাজা। যত পার খাও ; সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢালোয়া খাবার আসছে ; বাজারের সেরা খাবার আর সেরা মদ। এইসব পরিবেশন করার ভার ছিল অর্দ্ধনগ্ন কিশোরী আর যুবতীদের ওপর। সেখানে কোন পুরুষ চাকর, বয়-বাবুর্চি, খানসামা, অফিসার বা সামরিক পাহারাদারদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। আনুষ্ঠান চলার সময় মহারাজাকে কোনরকমে বিরক্ত করা চলতো না। নেহাত প্রয়োজন হলে টেলিফোনের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হতো ; অথবা একটি গোপন পথে তাঁর কাছে জরুরি সংবাদ চলাচল করতো। এই গোপন পথের বাঁকে বাঁকে আশী বছরেরও বেশী বয়সের চরিত্রবান আর নিরপরাধ বৃদ্ধেরা পাহারা দিত ; তাদেরই মারফত মহারাজা প্রয়োজন মত বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন।

এই উৎসবে বিদেশীদের নিমন্ত্রণ জানানো হোত না। তবে যে এর কোন ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়। মাঝে মাঝে কোন কোন য়েরোপীয় অথবা অ্যামেরিকান মহিলাকে তিনি আমন্ত্রণ জানাতেন ; তবে তিনি এমন একটি মহিলা যিনি উৎসবের সময় অতিথি হিসাবে মহারাজের মতিবাগ প্রাসাদে অবস্থান করতেন এবং যাঁর সঙ্গে গোপনে গোপনে মহারাজার প্রণয় অভিনয় চলতো।

তাঁর হারেমে রমনীদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশ'র ওপর। এদের কাউকেই কৃপা থেকে তিনি বঞ্চিত করতেন না। এঁদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণীতে যাঁরা পড়তেন তাঁরা হলেন মহারানী। দ্বিতীয় সারির মহিলাদের বলা হোত রানী ; এবং বাকি সব মহিলারা

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তেন। এঁদের ভেতরে মর্যাদারও তারতম্য ছিল। সেই অনুপাতে সম্মানেরও হেরফের হোত। মহারানীরা ছিলেন 'শত-স্বর্ণ প্লেটধারিনী' অর্থাৎ দুবেলা খাবার সময় তাঁদের প্রত্যেককে একশো সোনার প্লেটে খাবার দেওয়া হোত। খাবারের মধ্যে থাকতো নানান ধরণের পলোয়া, কারি, মাছ, মাংস, পুডিং ইত্যাদি ইত্যাদি। রাণীরা ছিলেন মহারানীদের অর্দ্ধেক পদমর্য্যাদাধারিণী। তাঁদের জন্যে দেওয়া হোত পঞ্চাশটি প্লেট। সেগুলি সব রূপোর। অন্যান্য রমনীদের দেওয়া হোত পেতলের থালা বাটি গ্লাস। তাঁদের খাবার কুড়ি পদের বেশী ছিল না।

আর মহারাজার ? তাঁর ভোজনপাত্রগুলি কেবল সোনারই ছিল না; সেগুলির গায়ে দামি পাথর, মনি, মুক্তা আর চুমকি বসানো থাকতো। খাওয়ার সময় তাঁর সামনে যে সব রকমারি প্লেট পড়তো সেগুলির সংখ্যা কোন সময়েই একশ পঞ্চাশের কম হোত না।

হারেমের মহিলারা কেউ কিন্তু তাঁর কাছে অন্তজা ছিল না। পদমর্যাদা বাড়ানোর সুযোগ সবাইকেই তিনি দিতেন। মহারাজার মনোরঞ্জন করার ক্ষমতা যাঁর যত বেশী তিনিই তত উঁচু ধাপে ওঠার সুযোগ পেতেন।

বয়স্থাদের হারেমে ঢোকানো হোত না। বালিকাদেরই সেখানে নিয়ে আসা হোত। যতদিন পর্যন্ত না তারা কিশোরীর পর্যায়ে আসতো ততদিন পর্যন্ত প্রাসাদের মধ্যেই তাদের লালন-পালন করার ব্যবস্থা ছিল। মহারাজার ইচ্ছামত তাদের শিক্ষা দেওয়া হোত। মহারাজার হাতে মদের গ্লাস, সিগারেট পৌঁছিয়ে দিয়ে আসার নির্দেশ থাকতো তাদের ওপরে। তাঁর টুকিটাকি কাজও করত তারা। মহারাজা তাদের আদর করতেন, চুমু খেতেন।

মহারাজার টাউটরা ভারতবর্ষ এবং বাইরের নানা দেশ থেকে বেছে-বেছে সুন্দরী কচি-কচি মেয়েদের সংগ্রহ করে আনতো। মারা যাওয়ার সময়ে মহারাজ ভূপিন্দর সিং বাহাদুরের হারেমে নানা বয়সের

তিনশ বত্রিশটি জেনানা ছিল। তাদের মধ্যে মহারানীর সংখ্যা দশ, রানীর সংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি; বাকি সব পরিচারিকার দলে। এদের যে কোন একটি বা একাধিক রমনীর সঙ্গে দিনে অথবা রাতে মহারাজা তাঁর খুসিমত কামলীলায় লিপ্ত হতে পারতেন।

মূল্যবান আসবাব পত্রের মত পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে মহারাজা নামকরা ডাক্তার সংগ্রহ করতেন। তাঁর দরবারে ছিলেন ব্রিটিশ ডাক্তার কর্নেল ফস আর কর্নেল হেয়েস। ফরাসী ডাক্তারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন যোশেফ হোর, আর বিশেষজ্ঞ এ-ব্লনডেল। প্যাথলজিক্যাল বিভাগে ছিলেন ভিয়েনার একটি ডাক্তার। একস-রে বিভাগে ছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার পলিট্জ। এঁদের অধীনে য়েরোপে শিক্ষিত অনেকগুলি দক্ষ ভারতীয় চিকিৎসকও ছিলেন।

এঁরা হলেন অ্যালোপ্যাথিক। হাকিম-বৈদ্যদেরও তিনি অনাদর করেন নি। মহারাজার চিকিৎসক রাজবৈদ্য পণ্ডিত রামপরসাদের অধীনে কয়েকটি বৈদ্য ছিলেন; আর ছিলেন মুঘল সম্রাটের নিজস্ব হকিমের সাক্ষাৎ বংশধর সাফা উল মুল্ক হকিম দিলওয়ার হাসান খাঁর অধীনে একদল হকিম।

এই সব ডাক্তারদের জন্যে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হোত তাঁর।

কিন্তু এত লক্ষ টাকা খরচ করে মহারাজা যে গাদা-গাদা ডাক্তার পুষেছিলেন সে কাদের জন্যে? আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন, প্রজাদের সুখ সুবিধের জন্যে? আরে রামো রামো! প্রজাদের জন্যে মোটা-মোটা মাইনে দিয়ে ডাক্তার পোষার মত মোটা বুদ্ধি তাঁর ছিল না।

তাহলে?

নিজের চিকিৎসার জন্যে? তিনি নিজে অবশ্য হৃদরোগে ভুগছিলেন শেষ বয়সে। পৃথিবীতে নাম করা এমন কোন ভাল ডাক্তার ছিল না যিনি মহারাজাকে পরীক্ষা করেন নি। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। কারণ, তাঁদের যে দুটি নির্দেশ ছিল তাদের কোনটিই

তিনি পালন করতে পারেন নি ; 'পারেন নি' না বলে চাননি বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হবে। হোক ডাক্তার, তাই বলে মহারাজা হয়ে অপরের নির্দেশ মানাটা নিশ্চয় অগৌরবের বিষয়।

কিন্তু তাঁদের নির্দেশ কী ছিল ?

একটি হচ্ছে, বেশী মদ খাবেন না , অপরটি হচ্ছে বেশী নারীসঙ্গ বর্জন করবেন।

এ দুটির কোনটিই তিনি মেনে নিতে রাজি হন নি। প্রথমত, মদ তিনি খেতেন না, বরং বলা যায়, মদই তাঁকে খেয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ তিনশ বাষট্টিটি যুবতী রমণী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছে। এমন কিছু রমণী তাঁর হারেমে ছিল যারা সারা জীবনে এক রাত্রির জন্যেও মহারাজার অঙ্ক-শায়িনী হতে পারেনি, এবং না পেরে দুঃখে আর ক্ষোভে তাদের মধ্যে কেউ কেউ গলায় দড়ি বেঁধে আত্মহত্যা করেছে। সুতরাং আশ্রিতবৎসল মহারাজা তাদের সঙ্গদানে বঞ্চিত করবেন কেমন করে ?

একবার মহারাজার রক্তের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিশেষজ্ঞ আব্রামিকে ডাকা হল। আব্রামির মাসে মাইনে ছিল এক লক্ষ টাকা। তিনি এসে দেখলেন কয়েকটি অর্দ্ধ উলঙ্গ সুন্দরী রমনীর মাঝখানে মহারাজা নিঝুম হয়ে পড়ে রয়েছেন। বেশ বোঝা গেল তিনি অত্যধিক মদ্যপান করেছেন।

আব্রামি সাহেব বুঝিতে পারলেন মহারাজাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা বৃথা। তবু তিনি একটি ইনজেকশন দিয়ে চলে গেলেন। পাছে মহারাজার অপমান হয় এই ভয়ে তিনি জানিয়ে গেলেন—মহারাজা ভালই আছেন ; আমার থাকার আর দরকার নেই।

মহারাজা যখন মরবেনই তখন আর অপ্রিয় সত্য কথাটা মুখের ওপরে বলে তাঁর অপ্রিয়ভাজন হয়ে লাভ কী ?

তাহলে এত ডাক্তারের প্রয়োজন কী ছিল তাঁর ?

ছিল তাঁর অসংখ্য প্রেয়সীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্যে।

হারেমের মহিলারা ভারতীয় ডাক্তারদের কাছে আবরণ উন্মোচন করতে লজ্জা পেত। মহারাজা তাদের অন্দরমহলে ঢুকতে দিতেন না। কিন্তু য়েরোপীয় ডাক্তারদের বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না। তাঁর বিশ্বাস ছিল মহিলাদের সম্বন্ধে এদেশীয় ডাক্তারদের সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক অনেক; বিশেষ করে 'সেক্স' বিষয়ে তাঁরা বেশ কিছুটা উদাসীন। তাঁদের হাতে হারেমের মহিলাদের নির্বিঘ্নে ছেড়ে দেওয়া যায়।

ডাক্তাররা সকালে দল বেঁধে রোঁদে বেরোতেন। ঘণ্টা তিনেক ধরে তাঁরা মহারানী, রানী আর অন্যান্য মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেন; তাদের রোগের কাহিনী শুনতেন; রিপোর্ট লিখে ফিরে আসতেন।

এক-আধ ডজন নয়, তিন-তিনশো মহিলাদের সনাক্ত করা কি সহজ ব্যাপার? ডাক্তাররাও কেমন যেন হিমসিম খেয়ে যেতেন। কাজটা সহজ করার জন্যে মহিলাদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হোত। মহারানীদের চিহ্নিত করা হোত ইংরিজি এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি অক্ষর দিয়ে। রানীদের এক, দুই, তিন, চার থেকে সুরু করে একশ পঞ্চাশ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে। তাছাড়াও অন্যান্য মহিলা ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল এ-১, এ-২, বি-১, বি-২, সি-১, সি-২ ইত্যাদি করে। এইভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীর দু'টি করে তালিকা তৈরি করা হোত।

একটি থাকতো মহারাজার কাছে, একটি থাকতো ডাক্তারদের কাছে। ডাক্তাররা জেনানা মহলে ঢুকে সেই তালিকাটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতেন। মহিলারা উলঙ্গ হয়ে উপুড় হয়ে শুতো। ডাক্তাররা ইনজেকশান দিয়ে রিপোর্ট নিয়ে দরবারে ফিরে আসতেন। সেই সব রিপোর্টের ওপরে ডাক্তাররা মহারাজাকে ঘিরে আলোচনাতে বসতেন। এইটি ছিল মহারাজার সবচেয়ে জরুরী দৈনন্দিন রাজকার্য। ডাক্তারদের পূর্ণ রিপোর্ট পেয়ে মহারাজা বুঝতে

পারতেন কোন্ কোন্ রমনীরা সেদিন রাত্রিতে তাঁর মনোরঞ্জন করতে সমর্থ। তাদের সঙ্গে মহারাজা সেই রাত্রিটি যাপন করতেন।

সুন্দরী যুবতী দেখলে সব পুরুষই মুগ্ধ হয়; কিন্তু নারীদের সৌন্দর্য আর যৌবন কেমন করে অনেক দিন ধরে রাখা যায় সে বিষয়ে মহারাজা ভূপিন্দর সিং বাহাদুরের মত ওয়াকিবহাল মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে ক'জন ছিলেন তা আমার জানা নেই। মহারাজা কোন দিনই প্রৌঢ়া রমনীদের পছন্দ করতেন না। তাই কেমন ক'রে প্রৌঢ়াদেরও যুবতী ক'রে রাখা যায় সেদিক থেকে গবেষনারও অন্ত ছিল না তাঁর। এবিষয়ে ফরাসী ডাক্তাররা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এ সম্বন্ধে দেওয়ান জারমনি দাশ তাঁর 'মহারাজা' গ্রন্থের তেইশ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তারই কিছুটা অংশ আমি বাংলায় অনুবাদ করে দিলাম।

ফরাসী ডাক্তারেরা মহিলাদের যৌননলিতে এক ধরণের বিশেষ ইনজেকশন দিতেন। তার ফলে তাদের গা থেকে এক রকম মিষ্টি গন্ধ বেরোত। সেই গন্ধ মহারাজার অবশ ইন্দ্রিয়গুলিকে সতেজ করে তুলতো। মহিলাদের জরায়ুর ভেতর থেকে রস সংগ্রহ করে কর্নেল ফক্স অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেটিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে অন্যান্য ফরাসী ডাক্তারদের কাছে তার ফল জানাতেন। ইনজেকশন দিয়ে মেয়েদের যৌননালির মধ্যে সুগন্ধী বীজাণু সৃষ্টি করা হোত; আর সেই সঙ্গে কসটিক সোডা দিয়ে তৈরি মলম নালির মধ্যে ঢুকিয়ে দুর্গন্ধময় বীজানুগুলিকে নষ্ট করে দেওয়া হোত। অনিয়মিত ঋতুস্রাব অথবা অন্যান্য গোলোযোগের জন্যে যে সমস্ত যুবতীদের গা থেকে বিশ্রী গন্ধ ছাড়তো তাদের জন্যেও ওই একই ব্যবস্থা ছিল।

কী করে মহিলাদের স্বাস্থ্য ছবির মত সুন্দর হবে, কেমন করে তাদের গা থেকে সুন্দর গন্ধ বেরোবে তার জন্যে ডাক্তারি গবেষণার আর শেষ ছিল না। যাদের বুকের চেহারা বেঢপ বা থলথলে তাদের বুকে অপারেশন চালাতেন সার্জেনরা। সেই অপারেশনের উদ্দেশ্য

ছিল কুচ দুটিকে ছোট করে শারীরিক গঠনের সঙ্গে সমতা বজায় রাখা। কোন-কোন সময়ে মহারাজার ইচ্ছা অনুসারে মেয়েদের পয়োধরগুলিকে ছোট-বড় করা হোত। মহারাজা চাইতেন কারও বুক দুটি হবে ডিমের মত, কারও বা আলফেনসো আমের মত, আবার কারও কারও বা পীচ ফলের মত। এসব ব্যাপারে ফরাসী ডাক্তাররা অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন; এবং মহারাজা যেরকম নক্সা দিতেন ঠিক সেই রকম বুক তাঁরা তৈরি করে দিতেন। সেই সঙ্গে মহিলাদের মুখ আর অঙ্গ সৌষ্টবের দিকেও যথেষ্ট নজর দেওয়া হোত। দক্ষ নাপিতের তত্ত্বাবধানে প্রাসাদের অলিন্দে মহিলাদের চুল ছাঁটার সেলুন, নখ আর পায়ের কড়া কাটারও ভাল ব্যবস্থা ছিল। ভারতীয় আর বিদেশী বিখ্যাত জুয়েলার এবং সিল্ক ব্যবসায়ীরা বেনারস আর ফ্রান্সের দোকান থেকে দামি মণি-মুক্তার গহনা, এক নম্বরের ব্রোকেড, আর শাড়ী রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসতো। রুচি আর প্রয়োজনমত হারেমের মহিলারা তাদের মধ্যে থেকে যতগুলি ইচ্ছে জিনিস বেছে নিতে পারতো। জিনিসপত্রের দাম যা চাওয়া হোত তা অবশ্য বাজারের দামের চেয়ে অনেক অনেক বেশী; কিন্তু মহারাজা তা নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাতেন না। ব্যবসাদাররা প্রচুর ধনসম্পত্তি নিয়ে ফিরে যেত।

রাজপ্রাসাদের অলিন্দগুলি সুন্দর সুন্দর ফুল, ঝাউ গাছ, গোলাপ, জুঁই ফুল, টিউলিপ আর ক্রিসানথিমামে বোঝাই থাকতো। ভারতের প্রমোদ শহর লখনৌ, আর ফ্রান্স থেকে সুগন্ধ এবং ভারতীয় সুগন্ধী ধূপ মহিলাদের প্রকোষ্ঠে থাকতো জ্বালা। ফলে, যে কোন আগন্তুকের কাছে ঘরগুলি বেশ একটি আমেজের সৃষ্টি ক'রে বসতো।

ফ্রান্সের সর্বাধুনিক গন্ধে মাখানো ফুল আর মুক্তার অলঙ্কারে সুসজ্জিতা এই তিনশ মহিলাদের রঙ-বে-রঙের পোশাকে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য এক অভূতপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতো; যে দেখতো

সে-ই একেবারে মোহিত হয়ে যেতো। মহারাজা তাদের মধ্যে বিপুল আনন্দে ঘুরে বেড়াতেন, কারও কারও সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতেন, কারও কারও বা গাল টিপে দিতেন। আনন্দ আর হুল্লোড়ে কোন রকম কার্পণ্য ছিল না। মহারাজার মোতিবাগ প্রাসাদে যেরকম আনন্দের ফোয়ারা ছুটতো, যেরকম বাঁধনহারা উত্তেজনার ঢল নামতো পৃথিবীর আর কোথাও বুঝি ঠিক তেমনটি দেখতে পাওয়া যায় না।

কোন মহিলার একটি বা দুটি সন্তান হওয়ার পরেই কর্নেল হেয়েস তাকে বন্ধ্যা করে দিতেন, যাতে আর কোন সন্তানের জন্ম দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব না হয়।

ডাক্তার ডোর মহিলাদের পেট জরায়ু আর টিউমার প্রভৃতি কঠিন অপারেশনগুলি বিপুল দক্ষতার সঙ্গে করতে পারতেন...। হারেমের প্রিয় মহিলাদের এই রকম অপারেশনের সময়ে মহারাজা সাধারণত উপস্থিত থাকতেন; এবং ডাক্তার যখন ছুরি চালাতেন মহারাজা আনন্দের সঙ্গে তা লক্ষ্য করতেন। ভারতীয় ডাক্তারদের সামনে উলঙ্গ হতে এই সব মহিলারা বড় সঙ্কোচ বোধ করতো; কিন্তু য়েরোপীয় ডাক্তারদের কাছে সেরকম কোন সঙ্কোচ তাদের ছিল না; পরীক্ষার জন্যে নিশ্চিন্ত মনে আর কোন রকম দ্বিধা না করেই তাঁদের হাতে তারা নিজেদের প্রতিদিনই ছেড়ে দিত। পর পর লাইনবন্দী হয়ে উলঙ্গ অবস্থায় তারা শুয়ে পড়তো; ডাক্তাররা ইনজেকশন দিয়ে যেতেন, যৌননালি বা জরায়ুতে মলম লাগিয়ে দিতেন। কোন অনূঢ়া যুবতী মহারাজার অঙ্কশায়িনী হওয়ার পরে মহারাজা যদি যৌনসংসর্গে কোন অসুবিধে বোধ করতেন, সেই যৌন সংসর্গকে সহজ করে তোলার জন্যে ডাক্তাররা ছোট খাট অপারেশন করতে রাজি ছিলেন।

মহারাজার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে ওষুধ, পুষ্টিকর খাদ্য আর টনিকেরও ব্যবস্থা ছিল। অতিরিক্ত নারী সহবাসের ফলে পাছে মহারাজা দুর্বল হয়ে পড়েন এই ভয়ে মহারাজের জন্যে গাজর দিয়ে

তৈরি বিশেষ বলকারক খাবার তৈরি করা হোত। গাজরের শক্তি বাড়ানোর জন্যে সঙ্গে মেশানো হোত যুবক পুরুষ চড়াই পাখির মাথার পেছন দিকের নিচের অংশ, বলকারক শাকসব্জী, আর নানারকম খনিজ পদার্থের গুঁড়ো।

এই রকম ওষুধের জন্যে খরচ হোত পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা! এই বিপুল অর্থ ব্যয়ে যে পরিমাণ ওষুধ তৈরি হোত তাতে মহারাজার দু'দিনের বেশী চলতো না। এই ওষুধ খেয়ে মহারাজার স্নায়ু দৌর্বল্য কমে আসতো, এবং প্রণয় লীলা জোর কদমে চালানোর জন্যে শরীরে যথেষ্ট বল পেতেন তিনি।

পাতিয়ালা স্টেটের শাসনকর্তা মহারাজধিরাজ স্যার ভূপিন্দর সিং বাহাদুর যে নারীদরদী ছিলেন, এবং সেই নারীদের দেহে যৌবনকে বেঁধে রাখার জন্যে আর তাদের বিলাস-ব্যসনের প্রয়োজনে বছরে যে কোটি-কোটি টাকা আর অজস্র সময় ব্যয় করতেন তা আপনারা বুঝতে পারলেন। শোনা যায় হারেমের প্রতিটি রমনীকেই তিনি ভালবাসতেন, এবং প্রতিটি রমনীই নাকি তাঁর অঙ্কশায়িনী হওয়ার জন্যে কান্নাকাটি করতো, আশ্রয় নিত নানা ছলনার। আশ্রিত বৎসল মহারাজও যত দূর সম্ভব তাদের মনোরঞ্জন করতেন। গুজব, রমনীরাও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতো; ভালও হয়ত বাসতো কিছুটা। না বাসলে, মহারাজাধিরাজের মৃত্যুর পরে তিনশ বাষট্টিটি বিধবা কেঁদে কঁকিয়ে প্রাসাদ বিদীর্ণ করেছিল কেন? এতগুলি রমনীর মনোহরণ করার শক্তিটা মহারাজার কোথায় ছিল?

সেই কথাটাই এবারে বলছি। তাহলেই ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আগেই বলছি মহারাজা ভূপিন্দর সিং বাহাদুর সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; কেবল রাজনীতিতেই নয়, কূটনীতি, ধর্ম, দর্শন, এবং অন্যান্য বিষয়েও তাঁর জোড়া তখন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। তবে যৌন কলায় তিনি গোপিনী সম্রাট দ্বাপরের কেষ্ট

আহ্বান জানানো হোত। দেবীর অনুগ্রহ লাভের আশায় সেই আহ্বানকে কেউ প্রত্যাখ্যান করতে সাহস পেত না। পর-পর কয়েকটি করে বোতল পেটে পড়ার পরে সকলেই যখন নেশায় বুঁদ হয়ে উঠতো, ঠিক তখনই প্রধান পুরোহিত কয়েকটি অনূঢ়া কিশোরীকে কাছে ডেকে আনতেন। তারা কাছে এলে সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে দেবীর কাছে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে প্রার্থনা জানাতে নির্দেশ দিতেন।

অপ্রকৃতিস্থ মানুষগুলির ওপরে প্রভাব বিস্তার করার জন্যে ঠিক সময়ে স্নুরু হোত হোম। বিরাট চুল্লীতে গনগনে আগুণ জ্বলে উঠতো। সেই আগুণের মধ্যে ঢালা হোত ঘি, তেল, চাল, আর ডাল। ধোঁয়ায় ভরে যেতো চারপাশ। আচ্ছন্ন পরিবেশে আবার শুরু হোত দেবীর স্তব পাঠ। দেড়শ' থেকে দু'শ নরনারীর সমবেত স্তবে চারপাশ গমগম করে উঠতো। আবার চলতো বোতল-বোতল মদ্যপান। সেগুলি মদ নয়, দেবীর প্রসাদী চরণামৃত। সেই চরণামৃতের ঠেলায় নিজেদের সামলিয়ে রাখতে না পেরে অনেকেই ভক্তির ঘোরে ধেই-ধেই করে নাচতো, এ ওর গায়ে বমি করে দিতো; কেউ কেউ বা মেঝের ওপরে গড়াগড়ি খেতো।

ঠিক এই সময় পুরোহিত গম্ভীর কণ্ঠে দেবীর বন্দনা করে মেয়ে পুরুষদের যৌনসঙ্গে লিপ্ত হতে আদেশ দিতেন। সারা মণ্ডপ জুড়ে চলতো উলঙ্গ নরনারীদের যৌনবিহার। হারেমের ভেতর থেকে বারো থেকে ষোল বছর বয়সের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে উলঙ্গ মেয়েদের মণ্ডপের মধ্যে টেনে আনা হোত; টেনে নিয়ে এসে মদ ঢেলে দেওয়া হোত তাদের কাঁধে। সেই মদ চুইয়ে-চুইয়ে বুকের ওপর থেকে তাদের নিম্নাংশে গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা আর তাঁর কিছু অনুচর সেইখানে জিব দিয়ে চাটতেন।

সেই সময় অন্য পাশে বিপুল উৎসাহে ছোট ছোট ষাঁড় বলি দেওয়া হোত। ষাঁড়ের তাজা রক্তে ভেসে যেত চারপাশ। প্রধান পুরোহিত

সমবেত ভক্তদের সঙ্গে গলা মিশিয়ে আবার সুরু করতেন দেবীর স্তব। ধূপ-ধুনো-গুগ্‌গুল-আতরের গন্ধে, হোমের ধোয়ায়, মদ আর তাজা রক্তের স্রোতে যে পরিবেশের সৃষ্টি হোত তার মধ্যে পড়ে মানুষ আর মানুষ থাকতো না; সোজাসুজি ভক্ত বনে যেতো। ধর্মের ভাঁওতায় ভুলে মোক্ষলাভের আশায় উলঙ্গ নারী আর পুরুষ দেবীকে তুষ্ট করার বাসনায় উদ্দাম যৌন আসঙ্গে মেতে উঠতো; তখন আর বাপ, মা, ভাই, বোনের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য থাকতো না; তখন সবাই সমান, একই পথের পথিক—দেবীর পূজায় উৎসর্গিত আত্মা; নারী আর পুরুষ; পুরুষ আর প্রকৃতি। পুরোহিত আর মহারাজা যে কত গভীর জলের মাছ তা তারা বুঝতে পারতো না। তাদের আরও উত্তেজিত করার জন্যে প্রধান পুরোহিত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতেন: মদ, মাছ, মাংস, অ্যালকোহল আর অবারিত যৌন চর্চা—এই পাঁচটি পাপই কলিযুগে মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়; 'কারন' পান কর; বোতলের পর বোতল, হাঁড়ির পর হাঁড়ি শেষ কর; মাতাল হয়ে মাটিতে পড়ে লুটোপটি খাও, আবার পান কর। তবেই তোমরা মুক্তিলাভ করবে; পরজন্মের হেঁপা থেকে রেহাই পাবে। কৌল মার্গ বড় কঠিন ধর্ম। অনেক পাকা যোগীও এই মার্গে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন না।

এই হল পাতিয়ালা স্টেটের মহারাজাধিরাজ স্যার ভূপিন্দর সিং বাহাদুরের ধর্মযজ্ঞ। এই রকম যজ্ঞের আয়োজন মহারাজা নানা কারনে করতেন। চেম্বার অফ প্রিন্সেসের চ্যানসেলর হওয়ার জন্যেই বলুন, কোন বিশিষ্ট মহারানীর সন্তান হওয়ার জন্যেই বলুন, ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কিছু পুরস্কার লাভ করার আশাতেই বলুন, কোন শত্রুকে নিধন করার জন্যেই বলুন, আবার নিজের ভাঙা স্বাস্থ্য জোড়া দেওয়ার জন্যেই বলুন—বারো মাসে তের পার্বন মহারাজার লেগেই থাকতো। মহারাজার সমস্ত নোংরামির প্রধান পাণ্ডা ছিলেন তান্ত্রিকপ্রবর পণ্ডিত প্রকাশ ঝা। নেশাগ্রস্ত মানুষগুলির কাছে নিজের শক্তি আর ভক্তি প্রমান করার জন্যে মাঝে-মাঝে তিনিও ম্যাজিক

দেখাতে কসুর করতেন না। মাটির ঠাকুরের মুখ দিয়ে তিনি নাকি কথা বলাতে পারতেন; কখনও কখনও গলার স্বর বিকৃত করে দ্বৈত স্বরে কথা বলে উপস্থিত ভক্তদের কাছে দেবীর সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপের পরিচয় দিতেন। রঙের নেশায় মহারাজারও কখনও কখনও মনে হোত দেবী তুটি বরাভয় হস্ত প্রসারিত করে তাঁকে আশীর্বাদ করছেন।

ব্যাপারটা প্রথমে মতিবাগ প্রাসাদের ভেতরেই চাপা ছিল। তারপরে খবরটি যথারীতি অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে ছড়িয়ে পড়লো। যে সব রাজাদের বড় বড় হারেম ছিল তাঁরা ভূপিন্দর সিংহের কৌশলটি ধরতে পেরে মনের আনন্দে কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ করে উঠলেন, এবং যথারীতি প্রাসাদের গোপন কক্ষে তান্ত্রিক যজ্ঞ সুরু করে দিলেন।

শুধু পাতিয়ালার মহারাজাই নয়, ঠক বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাওয়ার কথা। নারী নিয়ে নষ্টামি করতে, আর খুপসুরৎ মেয়েদের পেছনে কোটি-কোটি টাকা ওড়াতে সেকালের সব রাজা-মহারাজারাই প্রায় সমান ওস্তাদ ছিলেন। রাজসিংহাসনের মত প্রমোদ উদ্যান তাঁদের বিলাস সম্ভোগের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল।

ভরতপুরের হিজ হইনেস মহারাজা কিসেন সিং বাহাদুরের প্রমোদলীলার কাহিনী শুনুন। শোনা যায় মহারাজ রাজন্য সমাজে একজন দক্ষ সাঁতারু বলে পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি সব চেয়ে ভালবাসতেন জনসমাজের চোখের আড়ালে কোন সুইমিং পুলে উলঙ্গ রমনীদের নিয়ে জলকেলি করতে। চরিত্রের দিক থেকে মহারাজা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। অদ্ভুত যে ছিলেন তা তাঁর চিন্তাধারা থেকেই বেশ বোঝা যায়।

নিরুপদ্রবে সাঁতার কাটার জন্যে তিনি মার্বেল পাথরের একটি সুইমিং পুল তৈরী করিয়েছিলেন। পুলটির পেছনে কয়েক লক্ষ্য টাকা খরচ হয়েছিল তাঁর। পাড় থেকে জলের প্রান্ত পর্যন্ত কুড়িটি চন্দন

কাঠের সিঁড়ি ছিল। মহীশূরের চন্দন বনের ভেতর থেকে আসল চন্দন কাঠ সংগ্রহ ক'রে শিল্পীরা বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে সিঁড়িগুলি তৈরি করেছিলেন। এই পুলটিতে জল ছিল দু'ফুটের মত গভীর। এইখানে মহারাজা বাহাদুর তাঁর চল্লিশটি প্রেয়সী নিয়ে বিপুল আনন্দে জলকেলি করতেন। চল্লিশটি উলঙ্গ রমনী জোড়ায় জোড়ায় এক একটি সিঁড়ির দুপাশে দাঁড়িয়ে মহারাজাকে অভ্যর্থনা জানাতো। মহারাজা জলে নামার আগে ধীরে ধীরে সেই সিঁড়িগুলি দিয়ে নেমে আসতেন। নামার সময় তিনি প্রত্যেকটি রমনীর দিকে তাকাতেন, হাসতেন, মস্করা করতেন ; কাউকে ঠেলে দিতেন, কাউকে বা জড়িয়ে ধরতেন। রমনীরা মহারাজার রসিকতায় কলহাস্যে চারপাশ মুখরিত করে তুলতো।

এখানে প্রায়ই এক জাতীয় নাচ হোত। তার নাম ছিল 'বাতি-নাচ ' এই নাচের বিশেষ রীতি ছিল একটি। প্রত্যেক রমনীর কাছে একটি বিশেষ ধরনে তৈরী করা একটি করে বাতি থাকতো। মহারাজা জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে চারধারের বিজলিবাতিগুলিকে এক সঙ্গে থিয়েটারী ঢঙে নিবিয়ে দেওয়া হোত। আলো নিবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতিগুলি জ্বলে উঠতো। প্রতিটি রমনী তার নাভির নিচে জ্বলন্ত বাতিটিকে আটকিয়ে দিত ; এমন ভাবে আটকাতো যাতে তার কোমরের বেড় আর গঠন, আর সেই সঙ্গে তার দেহের গোপন অংশটি স্পষ্ট দেখা যায়। সেইভাবে চল্লিশটি রমনী জলে নেমে পড়তো।

তারপরই সুরু হোত এক অদ্ভুত নৃত্য। জলের মধ্যে এমন ভাবে তাদের নাচতে হোত যাতে জলের ছিটে লেগে বাতিগুলি নিবে না যায়। যার নিবে যাবে তারই আউট হয়ে যাওয়ার পালা। মহারাজাকে মাঝখানে রেখে রমনীরা বিভিন্ন ঢঙে, বিভিন্ন কায়দায় অল্প-বিস্তর লাফিয়ে-লাফিয়ে নাচতো। কিন্তু জলের ঝাপটার আর উচ্ছাসের দাপটে একটির পর একটি বাতি নিবে যেত। যার বাতি সব শেষে নিবতো, সেই অনুষ্ঠানে সেই রমনীই বিজয়িনী বলে স্বীকৃতি

লাভ করতো। জলকেলি শেষ হওয়ার পরে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হোত ; আর সেদিন রাত্রিতে মহারাজা স্বয়ং তাকে নিজের বিছানায় স্থান দিয়ে কৃতার্থ করতেন।

এই রমনী-রমন যজ্ঞে রাজামহারাজা সভ্যতা, ভব্যতা, সংস্কৃতি, শালীনতা সব বিসর্জন দিয়েছিলেন ; হত্যা, রাহাজানি, লুটপাট এক রকম প্রায় নিত্য নিয়মিত ছিল। হারেমের নির্জন কক্ষে কত রমনীর আর্তনাদ নিশীথে প্রেত আত্মার মত ঘুরে বেড়াতো। কোন একটি নারীকে কোন রাজার মনে ধরলে তার আর রেহাই থাকতো না। 'বাওলা মার্ডার কেশ' এই ধরনের একটি লোমহর্ষক ঘটনা। এই নারকীয় ঘটনার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন মহারাজ টুকো জি রাও হোলকার। মহারাজা অল্প বয়স থেকেই একটু বেশী মাত্রায় পেকেছিলেন। নিজের বুদ্ধি, বৃত্তি, আর দক্ষতার ওপরে তাঁর আস্থা ছিল অসম্ভব। এরই ফলে ব্রিটিশ সরকার আর পলিটিক্যাল দপ্তরের সঙ্গেও তাঁর খিটিমিটি লেগেই থাকতো। এই সব দেশীয় রাজ্যের সন্তানদের ওপরে ব্রিটিশ সরকারের একটা নরম ভাব চিরকালই ছিল ; টুকো জি রাও হোলকার তার সুযোগ পুরোমাত্রায় আদায় করে-ছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে তিনি পারেন নি। পারেন নি তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাত্রার জন্যে।

নারীদের ওপরে তাঁর দুর্বলতার বুঝি সীমা পরিসীমা ছিল না। সুন্দরী যুবতী ক্ষীণ-কটি রমনীদের তিনি কিছুতেই রেহাই দিতেন না। কারও প্রত্যাখ্যানও সহজে মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল।

এই রকম একটি রমনী হচ্ছে মমতাজ বেগম। অমৃত সহরের এই ক্ষীণকটি, সুন্দরী, তন্বী, পীণপয়োধরা নর্তকী তিনি। ইন্দোরের প্রাসাদে নিয়ে এসে হারেমের মধ্যে বন্দী করে রেখেছিলেন। মমতাজকে পেয়ে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল ; কিন্তু মমতাজ কোন দিনই তাঁকে ভালবাসতে পারে নি। মহারাজার কামুকতায় অতিষ্ঠ হয়ে সে দু'একবার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল বটে ; কিন্তু হারেম

সুরক্ষিত থাকার ফলে সিপাহী-শান্ত্রীর চোখে ধুলো দিয়ে সে পালিয়ে যেতে পারে নি। বেয়াড়া মহিলাদের কঠোর শাস্তি কী করে দিতে হয় মহারাজার তা অজানা ছিল না; কিন্তু রূপের জলুসে তখন তিনি এতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে মমতাজের ওপরে চরম শাস্তি দিতে তিনি অপারক ছিলেন; তবে কোন সময়েই তিনি তাকে কাছ ছাড়া করতেন না।

একদিন সুযোগ এল মমতাজের। মহারাজা স্পেশাল ট্রেনে করে মুসৌরী যাচ্ছিলেন। অন্য একটি কামরাতে প্রহরী বেষ্টিতা হয়ে যাচ্ছিল মমতাজ বেগম। মাঝপথে মমতাজ ট্রেনের কামরা থেকে পালিয়ে গেল। পরের দিন কোন একটি স্টেশনে ট্রেন থামার পরে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন মহারাজা। বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে লাল হয়ে যান তিনি; ছুটে আসেন মমতাজের কামরাতে। সেখানে যারা পাহারায় ছিল তাদের কয়েকজনকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জেলে পাঠিয়ে দেন; বাকিদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন।

সবই করলেন; কিন্তু মমতাজ বেগমকে পাওয়া গেল না। চারপাশে চর পাঠানো হল। ভগ্নদূতেরা মুখ চুন করে ফিরে এল। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে আর হতাশায় প্রমোদবিহার বাতিল ক'রে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে-করতে ইন্দোরে ফিরে এলেন মহারাজ টুকো-জি-রাও হোলকার।

সারা ভারতবর্ষ তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলো মহারাজার সাকরেদেরা। চর পাঠালো দিকে দিকে। প্রচুর পুরস্কার ঘোষনা করা হল। কিন্তু মমতাজকে খুঁজে পাওয়া গেল না। একেবারে কর্পুরের মত উবে গিয়েছে সে।

শেষ পর্যন্ত মমতাজের খোঁজ পাওয়া গেল বম্বেতে। তখন সে বম্বের মেয়র মিঃ বাওলার রক্ষিতা হয়ে দিন কাটাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা ঠিক হয়ে গেল সাকরেদদের। জোর করে

ধরে নিয়ে যেতে হবে মমতাজকে। ধরে নিয়ে যেতে পারলে প্রচুর উপঢৌকন পাওয়া যাবে মহারাজার কাছ থেকে।

কিন্তু কী করে তা সম্ভব ?

পরিকল্পনাও ঠিক হয়ে গেল।

মিঃ বাওলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে ঝটপট লোক চলে গেল। তিনি কখন কোথায় যান, কী করেন,—সব সংবাদ সরবরাহ করে গুপ্তচরেরা ফিরে এল। জানা গেল, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মিঃ বাওলা মমতাজ বেগমকে নিয়ে 'ঝুলোনো বাগানে' হাওয়া খেতে বেরোন। খবর পাওয়া মাত্র, সাকরেদদের দ্বিতীয় পরিকল্পনা ঠিক হয়ে গেল।

একদিন সন্ধ্যার সময় "ঝুলানো-বাগানের (Hanging Gardens) আশেপাশে ইন্দোর সরকারের কয়েকখানা মোটরগাড়ীকে ওৎ পেতে বসে থাকতে দেখা গেল। গাড়ীগুলির ভেতরে ছিল ইন্দোর সরকারের কয়েকজন অফিসার আর ইনসপেকটর জেনারেল অফ পুলিশ।

যথা সময়ে মমতাজ বেগমকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ বাওলা এসে হাজির হলেন। মহারাজার সাকরেদরা ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর ওপরে। মমতাজকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। মিঃ বাওলা আততায়ীদের লক্ষ্য করে রিভলভারের গুলি ছুঁড়লেন। উত্তরে পর-পর কয়েকটি রিভলভার গর্জে উঠলো। গোলমাল শুরু হল চারপাশে। ধোঁয়া পরিষ্কার হলে দেখা গেল মিঃ বাওলা নিহত হয়েছেন। সেই সুযোগে কয়েকজন মমতাজ বেগমকে টানতে টানতে ইন্দোর ষ্টেটের গাড়ীতে তোলার চেষ্টা করলো।

কিন্তু পারলো না। দুজন ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার তখন সেখানে হাওয়া খেতে গিয়েছিল। গুলির শব্দে আর মমতাজ বেগমের চিৎকারে তারা দৌড়ে এসে আততায়ীদের ধরে ফেললো। ইন্দোর

সরকারের অফিসাররা আর ইনসপেকটর জেনারেল অফ পুলিশ অবস্থা দেখে সোজা কেটে পড়লো।

কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়লো। অনুসন্ধানের ফলে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল। আসল পাণ্ডা ধরা পড়লো। মাওকা পেল ব্রিটিশ সরকার। এতদিন ব্রিটিশ বিদ্বেষী টুকো-জি-রাও হোলকারকে কায়দা করার জন্যে ভাইসরয় তক্কে তক্কে ছিলেন ; এবারে তাঁর বিরুদ্ধে নরহত্যা আর নারী অপহরণের অভিযোগ আনা হল। শুরু হোল বিচার বিভাগীয় তদন্ত। দোষী সাব্যস্ত হলেন মহারাজা তাঁকে বলা হোল ; আপনার কাছে বর্তমানে দুটি পথ খোলা রয়েছে। একটি হচ্ছে সিংহাসন পরিত্যাগ করা ; অপরটি হচ্ছে, বিচার বিভাগীয় তদন্তের মুখোমুখী হওয়া। এ-দুটোর একটা বেছে নিন।

মহারাজা প্রথমটিই বেছে নিলেন। ছেলে যশোবন্ত সিং জি রাও-কে সিংহাসন দিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদের বাইরে চলে গেলেন।

এই রকম নারীঘটিত ব্যাপারে আর একটি মহারাজাকে সিংহাসন পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। তিনি হচ্ছেন পাঞ্জাবের নব-স্টেটের হিজ হাইনেস ফরজান্দ-ই-অর্জুমান্দ আকিদাত-পামান্দ রূপতুমন সিং মহারাজা বাহাদুর। ব্যাপারটা ঘটেছিল এক নীলচক্ষু হরিণীকে কেন্দ্র করে। নাম তার রাচনী। তাকে নিয়েই মন কষাকষি শুরু হয়েছিল পাতিয়ালার মহারাজা ভূপিন্দর সিং বাহাদুরের সঙ্গে।

নব-স্টেটের একটি চাষীর মেয়ে রাচনী। পাতিয়ালার মহারাজা একবার হরিণ শিকার করতে-করতে হঠাৎ নব-স্টেটের সীমানার ভেতর ঢুকে পড়েন। একটি হরিণ তিনি গুলি করে মারেন। সেই মৃত হরিণটিকে দেখার জন্যে গ্রামবাসীরা দল বেঁধে হাজির হয়। সেই দলের মধ্যে রাচনীও ছিল। সকলের চোখ যখন মৃত হরিণটির দিকে ফেরানো

ছিল, সেই সময় মহারাজা অতৃপ্ত চোখে রাচনীকে দেখছিলেন। তাকে দেখে তিনি একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যস! শকুন্তলাকে দেখার পরে মহারাজ দুষ্মন্তের যে অবস্থা হয়েছিল রাচনীকে দেখার পরে মহারাজ ভূপিন্দর সিং বাহাদুরের মানসিক অবস্থা ততখানি বেচাল হয়েছিল কিনা সে-সংবাদ আমাদের নেই; তবে তিনি যে যৌন লালসায় বিশেষ কাতর হয়েছিলেন সেকথা বিশদ ভাবে বলার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ, সেইখানেই এবং তার পরে অনেকবারই মহারাজা রাচনীর বাবা মার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন মেয়েকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে। ওদিকে রূপদমন সিং-ও উঁচিয়ে বসেছিলেন। সেদিক থেকে বিচার করে নিছক বিজ্ঞতার সঙ্গে তারা প্রচুর পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রস্তাবে অসম্মতি দেয়।

মহারাজা অত সহজে কোন রূপসী যুবতীকে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিলেন না; তিনি কালক্ষেপ না করেই (এসব ব্যাপার তিনি কোন দিনই বৃথা কালক্ষেপ করেন নি) কয়েকটি শিখ সামরিক কর্ম্মচারীর সঙ্গে যোগসাজসে রাচনীকে অপহরণ করিয়ে সোজা নিয়ে তুললেন মতিবাগের হারেমে।

ভূপিন্দর সিংহের এরকম অরাজকীয় বর্বর ব্যবহারে রূপদমন সিং ক্ষেপে লাল। আমার রাজ্য থেকে নারী অপহরণ! খাবারের প্লেট থেকে রসাল খাদ্যদ্রব্য চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলে মানুষের যে অবস্থা হয় রূপদমন সিংহের অবস্থাও সেই রকম দাঁড়ালো। তিনি হুংকার দিয়ে বললেনঃ 'আমিই বা কমতি কিসের?' অনুচরদের আদেশ দিলেনঃ বদলা চাই। নারীর বদলা নারী।

ব্যস! মহারাজার সিপাহী শান্ত্রীর দল ঝাঁপিয়ে পড়লো পাতিয়ালার সীমান্তে। সুন্দরী সুন্দরী যুবতীদের অপহরণ করে পুরে দিল মহারাজার হারেমে।

পাতিয়ালার মহারাজা হুমকি দিলেন ঃ ক্যায়া ! আমার স্টেটের মেয়েদের অপহরণ !

মন কষাকষি সুরু হয়ে গেল তুই মহারাজার। নারী থেকে জমি অপহরণ পর্যন্ত। তুটি স্টেটের সীমান্তে তু'পক্ষের সেনাবাহিনী তু'পক্ষের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে কুচ কাওয়াজ করলো ; হোল ছোটখাট কয়েকটি সংঘর্ষ ; হতাহত হোল তুপক্ষেরই কিছু লোক।

মেড়ার লড়াই ভেবে ভারত সরকার প্রথমে তেমন গা দেয় নি। কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখে শেষ পর্যন্ত চোখ পাকিয়ে দৌড়িয়ে এল। লাঠি ঘোরাও সেটা না হয় বুঝি ; কিন্তু এ যে যুদ্ধ। ওসব মামদোবাজি চলবে না। হল্ট।

পাতিয়ালার মহারাজা হেসে বললেন ঃ আমার এক হাতে তরোয়াল, আর এক হাতে গদা। আমি লড়বো কেমন করে ? আসল বদমাশ ওই নব স্টেটের রাজা।

নব স্টেটের রাজা চোখ পাকিয়ে বললেন ঃ কভি নেহী। যত নষ্টের গোড়া ওই ভূপিন্দর সিং।

বসলো কমিশন। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ কে দোষী তাই খুঁজে বার করতে হবে। সাক্ষী সাবুদ হাজির হল ; পাতিয়ালার কোষাগার থেকে লাখলাখ টাকা অজানা পথে বেরিয়ে গেল। তারপরে বেরোল রায়। তা-ও তু'বছর পরে।

রূপতুমন সিংকে দোষী সাবস্ত ক'রে কমিশন শেষ পর্যন্ত তাদের রিপোর্ট পেশ করলো ভাইসরয়ের কাছে। ভাইসরয় নির্দেশ দিলেন রূপতুমন সিংকে—সিংহাসন ছেড়ে দাও। বড় ছেলেকে রাজা বানিয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যাও তুমি।

কর্নেল মিচিন ভাইসরয়ের নির্দেশ নিয়ে (সঙ্গে তাঁর এক ব্যাটা-লিয়ন সৈন্যও ছিল) হাজির হলেন রাজপ্রাসাদের সিংহতুয়ারে। মহারাজা অনুপায় দেখে রাজ্য ত্যাগের শমন নিজের হাতে সই করে দিলেন। মিচিন সাহেব একটি বন্ধ গাড়ীতে মহারাজাকে পুরে

সোজা পাঠিয়ে দিলেন আম্বালাতে। সেখান থেকে তাঁকে পাঠানো হোল দক্ষিণ ভারতের কোডাই কানালে। সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নারী নির্বাচনের ব্যাপারে রাজা-মহারাজারা দেশের বা জাতির কোন সীমানা মানতেন না। খুপসুরৎ তরুণী হলেই হোল। তাকেই সংগ্রহ করার জন্যে রাজকোষ লোপাট হয়ে যাক তাতেও আপত্তি ছিল না তাঁদের। এক একবার মহারাজা অথবা যুবরাজরা বিদেশ পরিভ্রমনে বেরোতেন ; সঙ্গে নিয়ে আসতেন নিত্য নতুন যুবতী।

ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন দেশীয় রাজাদের এই রীতিটাকে মোটেই পছন্দ করতেন না। ইংলিশ বা অ্যামেরিকান কোন মহিলাকে দেশীয় কোন রাজা বিয়ে করে আনলে তিনি বড় অপমানিত বোধ করতেন। সেই জন্যে তিনি নির্দেশ দিলেন তাঁর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন দেশীয় রাজা ভারতবর্ষের বাইরে যেতে পারবেন না। পাতিয়ালার মহারাজা ভূপিন্দর সিং একবার লেডী কার্জনকে শাড়ি পরিয়ে রাজকোষ থেকে দামি দামি অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়েছিলেন ; তারপরে তাঁর একটি ছবি তুলেছিলেন। এতে ক্ষেপে গিয়ে লর্ড কার্জন হুকুম দেন যতদিন রাজকার্যে তিনি সিমলাতে থাকবেন ততদিন বিশেষ বিশেষ মহারাজা [যাঁদের তিনি কামুক বলে জানতেন] সেখানে ঢুকতে পারবেন না। এতেও খ্যান্ত হলেন না তিনি। ফরমান জারি করলেন, বিদেশী মহিলা বিয়ে করার ফলে যদি তার কোন ছেলে হয় তাহলে সেই ছেলেকে মহারাজার উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করা হবে না।

রমণী-রমণ যজ্ঞ ছাড়াও রাজা-মহারাজাদের আরও অনেক 'হবি' ছিল। সেগুলির পিছনেও তাঁরা প্রচুর অর্থব্যয় করতেন।

সেই সব 'হবির' মধ্যে একটি হচ্ছে তাসখেলা।

পাতিয়ালার মহারাজা ভূপিন্দর সিং পোকার অর্থাৎ তেতাস খেলতে বড় ভালবাসতেন। সুরা আর নারীর মত পোকারের আকর্ষণও তাঁর কাছে দুর্নিবার ছিল। মহারাজার মতিবাগ প্রাসাদে মধ্যরাত্রির পরে সাধারণত এই খেলা বসতো। এই খেলাতে মহারানী আর কিছু প্রিয় মন্ত্রীদের মহারাজা নিমন্ত্রণ জানাতেন। এবং যেহেতু টাকা ছাড়া এই সব খেলা জমে না, সেই হেতু যথেষ্ট টাকা সঙ্গে আনারও নির্দেশ থাকতো তাঁদের ওপরে। কিন্তু মন্ত্রীরা চালাক মানুষ। মহারানীরা চতুর। নষ্ট হওয়ার ভয়ে কেউ তাঁরা বেশী টাকা আনতেন না; আনলেও, তা স্বীকার করতেন না। মহারাজার টাকা তাঁর সঙ্গে থাকে না: থাকে রাজকোষে। তিনি রাজকোষের প্রধান কর্মচারীকে টাকা নিয়ে তৈরি থাকতে বলতেন। উদ্দেশ্যটা এই যে মন্ত্রী বা মহারানীদের টাকার অভাবে মাঝপথে যে খেলা বন্ধ না হয়।

কোন খেলোয়াড়ের টাকা ফুরিয়ে গেলেই তাঁকে সহকারি তহবিল থেকে টাকা ধার দেওয়া হোত। দেওয়ার সময় তহবিল রক্ষক একটা চিরকুটে সই করিয়ে টাকা দিতো! কখনও-কখনও, এই ধার পাঁচ থেকে ছ' অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াতো। তবু, ধার নেওয়ার রীতি অনুযায়ী সরকারি তহবিল নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন খেলোয়াড় ধার চাইলে [তা সে যত টাকাই হোক] তাঁকে 'না' বলার উপায় থাকতো না। ফলে, অনেক সময়েই মন্ত্রী আর মহারানীরা অপ্রয়োজনেও প্রচুর টাকা ধার নিতেন। সরকারি তহবিল উজাড় না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতো; এবং, সব সময়েই দেখা যেতো, এক মহারাজা ছাড়া [মহারাজা সব সময়েই হারতেন] অন্য সকলেরই পকেট উপচে পড়ছে। তহবিলরক্ষক ধার শোধ করার জন্যে কাউকেই কোন তাগিদ দিত না; নিজের চেষ্টায় সরকারি ঋণ শোধ করারও তাগিদ

থাকতো না কারুর। সবাই জানতো ও ঋণ শোধ করতে হবে না কোনদিন।

ঝিন্দের মহারাজা কর্নেল হিজ হাইনেস মহারাজ স্যার বনবীর সিং রাজেন্দ্র বাহাদুরেরও এই তাস খেলার নেশা ছিল! তিনি ব্রিজ আর বিলিয়ার্ড খেলতে বড় ভালবাসতেন। সারাদিন ঘুমিয়ে অপরাহ্ণে প্রাতরাশ সেরে স্যাম্পেনের পর স্যাম্পেনের বোতল উড়িয়ে রাত্রি সাড়ে এগারটার সময়ে বসতেন ডিনারে। ঘণ্টা দুই তাঁর লাগতো ডিনার খেতে। তারপরে তিনি প্রিয় মন্ত্রী আর সম্মানিত অতিথিদের নিয়ে বসতেন খেলতে। ভোর চারটে বা সকাল পর্যন্ত চলতো খেলা। প্রতিটি রাত্রিতে এই একই ব্যাপার চলতো. আর প্রতিটি খেলায় মহারাজা কয়েক হাজার টাকা লোকসান দিতেন।

লোকে বলে ক্রিকেট খেলাটা হচ্ছে রাজার খেলা; বারোহাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির মত খেলার চেয়ে খেয়ালটাই এখানে বড়। ভারতবর্ষে এই খেলা প্রথম যুগে ভারতীয় রাজাদেরই একচেটিয়া ছিল। কাশ্মীর, পাতিয়ালা, কাপুরতলা, ভিজিয়ানাগ্রাম, কুচবিহার, এবং উত্তর-ভারতের ছোট বড় আরও অনেক রাজ্যের রাজা মহারাজারাই এই খেলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেদিন।

এঁদের মধ্যে কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপ সিং কেবল যে পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন তা-ই নয়, ক্রিকেট রনাঙ্গণে কদাপি তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেন না। দেখতে ছিলেন তিনি বেঁটেখাটো; অনেকটা বামনাবতারের মত। মাথার ওপরে বেখাপ্পা মাপের বিরাট কাশ্মীরি পাগড়ি; পরনে বেশ আঁটসাঁট ট্রাউজার; গায়ে লম্বা কোট। দু'কানে

বড় দুটি মুক্তোর মাকড়ি। এই বেশে মহারাজ ব্যাট হাতে যখন ক্রিজের সামনে এসে ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দাঁড়াতেন তখন তাঁকে অনেকটা সেকেলে বিদূষকের মত দেখাতো। নিজেকে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান বলে মনে করতেন; ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের 'রান' সংখ্যা হিসাবের তালিকাতেও মহারাজার নামের পাশে অনেক রানের সংখ্যা লেখা রয়েছে। যে ম্যাচে মহারাজ নামতেন সেই ম্যাচেই তাঁর রান সংখ্যা থাকতো সবার ওপরে।

কিন্তু তিনি এক নাগাড়ে অত রান করতেন কেমন করে? পৃথিবীর পয়লা নম্বরের ব্যাটসম্যানদেরও মাঝে মাঝে কিছু না করেও মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছে, অথচ মহারাজ প্রতাপ সিংহের বেলাতেই বা তার ব্যতিক্রম ঘটলো কেন?

এই কেন-র একমাত্র উত্তর প্রতিপক্ষ দলের রাজপ্রীতি, অথবা রাজার প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা। মহারাজা ব্যাট নিয়ে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা সব সাবধান হয়ে যেতো। বোলাররা খুব আস্তে আস্তে 'বল' করতো; সেই বলগুলি মনের আনন্দে নাচতে-নাচতে উইকেটটিকে অগ্রাহ্য করেই অন্য পথে বেরিয়ে যেতো। ভুল করে কোন বল যদি কখনও বেয়াড়াভাবে উইকেট লক্ষ্য করে ছুটে আসতো তখনই আম্পায়ার সেটিকে 'নো বল' ব'লে ঘোষণা করতো। মহারাজা প্রতাপ সিং কি রাজনীতি, কি ক্রিকেট ফিল্‌ড, কোথাও 'বোল্‌ড আউট' হন নি। সে-সাহসও কোন খেলোয়াড়ের ছিল না।

বল লক্ষ্য করে মহারাজা ব্যাট ঘোরাতেন। অনেক সময়েই বলগুলি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে মহারাজার ব্যাটের আওতা ছাড়িয়ে আত্মরক্ষা করতো। কিন্তু যেখানে তা সম্ভব হোত না সেখানে তাদের সীমানার দিকে ছুটতে হোত। সেই ছুটন্ত বলগুলিকে ধরার জন্যে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা একসঙ্গে তাদের পিছু নিত। বল ধরার দিকে তাদের আগ্রহ যতটা থাকতো তার চেয়ে বেশী দেখা যেতো

নিজেদের মধ্যে ধস্তাধস্তি করার। সেই সুযোগে বল বাউণ্ডারির বাইরে বেরিয়ে যেতো। এত করেও বল যদি বাউণ্ডারির কাছাকাছি না পৌঁছতো তখনই কোন খেলোয়াড় বল ধরার অছিলায় দৌড়ে গিয়ে জোরে 'কিক' করতো তাকে। সীমানার বাইরে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র চারপাশে হাত তালি পড়তো। চার রান হোল মহারাজার। কখনও কখনও বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা বলটি ধরে স্টাম্পে মারার উদ্দেশ্যে এইসা জোরে ছুঁড়তো যে উল্টো দিকে বাউণ্ডারি ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতো বল। এইভাবে মহারাজ প্রতাপ সিং দুর্দান্ত প্রতাপের সঙ্গে একটির পর একটি বাউণ্ডারি হাঁকিয়ে দর্শকদের করতালি নিয়ে বিপুল রান সংখ্যা স্কোর-বোর্ডে লিখিয়ে মাঠ থেকে বিদায় নিতেন। প্রেস ফটোগ্রাফাররা [মহারাজার সাকরেদরা তাদের পকেটেও অনেক টাকা পুরে দিত] ক্যামেরা বাগিয়ে ছুটে আসতো মহারাজার ছবি নেওয়ার জন্যে। টেণ্টে ঢোকার পথে বিশিষ্ট অতিথিরা দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাতো। মহারাজ হাসি মুখে মাথা নিচু করে বিজয়ী বীরের মত ধীরে পায়ে ভেতরে ঢুকে যেতেন। মহারাজার দলে সেকালের কিছু শ্রেষ্ঠ ভারতীয় খেলোয়াড় ছিলেন সত্যি কথা; কিন্তু তাঁর মাথা ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার ক্ষমতা কারুরই ছিল না। মহারাজার রান সংখ্যার চেয়ে বেশী রান করার দুঃসাহস হলে তাঁদের অবস্থা কী দাঁড়াতে পারে তা তাঁদের অজানা ছিল না।

একবার জার্ডিন সাহেবের অধিনায়কত্বে একটি ব্রিটিশ ক্রিকেট টিম এসেছিল ভারত সফরে। পাতিয়ালা একাদশের সঙ্গে তাদের খেলা শুরু হোল জিমখানা ক্লাবে। পাতিয়ালা একাদশের অধিনায়ক হলেন মহারাজা ভূপিন্দর সিং বাহাদুর।

ভারতীয় ক্রিকেটের তখন শৈশব অবস্থা। পাতিয়ালার মহারাজা অনেক খরচ পত্র করে দল তৈরি করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলার ফ্রাঙ্ক ট্যারেণ্ট ছিলেন তাঁর ক্রীড়া উপদেষ্টা। ইনি ছাড়া আরও কয়েকটি বিদেশী কোচ নিয়ে এসে এদেশের খেলোয়াড়দের

তালিম দিয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে মহারাজা তখন বেশ একটি প্রভাবশালী সদস্য।

পাতিয়ালা একাদশের সঙ্গে খেলা হবে জার্ডিন একাদশের।

দলকে শক্তিশালী করে তুলতে চেষ্টার কোন কমতি ছিল না মহারাজার; কিন্তু তাই বলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত শক্তিও তাঁর ছিল না। জার্ডিন সাহেবের শক্তিশালী ব্রিটিশ খেলোয়াড়দের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি একটা হেঁজি-পেঁজি ব্যাপার!

অথচ হারলে চলবে না। পাতিয়ালার মহারাজা স্বয়ং যে দলের অধিনায়ক সেই দল হারলে ভারতবর্ষের অসম্মান হবে। অত বড় কথা না হয় ছেড়েই দিলেম, কিন্তু রাজন্য সমাজ! যাঁদের এতদিন তিনি কোন পাত্তা দেন নি—সেই কাশ্মীরের মহারাজা, কাপুরতলার মহারাজা, কুচবিহারের মহারাজা. এবং অন্যান্য খেলোয়াড় রাজা-মহারাজারা জিমখানা ক্লাবে মহারাজা ভূপিন্দর সিং বাহাদুরের বাহাদুরি কতটা তাই দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে দিন গুনছিলেন। হারলে, যার সম্ভাবনা শতকরা একশ ভাগ, ভারতীয় রাজন্য মহলে একেবারে ছ্যা-পড়ে যাবে, বিলকুল পাঙচার্ড হয়ে যাবে তাঁর প্রেসটিজ।

কী হবে, কী হবে—মাথায় হাত দিয়ে বসলেন মহারাজা। যতই খেলার দিন এগিয়ে আসতে লাগলো ততই মহারাজার ধাত ছাড়ার অবস্থা হয়ে এল।

সুরু হোল পরিষদদের সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শ। তারপরেই চাঙ্গা হয়ে উঠলেন মহারাজা। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। সামান্য একটা শশক যদি মহাবলশালী মদোন্মত্ত সিংহকে লোপাট করতে পারে তাহলে পাতিয়ালা একাদশ কি জার্ডিন সাহেবের টিমকে হারাতে পারবে না! দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। প্রেমে আর রণে আপোষ নেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে।

ঢালোয়া হুকুম মহারাজার: টাকার পরোয়া নেই; কিন্তু পরিকল্পনা যেন নিখুঁৎ হয়। তা না হলেই গর্দ্দান যাবে।

নিখুঁৎভাবেই কাজ সুরু হোল। ক্রিকেট খেলার আগের দিন পরিভ্রমণকারী বিদেশী খেলোয়াড়দের আদর-আপ্যায়ন করার রীতি এদেশে তখনও বিশেষ চালু হয়নি। মহারাজা খেলার আগের দিন রাত্রিতে তাঁর প্রাসাদে বিরাট একটি ভোজের আয়োজন করলেন। তাতে ব্রিটিশ খেলোয়াড়রা নিমন্ত্রিত হলেন। আয়োজনে এতটুকু ত্রুটি ছিল না।

সেই ভোজের আসরে নিমন্ত্রিতদের প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদু খাবার আর দামি মদ পরিবেশন করা হোল। অর্দ্ধনগ্ন কিশোরীরা লাস্যে-হাস্যে খাবার পরিবেশন করলো। প্রতিটি খেলোয়াড়ের কাছে গিয়ে আপ্যায়ন জানালো। ভোজের পরে সুরু হলো নাচ। দেশী আর বিদেশী যুবতীরা ফিনফিনে পোষাক পরে সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে ব্রিটিশ খেলোয়াড়দের চারপাশ ঘুরে ঘুরে নাচলো। ব্রিটিশ খেলোয়াড়রা তাদের কোমর ধরে সুরু করলো বিলিতি নাচ। গরম হয়ে উঠলো আবহাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে উগ্র স্কচ, হুইস্কি, স্যাম্পেনের চাহিদা শুরু হোল। কিশোরীরা মদের বোতল বইতে-বইতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। খেলোয়াড়রা মদ খেতে-খেতে পড়ে গেল; দাঁড়িয়ে উঠে আবার বোতল নিল। নেশার ঝোঁকে কেউ বমি করলো; কেউ-কেউ উলঙ্গ নারীদের কোমর জড়িয়ে ধেই-ধেই করে নাচতে লাগলো; বিদেশে পরিত্যক্ত প্রেয়সীদের স্মরণ করে নর্তকীদের গালে চুমু খেল, বুকে জড়িয়ে ধরলো তাদের।

ভোরের সময় অনুষ্ঠান শেষ হোল। ব্রিটিশ খেলোয়াড়দের তখন মাথা ঝিমঝিম করছে, পা টলছে, চোখ উঠেছে গিয়ে কপালের ওপরে। তারপর ভারতীয় আতিথেয়তার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে মহারাজার দেহরক্ষীদের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে গাড়ীতে চেপে অতিথিশালায় ফিরে গিয়েছে তারা।

এদেশীয় খেলোয়াড়দের গোপনে বেশ কড়া নির্দেশ দেওয়া হোল, খবরদার। এক ফোঁটা মদ যেন পেটে না পড়ে। একটি নর্তকীদের দিকে চোখ ফিরিয়েছ কি গর্দ্দানটি ঘাড় থেকে নেমে যাবে। খেলা শেষ হওয়ার পরে তোমাদের জন্যে মালের ব্যবস্থা হবে।

সকাল দশটায় খেলা। মহারাজার চেলারা লক্ষ্য রাখতো ভোরের আগে যাতে পার্টি না ভাঙে। ফলে, বিশ্রাম নেওয়ার এতটুকু সুযোগ পেল না ব্রিটিশ খেলোয়াড়রা। নেশার ঝোঁক তখনও কাটে নি ; পা-টলা তখনও কমে নি ; মাথার অবস্থা তখনও তাদের বেশ খারাপ।

এই অবস্থায় মাঠে নামলো তারা। খেললোও সেইরকম। একটা বলকে দেখলো হুটো ; তিন উইকেটকে দেখলো ন'টা। বল মারার সময় হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল ব্যাট, হুমড়ি খেয়ে পড়লো ক্রিজের ওপরে। ফিলডিং করতে নেমে সে আর এক বিপর্যয়। বল ধরতে গিয়ে এ ওকে জড়িয়ে ধরে মাঠে গড়াগড়ি খায়।

যে-ক'দিন খেলা চলেছিল তাদের প্রতিটি রাত্রেই মহারাজা আপ্যায়নের ব্যবস্থা জোরদার করেছিলেন। নিত্য নতুন আনন্দ পরিবেশন, নিত্য নতুন উত্তেজনা ; পণ্ডিত ঝাকে ডেকে তিনি যজ্ঞ করেছিলেন কি না, করলেও বিশেষ অতিথি হিসাবে খেলোয়াড়দের সেখানে নিমন্ত্রন করেছিলেন কিনা সে সংবাদ অবশ্য আমাদের জানা নেই ; তবে এটুকু আমরা জানি যে সেবারের খেলায় জার্ডিনের দল পাতিয়ালা একাদশের কাছে হেরে গিয়েছিল।

ব্যস। হই-চই পড়ে গেল চারপাশে। ভারতীয় আর ব্রিটিশ সংবাদপত্রে মহারাজার ছবি ছাপিয়ে তাঁর বিজয় ঘোষনা করা হোল। রাজন্যবর্গের এতদিনের আশায় পড়লো ছাই। পাতিয়ালার বিজয়ে সারা ভারতে আলোড়ন জাগলো। শক্তিশালী ব্রিটিশ দলকে হারানো ভারতের স্বাধীনতা লাভ ছাড়া আর কী ? কেউ জানলো না মহারাজার এই সাফল্যের চাবিকাঠিটি কোথায় ?

বড় ছেলে যাদবেন্দ্র সিং একটি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার হোন ভূপিন্দর সিংহের এ আশা বহুদিনের ; সেই জন্যে লাখ-লাখ টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে নাম করা 'কোচ' এনেছিলেন তিনি। মহারাজকুমার তাঁদের তত্ত্বাবধানে তালিম নিয়েছিলেন অনেক ; কিন্তু প্রথম শ্রেণী দূরের কথা তৃতীয় শ্রেণীর ওপরে প্রমোশন পাওয়ার যোগ্যতা তাঁর হয়নি। তাতেও হতাশ হলেন না মহারাজা। তদ্বির তদারক করে ঠিক করলেন সেবছর ভারতীয় যে একাদশের ইংলণ্ড সফরে যাওয়ার কথা ছিল তাদেরই অধিনায়ক করে তিনি তাঁকে পাঠাবেন। কিন্তু ফিলডিং, বোলিং, অথবা ব্যাটিং—এদের একটাতে প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতা না থাকলে তাঁকে অত বড় একটা পদে বহাল করা যায় কেমন করে ? মহারাজকুমারের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর ফিলডিং অথবা বোলিং করা অসম্ভব। অত খাটুনি তাঁর ধাতে সইবে না। বাকি রইলো ব্যাটিং। ওই ব্যাটিং-এ কোন একটি প্রথম শ্রেণীর খেলাতে যদি শ'খানেকের কাছাকাছি রান তুলতে পারেন তাহলে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যায়।

সুযোগও মিলে গেল। বম্বের ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামে ব্রিটিশ দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের খেলা সুরু হোল। যাদবেন্দ্র সিং যথারীতি খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন। তাঁর শিক্ষক এবং মহারাজার অনুগ্রহ-ভাজন অষ্ট্রেলিয়ন বোলার ফ্রাঙ্ক ট্যারান্টের হাত দিয়ে গোপনে কয়েক লাখ টাকার উপঢৌকন চলে গেল। ঠিক হল, বিপক্ষ দলের বোলাররা বেশ কিছু "লুজ" বল আর হাফ-ভলি দেবে। তাহলেই যাদবেন্দ্র সিং কয়েকটি ছক্কা মারতে পারবেন। আর ফিলডসম্যানরা বিপুল উদ্যমে বলের পেছনে দৌড়িয়েও তাকে কায়দা করতে পারবেন না। তাহলেই মহারাজকুমার আগামী সফরে অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সুরু হোল। ছক্কার পর ছক্কা মেরে চললেন যাদবেন্দ্র সিং। বাপরে বাপ! এ যে একেবারে বাঘের

বাচ্চা! ক্রিকেটের এত বড় যাদুকরকে হঠাৎ ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামে আবিষ্কার করে অগণিত দর্শক বিপুল চিৎকার দিল। ভেঁপু, করতালি, কাঁসর ঘণ্টা ভুঁই-পটকা প্রভৃতি আনন্দের গর্জনে স্টেডিয়াম চৌচির হয়ে গেল। এই রত্ন এতদিন ছিল কোথায়?

কিন্তু তারপরেই কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে তাকাতে লাগলো দর্শকরা। পর-পর ছক্কার অঘটন ঘটার পরেই তারা আসল কারসাজিটা বুঝতে পারলো। এই তোমার বাহাদুরকা খেল্! খেলতে আসনি; এসেছ মস্করা করতে। টাকা পয়সা খরচ করে আমরা এসেছি তোমার দিললাকি দেখতে! ব্যাপারটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামের বিরাট পরিধি জুড়ে বিড়ালের স্বুরু হোল। অবস্থাটা বুঝতে পেরেই মহারাজা লোক পাঠিয়ে যাদবেন্দ্র সিংহকে জানিয়েদিলেন: বৎস, স্থিরোভাব। অত ছক্কা মের না। কোন ছুতো করে প্যাভিলিয়নে ফিরে এস।

ব্যাটিং সেরে ভারতীয় দলের সঙ্গে মাঠে নামলেন মহারাজ কুমার। কিন্তু দর্শকরা তখন তাঁর ওপরে ক্ষেপে ছিল। তিনি মাঠের যেদিকে যান সেই দিকেই স্বুরু হয় শেয়ালের ডাক, কুকুরের ডাক, স্বুরু হয় ব্যারাকিং। রাগের চোটে মহারাজকুমার কেবলই স্থান পরিবর্তন করেন। তারপরে, কৃতিত্ব দেখানোর জন্যে একটি উঁচু বল লুফতে গিয়ে মাঠের ওপর চিৎপাত হয়ে পড়ে যান। তাঁর মাটিতে পড়ে যাওয়ার চারুকলা লক্ষ্য করে ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়াম বিপুল আনন্দে গলা ছেড়ে কুকুরের ডাক ডাকতে স্বুরু করলো। মহারাজকুমার গোড়ালি ভেঙে পড়ে রইলেন, ট্রেচারে করে তাঁকে মাঠ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর থেকে ক্রিকেট খেলার মাঠে ব্যাট হাতে আর তাঁকে কেউ নামতে দেখে নি।

এবারে শিকারের গল্প শুনুন।

সব রাজা মহারাজাই শিকার করতে ভালবাসতেন। আমোদ-

প্রমোদ দেশ ভ্রমণের মত বছরের বেশীর ভাগ সময়ই তাঁরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। ঝিন্দের শাসনকর্তা মহারাজ স্যার রণবীর সিং বাহাদুর বছরে একশ তিরিশ দিনই মাঠে ঘাটে ঘুরতেন শিকারের সন্ধানে। চিতাবাঘ শিকার করতে তিনি খুব ভালবাসতেন; তাছাড়া তিতির, ময়ূর, শাসখোল, ঘুঘু মারার দিকে ঝোঁকও তাঁর কম ছিল না। পাতিয়ালা স্টেটের হিজ হাইনেস মহারাজ ভূপিন্দর সিং-ও এদিক থেকে কম যেতেন না। রাজ্য শাসন করার মত সময় তাঁর ছিল না। শিকার, পার্টি, বল, জন্মতিথি পালন—এই সব করতেই তাঁর অধিকাংশ সময় খরচ হয়ে যেতো। শিকারের আয়োজনে যখন তিনি বাইরে বেরোতেন তখন একটানা তিন চার সপ্তাহের মত নিশ্চিন্দি। নব, সাঙ্গুর, ফরিদকোর্ট প্রভৃতি সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির সহযোগিতায় বিরাট আয়তনে এই পক্ষী শিকারের উৎসব চলতো। বন্দুক ছোঁড়ার সঙ্গে শিকারীর শিক্ষিত কুকুরেরা সেই সব পাখি কুড়িয়ে আনতো। এই সব কুকুরগুলির শিকার কুড়িয়ে আনার দক্ষতার ওপরেই পুরস্কার বিতরণ করা হোত। সেই সঙ্গে চলতো অপর্যাপ্ত ভোজন, আর মদ্যপান। মহারাজা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। সঙ্গে থাকতেন প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী; রানী-মহারানী, হাতি 'ঘোড়া' লটবহর, আর প্রায় একশটি নর্তকী।

ভরতপুরের মহারাজা স্যার কিসেন সিং বাহাদুরের বার্ষিক রাজস্ব আদায় হোত সওয়া তিন কোটি টাকার মত। সেই টাকার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র স্টেটের জন্যে খরচ করতেন তিনি; বাকিটা খরচ হোত খানাপিনা, বিলাস-ব্যসন, মন্ত্রীদের আর চাকরবাকরদের মাইনে বাবদ।

ভাল-ভাল ঘোড়া কেনার বাতিক ছিল মহারাজার। সেই ঘোড়াগুলিকে সুন্দর দামি জিম দিয়ে সাজাতেন তিনি। তা ছাড়া ছিল তাঁর ঘোড়সওয়ারের দল। তাদের জমকালো পোষাকের জন্যেও

তাঁর খরচ কম হোত না। নিজের পোষাক তৈরী হোত ব্রিটিশ দরজীর ঘর থেকে। এর পিছনেও মহারাজা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতেন। মহারাজার ছ'টি রিক্সাওয়ালা ছিল। সিমলার বিখ্যাত দর্জি ফেলপস অ্যানড কোম্পানী তাদের জন্য যে পোষাক তৈরি করতো বছরে তারই জন্যে খরচ হোত পঞ্চাশ হাজার টাকা।

সবচেয়ে বাজিমাত করেছিলেন বোধ হয় রামপুর স্টেটের হিজ হাইনেস দি নবাব স্যার সৈয়দ হামিদ আলি খাঁ। ব্রিটিশ সরকার রোহিলা বংশের এই শেষ বংসবদটিকে বিরাট খেতাবে ভূষিত করেছিল। সেটি হচ্ছে আলি ঝা, ফরঝন্দ-ই-দিল পাজির-এ-দৌলত-ই-ইঙ্গলিসিয়া, মুখলিস-উড দৌলা, নাসির-উল-মুলক, আমির-উল-উর্মা, গ্র্যানড ক্রস অফ দি স্টার অফ ইণ্ডিয়া, গ্র্যানড ক্রস অফ দি ইণ্ডিয়ান এমপায়ার ইত্যাদি ইত্যাদি। চমৎকার খাসবাগ প্রাসাদে তিনি বাস [illegible]ন। এই প্রাসাদের একটি অংশ সম্মানিত অতিথিদের জন্যে পৃথক ক[illegible] রাখা [illegible]। মহারাজ বিদ্বান মানুষ ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবী, পারশিয়ান আর [illegible]র্দু ভাষায় দু'ঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত অনর্গল খিস্তি করতে পারতেন।

নবাব বলতে যা বোঝায় তিনি সত্যিকারের ছিলেন তাই। ভাল মদের কথা ছেড়েই দিলেম; তাঁর প্রাসাদে যে জল খাওয়া হোত সেই জল নিয়মিত ভাবে আসতো ফ্রান্সের বিখ্যাত একটি ঝরনা থেকে।

এছাড়া আরও একটি গুণ তাঁর ছিল; সেটি হচ্ছে আতিথেয়তার প্রাচুর্য। প্রতিদিন সকালে এবং রাত্রিতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় প্রতিটি অতিথিকে এক বোতল স্কচ হুইস্কি আর তাজা ফলের সঙ্গে এক টিন বেশ দামি সিগারেট উপহার দেওয়ার ঢালোয়া হুকুম ছিল তাঁর। ভি-আই-পিদের দেওয়া হোত স্যাম্পেনের বোতল, ভাল-ভাল স্কচ হুইস্কি, লখনৌ আর ফ্রান্স থেকে আনা বোতল বোতল সুগন্ধী আতর।

এই সব থেকেই বোঝা যায় কী বিপুল অর্থ নিজের পরিতৃপ্তির জন্যে খরচ করতে হোত তাঁকে। এর পরে রাজকোষ শূন্য হলে দোষ দেবেন কাকে?

তাহলে কি রাজারা রাজ্যশাসন করতেন না?

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। পারামাউন্টসির দৌলতে ভাইসরয় আর পলিটিক্যাল দপ্তরে খুঁটি বাঁধা থাকলেও, এই সব দেশীয় রাজারা স্বরাজ্যে প্রায় সম্রাটের মতই চলাফেরা করতেন। ভয়ঙ্কর রকমের কোন গোলযোগ দেখা না দিলে, অথবা, ব্রিটিশ বিদ্বেষী কোন কাজ না করলে ভাইসরয় বা পলিটিকাল দপ্তর কখনও রাজাদের গায়ে হাত দিতো না। এদিক থেকে রাজারা একেবারে নিরুপদ্রব ছিলেন না, আর ছিলেন না বলেই অনেকের সঙ্গে ভাইসরয়ের তিক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু মহারাজাকে সিংহাসন হারাতে হয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁরা দমেন নি। তবু উনিশ'শ সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের আগে রাজা মহারাজারা যেভাবে রাজ্যশাসন আর প্রজাপালন করতেন তার মোটামুটি একটা নিদর্শন আমি এখানে দিচ্ছি।

ঝিন্দের রাজা কর্ণেল হিজ হাইনেস স্যার রণবীর সিং রাজেন্দ্র বাহাদুরের সম্বন্ধে কিছু কথা আমি আগেই বলেছি। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে একশ তিরিশ দিন তিনি শিকারের ধান্ধায় ঘুরে বেড়াতেন। সে-সময়ে রাজকার্যের কথা কেউ তাঁকে বললে তার গর্দ্দান যেতো। বছরের বাকি কটা দিন তিনি বেলা চারটের সময় ঘুম ভেঙে আড়মোড়া দিতেন, বোতলের পর বোতল স্যাম্পেন খেতেন। সেই সময় প্রধান মন্ত্রী আর উচ্চপদস্থ রাজকর্মীরা রাজকার্য বিষয়ে তাঁর কিছু নির্দেশ নিতে আসতেন; মহারাজার মেজাজ ভাল থাকলে তাঁদের বক্তব্য শুনতেন; না থাকলে, মুখ ভেঙাতেন। রাজ-কর্মচারীরা ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে যেতেন। তারপরে ভাল করে স্নান করতেন মহারাজা; বেশ পরিবর্তন করে প্রাতরাশ খেতে

বসতেন। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজন মত দু-একটা কথা মহারাজাকে বলতেন। ফলে প্রধানমন্ত্রীই স্টেটের হর্তাকর্তা-বিধাতা হয়ে যেতো।

পাতিয়ালার মহারাজা ভূপিন্দর সিং-ও এদিক থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। সুযোগ্য কিছু মন্ত্রীদের ওপরে রাজ্যশাসনের ভার তুলে দিয়ে তিনি মহা আনন্দে শিকার আর আমোদ আহ্লাদে দিন কাটিয়ে দিতেন। শিকারের সময় তাঁর নির্দেশ ছিল কেউ যেন তাঁকে রাজকার্য নিয়ে বিরক্ত না করে। সেই সময়ে তাঁর আশেপাশে প্রধান মন্ত্রী ঘুরে বেড়াতেন ; আর সময় এবং সুযোগ বুঝে প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আলোচনা করতেন। রাজপ্রাসাদেও যখন তিনি থাকতেন তখনও আমোদ প্রমোদে তিনি এতটা টই-টম্বুর হয়ে থাকতেন যে রাজকার্য শিকের ওপরে তোলা থাকতো। সেই যে কথায় রয়েছে না 'চাষী গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর'—পাতিয়ালা স্টেটের রাজ্যশাসন ব্যাপারটাও সেই রকম লাঙল তুলে ধরার মত ছিল। কাজ করতো না কেউ। শীতকালে স্টেট সেক্রেটেরিয়েট বসতো সকাল দশটায়, গ্রীষ্মকালে সকাল আটটায়। মহারাজা প্রাসাদের বাইরে গেলে ছোট বাবুরাই শ্মশান জাগিয়ে বসে থাকতো। কাজে হাত দিতো না তারা ; গল্পগুজব করে বাড়ী যেতো। ফলে মন্ত্রী আর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের খাটতে হোত বেশী ; তাতেও বকেয়া কাজের স্তূপ পড়ে থাকতো। এরকম ফাইলের সংখ্যা একটা আধটা নয় হাজার হাজার। মাসের পর মাস তারা বাক্সবন্দী হয়ে চুপচাপ ঘুমাতো। মহারাজাই হচ্ছেন স্টেটের সর্বেসর্বা। তাঁদের নির্দেশের অভাবে শাসন কার্য প্রায় অচল হওয়ার উপক্রম করলো।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভাইসরয় একজন ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রীকে পাঠালেন স্টেটের অর্থ দপ্তরটিকে ঢেলে সাজানোর জন্যে। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে মহারাজাকে অনুরোধ জানালেন। মহারাজ হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন বলে মনে

হোল ; কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না। মহারাজার চালাকি বুঝতে পেরে ভাইসরয় স্যার ফ্রেডারিক গণটলেটকে পাতিয়ালা স্টেটের স্থায়ী অর্থমন্ত্রী করে পাঠালেন।

মহারাজা স্যার ফ্রেডারিকের সঙ্গে দেখা করতে অসম্মত হলেন। ভদ্রলোক মাসের পর মাস নিয়মিত অফিসে গেলেন ; কিন্তু মহারাজার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলেন না। প্রথম প্রথম রাগে তিনি ফোঁস ফোঁস করতেন। কিন্তু তাতেও কিছু হোল না। কয়েক মাস যাওয়ার পরে তিনি একগাদা ফাইল মহারাজার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মহারাজার সঙ্গে তিনি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে চান। আরও কয়েক মাস গেল। স্যার ফ্রেডারিক হাল ছেড়ে দিলেন। ইতিমধ্যে মহারাজা তাঁর কয়েকটি বিশ্বস্ত কর্মচারীদের ডেকে ফাইলগুলি পড়ে শোনাতে বললেন। শুনে শুনে সেগুলির ওপরে তিনি নির্দেশ দিলেন। তারপরে স্যার ফ্রেডারিককে ডেকে সেগুলি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। স্যার ফ্রেডারিকতো অবাক। তিনি খুসী হয়ে ভাইসরয়কে জানালেন এত বড় দক্ষ মহারাজ ভারতে নেই বললেই হয়।

কিন্তু সবাই পাতিয়ালার মহারাজ ছিলেন না। কাপুরতলার মহারাজা জগতজিত সিং-ও ছিলেন। রাজ্যশাসন করার চেয়ে য়েরোপে আমোদ করাই ছিল তাঁর নেশা। তদানিন্তন ভাইসরয় কার্জন সাহেব জানতেন এই সব রাজারা য়েরোপে যান সুন্দরী মহিলার খোঁজে। তাই তিনি নির্দেশ দিলেন কোন রাজা অথবা মহারাজা তাঁর লিখিত অনুমতি ছাড়া বিদেশ যেতে পারবেন না। মহারাজ জগতজিত সিং মহা ফাঁপরে পড়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করলেন ; ইয়োর একসেলেনসী, আমার কর্মচারীরা দক্ষ, অভিজ্ঞ, আমি এখানে না থাকলেও আমার স্টেটের কোন ক্ষতি হবে না।

কার্জন সাহেব চটে বললেনঃ আপনার অবর্তমানে আপনার

স্টেট যদি ভালভাবেই চলে তাহলে আপনার মহারাজা থেকে লাভ কী ?

"Then what is the use of your Highness remaining the Ruler of the state when the administration of the state can go on efficiently without you"

জগতজিত সিং জি না হয় প্রমোদ ভ্রমণে য়েরোপ যাচ্ছিলেন; কিন্তু কাপুরতলা স্টেটের আর একটি মহারাজা নীহাল সিং তো প্রাসাদেই বসেছিলেন। তিনিও তো কই রাজ্যশাসন করতেন না। রাজ্য শাসনের সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন প্রধান মন্ত্রী গুলাম গিলানির ওপরে। গিলানি সাহেবই ছিলেন প্রজাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাঁর রাজ্যশাসন করার প্রক্রিয়াটি একবার দেখলেই বুঝবেন ভদ্রলোক কী পরিমাণ দায়িত্বশীল ছিলেন।

গুলাম-গিলানির কাপুরতলা শহরের কাছাকাছি বিরাট একটি প্রাসাদে বাস করতেন। তিনি প্রাসাদের যে অংশে অধস্তন মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসতেন তার নাম ছিল দিওয়ান খানা।

এরই কাছে ছিল রাজকুমারী গোবিন্দ কাউর-এর প্রাসাদ। গোবিন্দ কাউর ছিলেন মহারাজ নীহাল সিংহের কন্যা। সৌন্দর্য আর দেহসুষমার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। যৌন লালসাটা তাঁর তেমনি ছিল উৎকট ব্যাধির মত। প্রধান মন্ত্রী গুলাম গিলানি গোবিন্দ কাউরের রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর হারেমে প্রচুর রমনী থাকা সত্ত্বেও গোবিন্দ কাউরকে কাছে পাওয়ার জন্যে তিনি সব কিছু বিসর্জন দিয়েছিলেন।

কিন্তু গোবিন্দ কাউরের প্রাসাদের প্রধান ফটকটিতে সব সময়ে সেপাইশাস্ত্রী থাকার ফলে তাঁর সঙ্গে সোজাসুজি দেখা করার সুযোগ তাঁর ছিল না। সেই জন্যে তিনি দিওয়ানই খানার পেছনে একটি গোপন সুড়ঙ্গ কাটিয়ে গোবিন্দ কাউরের প্রাসাদের মধ্যে সড়ক তৈরি

[Maharaja by Dewan Jarmani Dass—P. 223]

করিয়েছিলেন। এই সুড়ঙ্গের কথা গোলাম গিলানি আর গোবিন্দ কাউর ছাড়া আর কেউ জানতেন না। সেই সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে গোলাম গিলানি প্রায় প্রতি রাত্রিতে গোবিন্দ কাউরের শয়ন ঘরে উপস্থিত হতেন। এবং সেখানে সারা রাত্রি কাটিয়ে ভোরের দিকে ফিরে আসতেন। প্রয়োজন মত গোবিন্দ কাউরও সেই পথ ব্যবহার করতেন।

প্রধান মন্ত্রী যে ঘরটিতে মন্ত্রীদের বৈঠক ডাকতেন সেই ঘরের মধ্যিখানে মোটা কাপড়ের পার্টিশান থাকতো। প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশ ছিল যে ফাইল পড়ার সময় কেউ তার সংগে পর্দা তুলে কথা বলবেন না! মন্ত্রীদের কথা শুনে তিনি যে নির্দেশ দেবেন সেইটিকে তারা লিখে নেবেন। যেখানে প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে কোন উত্তর আসবে না, সেখানে বুঝতে হবে তিনি তাঁর অধস্তন মন্ত্রীর ইচ্ছাটিকে অনুমোদন করছেন না! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রধান মন্ত্রী হয়ত তখন পর্দার আড়ালেই নেই। হয় তিনি সুড়ঙ্গপথে গোবিন্দ কাউরের পালঙ্কে প্রেয়সীকে নিয়ে শুয়ে আছেন; নয়ত বা পর্দার আড়ালে গোবিন্দ কাউরকে কোলে বসিয়ে দুজনে মিলে পেয়ালার পর পেয়ালা মদ খেয়ে যাচ্ছেন। এই মদও যা-তা ছিল না। এমন জিনিস দিয়ে তৈরি হোত যাতে করে প্রতিটি কাপ মদের দাম পড়তো হাজার টাকা। এ সম্বন্ধে দেওয়ান জারমানি দাশ বলেছেন: The ministers sitting in the next room were ignorant, of what was happening in the Prime Ministers room. Both the Prime Minister and Gobind kaur drained one cup after another. The Ministers were under the illussion that their presiding genius was there alone attending carefully to the cases and reports submitted to him by them.

The Cabinet meeting would last several hours

during which period Ghulam Gilani was either at the palace of Gobind Kaur or playing with her a romantic game in the cabinet room. The Ministers would get disappointed to find that nearly all their recommendations were rejected by the Prime Minister.

ভরতপুরের শাসনকর্তা হিজ হাইনেশ মহারাজা কিশান সিং-এর বিচার করার পদ্ধতিটি সত্যিই অভিনব ছিল। তাঁর প্রাসাদে একটি বিরাট বৈঠকী ঘর ছিল। এখানে বড় বড় ভোজের আয়োজন হোত; সম্মানিত দেশী আর বিদেশী অতিথিদের জানানো হোত আদর আর আপ্যায়ন। মহারাজার নির্দেশ ছিল সমস্ত জরুরী সহকারী ফাইল-পত্র যেন প্রতি রবিবার তাঁর ওই বৈঠকী ঘরটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হত্যা, রাহাজানি, কোটি কোটি টাকার দেওয়ানি মামলা, অতি উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের অপসারণ আর নিয়োগ, অন্যান্য রাজ্য আর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কী নীতি অবলম্বন করা হবে—এক কথায় শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে কী করতে হবে, কী করা উচিৎ সে সম্বন্ধে মহারাজার সুস্পষ্ট লিখিত নির্দেশ নেওয়ার জন্যেই কাগজপত্রগুলি তাঁর কাছে পাঠানো হোত। মহারাজার হুকুম মত তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী সেগুলি বৈঠকী ঘরটির বিরাট টেবিলের ওপরে স্তূপাকার করে রেখে দিত। রাজকার্যের যাতে অসুবিধে না হয় সেইজন্যে মহারাজা পরের দিন সকালেই সেগুলি দস্তখত করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিতেন।

কিন্তু এত দুরূহ কাগজপত্র এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দেখতেন কেমন করে?

রবিবার রাত্রিতে ডিনার খাওয়ার কিছুক্ষণ আগে মহারাণী আর রক্ষিতাদের নিয়ে বৈঠকী ঘরে মহারাজা ঢুকতেন। মহারাজা ঢোকার পরেই শুরু হোত হই-হুল্লোড়, মদের পেয়ালার ঠুনঠুন শব্দ, গান-

[Maharja—P. 106]

বাজনা, প্রচুর ভোজন আর ব্যাভিচার! কয়েক ঘণ্টা এইভাবে চলার পরে আসর ভাঙতো; কিন্তু মহারাজার সরকারী কাগজপত্র দেখার গুরু দায়িত্ব তখনও বাকি থেকে যায়। সেই কাজে মনোনিবেশ করেন তিনি। এই কাজে তাঁর প্রিয় মহারানীরা তাঁকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসতেন। টেবিলের ওপারে যে অসংখ্য ফাইল থাকতো সেগুলিকে নিজেদের ইচ্ছেমত দুটি ভাগে ভাগ করতেন। তাদের একভাগ সরাসরি বাতিল হয়ে যেতো; আর একটি ভাগের ওপরে নির্দেশনামা লেখা হোত। ডাকা হোত তাঁর সেক্রেটারীকে। দ্বিতীয় ভাগের ফাইলগুলি একটি একটি করে প্রাইভেট সেক্রেটারী খুলে তাঁর নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করত। মহারাজা মুখে মুখে যে নির্দেশ দিতেন তাই সে লিখে তাঁর সই-এর জন্যে এগিয়ে দিত। মহারাজা সই করতেন, এবং তারিখ দিতে ভুলতেন না। কিন্তু কোন ফাইলই তিনি নিজেও একবার পড়তেন না বা প্রাইভেট সেক্রেটারী দিয়েও পড়াতেন না। সোমবার দিন সেই সব ফাইলগুলি যথারীতি বিভিন্ন দপ্তরে হাজির হোত। মন্ত্রীরা সেই সব ফাইল খুলে মাথায় হাত দিয়ে বসতেন। মহারাজার নির্দেশনামার দক্ষতা যে কত ভয়ঙ্কর তা ভুক্তভোগীরা হাড়ে মজ্জায় টের পেত। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দেওয়ান জার্মানি দাশ বলেছেন: This resulted in hundreds of innocent people being punished and the criminals let off. Similar was the case with revenue and civil cases of the government. People who were to get money from their debtors had to go empty handed and in other cases borrowers became creditors

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার মত এলেম ভরতপুরের মহারাজা কিশান সিং-এর মত কজন ছিল জানি নে; তবে

[Maharaja P. 143-144]

এই হঠকারীতার মাসুল তাঁকে কিছু দিনের মধ্যেই দিতে হয়েছিল। মহারাজার দক্ষ আর ন্যায় বিচারের ধাক্কা সামলাতে না পেরে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে সুরু করলো। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রিপোর্ট পাঠালেন ভাইসরয়ের কাছে। ভাইসরয় রাজ্য শাসন করার জন্যে একজন প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করলেন ; তাঁরই ওপরে রইলো সর্বময় ক্ষমতা। মহারাজা বাকি দিন কটা কাঠের পুতুল হয়ে রইলেন।

এবারে রামপুর স্টেটের নবাব হিজ হাইনেশ স্যার সৈয়দ মহম্মদ হামিদ আলি খাঁ বাহাদুরের রাজ্য শাসন প্রণালীটা দেখুন। মহারাজা বিদ্বান ছিলেন ; তিন চারটি ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন। আতিথেয়তায় তাঁকে টপকে যাওয়ার মত রাজা সে যুগে ভারতবর্ষে ছিলেন কিনা জানি। শাসনকার্য চালানোর জন্যেও তাঁর মন্ত্রনালয়ে দক্ষ কর্মকর্তারা ছিলেন। এবং তিনিও মন্ত্রীসভার কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন, এবং প্রয়োজন মত নির্দেশ দিতেন। কিন্তু অন্যান্য কাজে তাঁকে সারাদিনই এতই ব্যস্ত থাকতে হোত যে রাজকার্য পরিচালনা করার জন্যে তিনি সভাকক্ষে আসার সময় পেতেন না। তবে হ্যাঁ, সকালে আর সন্ধ্যের দিকে দুটি করে চারটি ঘণ্টা তিনি প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে রাজকার্য নিয়ে আলোচনা করতেন। ওই দুটি সময়ই মহারাজার অন্য কোন কাজ থাকতো না ; কারণ ওই সময়ে তিনি প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে গোসল-খানায় বসে থাকতেন। পার্টিশনের বাইরে থেকে প্রধান মন্ত্রী তাঁকে ফাইলগুলি পড়ে পড়ে শোনাতেন ; আর গোসলখানা থেকে মহারাজ সেগুলি শুনতেন।

মহারাজাদের রাজ্যশাসন করার রীতি আর নীতি নিয়ে আপনাদের আর বেশী ভারাক্রান্ত করতে আমি চাই নে। তাই আর একজনের কাহিনী বলেই আমি এখানে শেষ করছি। ইনি ছিলেন জাওরার নবাব লেঃ কর্ণেল হিজ হাইনেশ ফকর-উদ-দৌলা, স্যার

মহম্মদ ইফতিকার আলি খাঁ বাহাদুর সালাবত জঙ। নবাব বাহাদুরের বিরাট রাজসভা ছিল, প্রাচুর্য ছিল, মোটা মোটা মাইনে করা প্রধান মন্ত্রী, অধস্তন মন্ত্রী, পরিষদ, সেপাই শান্ত্রী, কোন কিছুরই অভাব ছিল না। হীরামুক্তা মাণিক্যের ছটায় ঝলমল করতো চারপাশ। কিন্তু জরুরী নীতি গ্রহণ করার সময় মন্ত্রী পরিষদের কারুরই পরামর্শ নিতেন না তিনি। তাঁর পরামর্শদাতা ছিল ছ'টি মধ্যবয়সী কদাকার চেহারার এবং ততোধিক নোংরা পোষাক পরা উন্মাদ। প্রয়োজনবোধে তাদের তিনি উন্মাদ-আগার থেকে ডেকে আনাতেন। তাদের সভার মধ্যে ঢুকতে দেখলেই নবাব সপরিষদ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াতেন। উন্মাদগুলি সভার ভেতরে ঢুকে মেঝের ওপরে বসে নির্বাকভাবে নানা অঙ্গভঙ্গি করতো। কেউ নাচতো, কেউ দাঁত খিঁচোত, কেউ আঙুল চুষতো, কেউ ঘুষি পাকাতো। তাদের সেই বাঙ্ময় নির্বাক অঙ্গভঙ্গি থেকেই নাকি নবাব বাহাদুর আসল সমস্যার উত্তর খুঁজে পেতেন, এবং সেইভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করতেন।

রাজাদের ইতিহাসে এ এক অভিনব ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু এই নতুন কিছু করার জন্যে নবাব বাহাদুর এতটা ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন কেন? তার একমাত্র কারণ তিনি তাঁর নীতিকে স্বার্থপর মন্ত্রীদের হাতে তুলে দিতে চান নি; এবং যেহেতু মানুষ মাত্রেই স্বার্থপর, সেই হেতু কোন সময়েই তারা অপরের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতে পারে না। সুতরাং উন্মাদরাই এদিক থেকে সব চেয়ে সাচ্চা।

The Nawab was convinced that these men from mad house would give their unbiased opinion, sincerely and faithfully.

এঁরাই ছিলেন ভারতীয় রাজন্যবর্গ। এঁদের মাথার ওপরে যে খাঁড়া ঝুলছে তা এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা গোঁসা করে

[Maharaja—P. 191]

বসেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ওপরে। কেবিনেট মিশনের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে কিছু একটা বাগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। সারা ভারত জুড়েই যখন দর কষাকষি সুরু হয়েছে তখন এঁরাই বা পেছনে পড়ে থাকবেন কেন ?

তাই ধড়াচূড়া পরে কেবিনেট মিশনের সামনে হাজির হয়েছিলেন এঁরা।

দোসরা এপ্রিল ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে দেখা করলেন উনিশ-কামান ভূপালের নবাব। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে যতটা সম্ভব সার্বভৌমত্ব না নিয়ে স্টেটগুলি ভারতীয় ফেডারেশনের মধ্যে থাকতে চায় না। ভারতের ব্রিটিশ সরকার তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন এটা তারা কেউ স্বীকার করে নেবে না। নয়া ফেডারেল শাসনতন্ত্রে কেন্দ্র দুর্বল হলে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজাদের আপত্তি নেই। তিনি আরও জানালেন যে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী স্টেট আর ভারতীয় রাজ্যে প্রিভি কাউনসিল গঠন করা হোক। তিনি আলোচনা করে জেনেছেন যে উনিশ-শ' পঁয়তিরিশ সালের ভারতীয় সংবিধানের সুপারিশ অনুসারে কোন রাজ্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে আসতে রাজী নন।

আর কী চান তিনি ?

চান সেই পুরনো অঙ্গীকার। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে নয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের হাতে কিছুতেই যেন প্যারামাউন্টসি তুলে দেওয়া না হয়।

বিকেলের দিকে আবার এলেন তিনি। সঙ্গে এলেন চেম্বার অফ প্রিনসেসের প্রতিনিধি—পাতিয়ালা, গোয়ালিয়ার আর নবনগর।

লর্ড পেথিক লরেন্স স্টেট আর ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে যে নিগূঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেগুলির মোটামুটি

আলোচনা করে বললেনঃ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'প্যারামাউন্টসি' শেষ হয়ে যাবে। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে ব্রিটিশ সরকার এদেশে কোন সৈন্য রাখতে পারবে না। তারই ফলে স্টেটগুলির সঙ্গে তার যে সব চুক্তি হয়েছে সেগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পালন করার দায়িত্ব নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। স্টেটগুলিকেও সেদিক থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

সে তো জানা কথা। কিন্তু তাই বলে ব্রিটিশ সরকার কি তাদের ভুলে যাবে?

প্রশ্নটা করা রাজাদের মধ্যে অস্বাভাবিক ছিল না; কারণ, বিগত নব্বুইটি বছর, ব্রিটিশ সরকারকে বাদ দিয়ে তাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এই সব সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় রাজাদের লক্ষ্য করে কে. এম. মুন্সী তাঁর 'দি এণ্ড অফ অ্যান এরা' গ্রন্থটিতে বলেছেন—

The Indian States, with their total subsevience, formed the main arch of the British Power in our Country.' সোজা কথায়, ভারতীয় রাজাদের হীনবশ্যতাই ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রধান স্তম্ভ ছিল। একটা পোষা বেড়াল মরে গেলে মানুষের কষ্ট হয়, আর প্রায় একশো বছরের স্মৃতিটা ব্রিটিশ সরকার ভুলে যাবে কেমন করে?

ভারত সচীব বললেন, না না; তা কেন? ব্রিটেনের অধিবাসীরা এদেশের স্টেটগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিশ্চয় বজায় চান; কিন্তু এরকম কোন সম্পর্ক আদৌ বজায় রাখা সম্ভব হবে না, হলে কতটা সম্ভব হবে, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে স্বাধীন ভারতে স্টেটগুলি ঠিক কী ভাবে থাকে তারই ওপরে।

অর্থাৎ, ওটা হল বৃহত্তর রাজনীতির কথা, তা নিয়ে এখনই মগজ মারার সময় আসে নি।

এবার ছোট ছোট স্টেটগুলির পালা। তাদের প্রতিনিধি হিসাবে এলেন ডুনগরপুর (Dungarpur) আর বিলাসপুরের রাজা-

মহারাজারা। এঁদের কথা হল অভিমানের। ব্রিটিশ সরকার বড় বড় স্টেটগুলি নিয়েই মসগুল হয়ে রইলেন। তাদের দিকে চোখ ফেরানোর পর্যন্ত সময়টুকু পেলেন না। সেই চেম্বার অফ প্রিনসেস তৈরি করার সময় থেকেই এক রকম দুই দুই ভাব দেখা গিয়েছে; আর দিন দিন সে-ভাবটা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে, নিজেদের জাতের ভেতরেও কল্কে পাচ্ছে না তারা।

ডুনগরপুরের মহারাজা বললেন: ভারতে বড় স্টেট বলতে পাঁচটি কি ছ'টি। ওরা সব রাঘব বোয়াল। ছোট ছোট স্টেটগুলির সন্দেহ হচ্ছে, ঐ বড় বড় জাঁদরেল স্টেটগুলি তাদের গ্রাস করার জন্যে উঁচিয়ে বসে রয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে এই সব ছোট আর মাঝারি ধরনের স্টেটগুলি যাতে কোন রকমে বিপদে না পড়ে তাঁরা তার গ্যারান্টি চান।

কী রকম গ্যারান্টি?

সার্বভৌমত্ব আর ভাষার ভিত্তিতে এই সব ছোট আর মাঝারি স্টেটগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার দিতে হবে। অর্থাৎ, আর একটি ফেডারেশন।

বিলাসপুরের রাজা আরও সরেস। তিনি আর এক কাঠি ওপরে উঠে গেলেন। বললেন, ওসব সঙ্ঘ-ফঙ্ঘ গঠনে আমার বিশ্বাস নেই।

তাহলে আপনি কী চান?

আমি চাই প্রতিটি স্টেট স্বাধীন ভাবে তার আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হবে। প্রয়োজন হলে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত নিজেকে রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধ করার ক্ষমতা পর্যন্ত তার থাকবে।

নিধিরাম সর্দার আর কাকে বলে! এই স্টেটের আয়তন কতটা জানেন? আয়তন হচ্ছে পাঁচ হাজার বর্গমাইল; লোকসংখ্যা হচ্ছে মেরে-কেটে এক লাখ। এই এলেমদার প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করে তাঁর সাম্রাজ্য রক্ষা করবেন।

নয়ই এপ্রিল এলেন ট্রাভাংকোরের প্রতিনিধি স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার। তিনি 'কুছ নেহী মাংতা'র মেজাজে সাফ কথা জানিয়ে দিলেন: ও-সব চুক্তি-ফুক্তির দাম নেই কিছু। তবে, প্যারামাউন্টসির কথা যদি বলেন তাহলে আমি বলব যে ওটি কখনই পরবর্তী ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না। অবশ্য অন্তর্বর্তীকালে প্যারামাণ্টসি রাখতে হবে; কিন্তু সে সময়েও পলিটিক্যাল দপ্তরটিকে স্টেটের সুবিধেমত ঢেলে সাজাতে হবে।

আর কিছু আপনার বক্তব্য রয়েছে?

হ্যাঁ, তা আছে বইকি।

যথা?

আয়ার সাহেব বললেন: ইচ্ছে করলে স্টেটগুলি থেকে নির্বাচিত একজন উপদেষ্টার সাহায্য ভাইসরয় নিতে পারেন। সেই সঙ্গে স্টেটগুলির সঙ্গে আলোচনা করে ভাইসরয় একটি উপদেষ্টা কমিটি বা অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল গঠন করতে পারবেন। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে সঙ্ঘবদ্ধ না হলে ভবিষ্যতে ছ'শ একটি ষ্টেটের চিহ্নটুকু পর্যন্ত থাকবে না। ছোট ছোট স্টেটগুলিকে বলে দিতে হবে, তারা যদি এই জোটের মধ্যে আসতে না চায় তাহলে ভবিষ্যতে তারাই বিপদে পড়বে।

সাড়া জেগেছে রাজাদের মধ্যে। কালবৈশাখীর আভাস তাদের অচলায়তনের ভিত ধরে নাড়া দিয়েছে। চারপাশে হৈ-চৈ, অনিশ্চয়তা আর ডামাডোল; বিসর্জনের বোল শুধু হয়েছে। সেই বাজনার সুর কেঁপে-কেঁপে একটা করুণ মূর্ছনার আর্তিতে তাঁদের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে অশরীরী আত্মার মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এলেন ছত্রীর নবাব, হায়দারাবাদের রাজপ্রতিনিধি। তাঁর সবই বড় বড় ব্যাপার। প্যারামাউন্টসি নিয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামাতে রাজী নন। তাঁর রাজ্য বিরাট, লোকবল বিরাট, ঐতিহ্য বিরাট। এক ভাইসরয় আর তাঁর পলিটিক্যাল দপ্তর ছাড়া, তিনি কাউকে কেয়ার করেন না।

তিনি বললেনঃ কোম্পানীর আমলে যে রাজ্যগুলি আমরা হারাতে বাধ্য হয়েছিলাম, সেইগুলি ঝটিতে আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক ; আর সেই সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যে আমাদের একটি বন্দরের প্রয়োজন রয়েছে। সেইটিও আমাদের চাই।

ওয়াভেল সাহেব করলেনঃ কোন বন্দরটা পেলে আপনাদের সুবিধে হয়।

ছত্রীর নবাব বললেনঃ গোয়া। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধের জন্যে ওটা আমাদের দরকার।

ক্রীপস সাহেব বললেনঃ বিষয়টি নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে পরে আলোচনা করা যেতে পারে। এখন বর্তমান বিষয়টা নিয়ে কী করা যায় তাই বলুন ?

ছত্রীর নবাব বললেনঃ ও-বিষয়ে আমাদের মত স্পষ্ট।

যথা ?

ভারতবর্ষ যদি হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানে ভাগ হয়ে যায়, তাহলে ভৌগলিক কারনে হায়দারাবাদ পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে না ; আর আদর্শের দিক থেকে হিন্দুস্তানের সঙ্গে তার যোগ দেওয়াটা বিবেচনা করেই হায়দারাবাদ স্বাধীন থাকতে চায়, অর্থাৎ, নবগঠিত দুই রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্যেই এর স্বাধীন থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

আর ভারতবর্ষ যদি দ্বিধাবিভক্ত না হয় ?

তাহলে অবশ্য নয়া ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হায়দারাবাদের আপত্তি নেই ; তবে, সেখানেও দুটি মোটা শর্ত রয়েছে।

কী কী শর্ত বলুন ?

প্রথমটি হল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দুটি দপ্তর থাকবেঃ বৈদেশিক, আর প্রতিরক্ষা। দ্বিতীয়টি হল, কেন্দ্রীয় সরকারে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে থেকে সমান সংখ্যক সদস্য থাকবে।

যদিও জনসংখ্যার দিক থেকে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য অনেক ?

হ্যাঁ তা সত্ত্বেও।

ছত্রীর নবাব শেষ কথা বলে চলে গেলেন।

কিন্তু এই কি শেষ? না; শেষ নয়। এলেন জয়পুরের স্যার মির্জা ইসমাইল। আলোচনার অধিকাংশ সময়ই তিনি কাটিয়ে দিলেন হিন্দুমুসলমান সমস্যা নিয়ে। হিন্দু মুসলমানদের ধর্মভিত্তিক বিরোধের কেমন করে অবসান হতে পারে তাই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তিনি মনোজ্ঞ বক্তিতা দিলেন।

তা স্টেটের সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী?

আমার অভিমত হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে স্টেটগুলির নির্বাচিত দুজন মন্ত্রী থাকবেন। একজন হিন্দু, আর একজন মুসলমান।

কিন্তু স্টেটের আসল সমস্যাটার আপনার বক্তব্য কী?

স্টেটের আসল সমস্যা হল রাজাদের কী করে বাঁচিয়ে রাখা যায়। তা ছাড়া আর কিছু নয়।

অর্থাৎ, রাজাদের যে-কোন উপায়ে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে?

স্যার মির্জা ইসমাইল বললেনঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়; আমার মতে ভারতের সংস্কৃতি আর সভ্যতার ঐতিহ্যে এই রাজাদের দান অসামান্য। এত সহজে ওঁদের আমরা ভুলতে পারি না। তা ছাড়া, আমার কাছে আগে স্টেট, তারপরে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ বা তার উত্তরাধিকারী।

আর কিছু?

মির্জা ইসমাইল শেষ করলেন তাঁর কথা: ভারতীয় সমস্যাগুলির সন্তোষজনক সমাধান হওয়ার আগে ব্রিটিশ সরকারের ভারত ছেড়ে যাওয়াটা উচিত হবে না।

স্টেটগুলির সঙ্গে আলোচনা করে সদস্যেরা বুঝলেন রাজাদের কেউ স্বাধীন ভারতের তাঁবেদার হয়ে থাকতে চান না। ব্রিটিশ সরকারকে যদি চলে যেতেই হয় তাহলে প্যারামাউন্টসি লোপ করেই যেতে হবে। জোর করে ওদের বিশেষ কোন জোটের মধ্যে ঢুকতে

বাধ্য করা হবে না। রাজারা যদি মনে করেন তাহলে একটা কনফেডারেশন করা যেতে পারে ; এবং ভারতের ব্রিটিশ সরকার, বা, তার উত্তরাধিকারী তাঁদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।

অনেক আলাপ-আলোচনার পরে, ষোলই মে লর্ড পেথিক লরেন্স আর স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস বেতার-ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে নানা কথার মধ্যে তাঁরা এইটুকু জানালেন যে 'প্যারামাউণ্টসি' কারও হাতে তুলে দেওয়া হবে না। ভারত স্বাধীনতা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে ওটা নাকচ হয়ে যাবে। স্টেটগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ-ভারতের (অর্থাৎ তার উত্তরাধিকারীর) কী সম্পর্ক দাঁড়াবে সেটা তারাই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নেবে।

অর্থাৎ, স্বাধীনতা দেওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্যারামাউণ্টসি আমাদের হাতে রইল। স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা লোপ পাবে। তারপরে কী হবে সেটা তোমরা বোঝাপড়া করে নিও। না পার তো গোল্লায় যেও। আমাদের তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

কিন্তু স্টেটের রাজারা এই ধরনের বোঝাপড়া করতে রাজী নন। কার সঙ্গে তাঁরা বোঝাপড়া করবেন ? ওই উঁচু নাকওয়ালা কংগ্রেসী আর মুসলীম লীগ নেতাদের সঙ্গে ? রাধামাধব ! একবার সুযোগ পেলেই ঘাড়টি মটকিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে রাজাদের।

ভোপালের নবাব রাজাদের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ জানালেন। দোসরা জুন, ওয়াভেল সাহেবকে তিনি একটি পত্রাঘাত করলেন। সেই পত্রে অভিযোগ ছিল অনেক। কিন্তু দুঃখ ছিল অনেক বেশী। এই কি একটা কথার মত কথা ? কিন্তু তবু তিনি বিশ্বাস করেন যে ব্রিটিশ সরকার ন্যায়ত আর ধর্মত এমন কোন কাজ করতে পারেন না যাতে স্টেটগুলিকে ভবিষ্যতে বিপদে পড়তে হয়।

The Nawab expressed the belief that it could never have been the desire of His Majesty's Government to leave the States as 'a sort of no man's

child', without any effort on the part of the Crown to protect their legitimate and reasonable demands and their established and accepted rights as sovereign bodies. *

অর্থাৎ রাজাদের সার্বভৌম শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কোন রকম চেষ্টা না করেই জারজ সন্তানের মত তাঁদের যে ব্রিটিশ সরকার পরিত্যাগ করে যাবেন না এইটাই তিনি আশা করেন।

নবাব এইখানেই থামলেন না। তিনি সেই চিঠিতেই ভাইসরয়ের কাছে আর্জি জানিয়ে বললেন: যে সব বন্ধুরা সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে চিরকালই আপনাদের বিশ্বাসভাজন হয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে এসেছেন, তাঁদের ক্ষতি হয়, এমন কোন কাজের অংশীদার, আমি আশা করি, নিশ্চয়ই আপনি হবেন না।

He concluded by appealing to the Viceroy not to be a party to such a deal in the case of friends who had been faithful to their word and their promises both in fair weather and foul.

সত্যিই বড় দুঃখের কথা। ভারত আর ব্রিটেনের রক্ষণশীল চাঁইরা এই সব রাজাদের দুঃখে একেবারে মর্মাহত হয়ে পড়লেন। তাঁরা বার-বার ঘাড় নেড়ে নিজেদের বোঝাতে লাগলেন, না, না, এ কেমন করে হয়? ব্রিটিশ রাজনীতির তল্পিবাহক এই সব শিশুদের অনাথ অবস্থায় কিছুতেই ওই সব বাঘের মুখে ছেড়ে দেওয়াটা উচিত হবে না। রক্ষণশীল দলের বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও রাজাদের জন্যে বেশ কিছুটা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। এক দিকে চুক্তিভঙ্গ, আর একদিকে অস্বস্তি। চুক্তি বজায় রাখতে গেলে স্টেটগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, আর বজায় না রাখলে বেআইনী কাজ

* **V. P. Menon : Integration of the Princely States—P. 68**

করা হবে। এদের নিয়ে সত্যিই বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছিল ব্রিটিশ সরকার।

রাজা ষষ্ঠ জর্জের মনের কোণে হয়তো এই ধরনের একটা আশঙ্কা ছিল। সেই জন্যেই বোধ হয় তিনি ওদের দিকে একটু দৃষ্টি রাখার জন্যেই মাউন্টব্যাটেনকে অনুরোধ করেছিলেন।

কিন্তু তিনি ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন? তিনি কি চেয়েছিলেন দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন ভারতের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাক, অথবা, ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের সঙ্গে একটা ফেডারেল সম্পর্ক স্থাপন করুক?

তিনি যাই ভেবে থাকুন, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মনে এদিক থেকে কোন রকম সন্দেহ ছিল না। তাঁর মতে যেন-তেন প্রকারেণ দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বাধীন-ভারতের মধ্যে ঢুকিয়ে নাও—এই ছিল রাজার বক্তব্যের মূল কথা। রাজা ষষ্ঠ জর্জ, অথবা, তাঁর ডাইহার্ড কনসারভেটিভ লর্ড আর ধনকুবেরদের মত দেশীয় রাজাদের ওপরে লর্ড মাউন্টব্যাটনের কোন রকম দরদ ছিল না। তাঁর মতে দেশীয় রাজারা হচ্ছে: semi-enlightened autocrats at their best and squalid degenerates at their worst. He called then a bunch of nitwits for not democratizing their administrations when they saw the power of Congress rising and not for joining the Indian Federation when they had the opportunity in 1935 *

অর্থাৎ, সব চেয়ে আদর্শ রাজা কারা? যারা অর্ধসভ্য আর স্বৈরাচারী। আর সব চেয়ে খারাপ রাজারা হল তারা যারা হীনচরিত্র আর লম্পট। তাঁর মতে সবাই নির্বোধ। কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে জেনেও এরা নিজেদের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করে নি;

* Mosley: The Last Days of British Raj.

আর উনিশশো পঁয়তিরিশ সালে সুযোগ পেয়েও এরা ফেডারেশনে যোগ দেয় নি।

এদের জন্যে ভাবনা-চিন্তা করে বাজে সময় নষ্ট করে লাভ কী? ভাবনা-চিন্তা কি কম ছিল মাউন্টব্যাটেনের? সামনে সমস্যার পাহাড় জমে ছিল তাঁর।

কংগ্রেস আর মুসলীম লীগকে নিয়েই তাঁকে অনেক কালঘাম ঝরাতে হবে। তারই জন্যে শক্তিসঞ্চয় করা চাই। তিনি বেশ জানতেন রুই-কাতলাদের গাঁথতে পারলেই, অর্থাৎ, হিন্দু আর মুসলমানদের সমস্যাটা মিটাতে পারলেই, রাজাদের ছেঁকে আনতে বেশী সময় তাঁর যাবে না।

হলও তাই। স্বাধীনতার দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা যতই বাড়তে লাগল, রাজারা ততই ঘাবড়িয়ে যেতে লাগলেন। প্রথমের দিকে ভোপালের নবাবের জঙ্গী আস্ফালনে রাজারা কিছুটা সাহস পেয়েছিলেন বটে; কিন্তু যে-মুহূর্তে বোঝা গেল, কংগ্রেস আর মুসলীম লীগ স্বাধীনতার বিলের খসড়াটি মোটামুটিভাবে অনুমোদন করেছে সেই মুহূর্ত থেকে রাজাদের সমস্ত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। চেম্বার অফ প্রিনসেস-এর চ্যানসেলর হিসেবে ভোপালের নবাবকে সকলের আগেই স্বাধীনতার বিলের খসড়াটি দেখানো হয়েছিল। দেখানো হয়েছিল এই শর্তে যে এটি তিনি বাইরে প্রকাশ করবেন না। বিলের খসড়া পড়েই তিনি বুঝতে পারলেন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দুটি প্রধান ডোমিনিয়নে ভাগ করা হয়েছে। একটি হল হিন্দুস্থান, আর একটি হল পাকিস্তান। এই দেখেই তিনি মাউন্টব্যাটেনকে সরাসরি জিজ্ঞেসা করলেন, সেই সাদৃশ্যে বিভিন্ন দেশীয় রাজাগুলিকেও পৃথক-পৃথক ভাবে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হবে কি, না?

মাউন্টব্যাটেনও সোজাসুজি জবাব দিলেন : ব্রিটিশ সরকারের তেমন কোন বাসনা নেই। থাকলেও, আমি তা জানি নে।

কিন্তু এই যে খসড়াটিতে লেখা রয়েছে, অপর পক্ষে যদি কোন স্টেট কোন ডোমিনিয়নের সঙ্গে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে না চায়, তাহলে তার সঙ্গে পৃথক চুক্তি করতে আমরা বাধ্য হব, এর অর্থটা কী ?

মাউন্টব্যাটেন সাহেব বললেন : ওটা কথার কথা। লিখতে হয় তাই লেখা হয়েছে। ও নিয়ে আমি ব্যস্তও নই, আলোচনা করতেও রাজী নই।

তাহলে, আমরা স্বাধীন হতে পারব না ?

না। স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করলে শুধু আপনারাই বিপদে পড়বেন না, সারা ভারত বিপর্যস্ত হয়ে উঠবে। আমাকে দিয়ে ওরকম কোন কাজ করানো সম্ভব হবে না।

সাফ কথা। এত পরিষ্কার করে আর কোন ব্রিটিশ রাজপুরুষ রাজাদের একথা বলেন নি। সবাই ইতি-উতি, আচ্ছা-হবে বলে প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছেন, অথবা, রাজাদের পিঠ চুলকে দিয়েছেন।

তিড়বিড়িয়ে উঠলেন ভোপালের নবাব। মাউন্টব্যাটেনের মুখের উপরেই গুচ্ছের কড়া-কড়া কথা বললেন। ব্রিটিশরা বিশ্বাস-ঘাতক, রাজাদের তারা এতদিন আশা দিয়ে শেষ মুহূর্তে ডুবিয়ে দিচ্ছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেইখানেই থামলেন না তিনি। ওই ঘটনার দিন তিনেক পরে চ্যানসেলরের পদে ইস্তফা দিয়ে বীরদর্পে নবাব ঘোষণা করলেন : ব্রিটিশ সরকার যেদিন ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে সেইদিন থেকে তিনি স্বাধীন। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্র মেদিনী। কংগ্রেসকে আমি ঘৃণা করি। ওর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

ভোপালের নবাবের এত বড় ঘোষণার পরেও, রাজা-মহারাজাদের মধ্যে বিশেষ কোন উৎসাহের সঞ্চার দেখা গেল না। দেখা যে গেল

না তার প্রমাণ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসের ডাকে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্‌বলীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন এখন আর জোটের কথা নয়, হম্বিতম্বি করার সময় নয়, ঘর বাঁচানোর কথা। পিতৃপুরুষের নাম-ডাক যত বড়ই থাক, নিজে না বাঁচলে সমস্ত হাঁক-ডাকই বরবাদ হয়ে যাবে। তাছাড়া, শাস্ত্রেই তো রয়েছে, সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। সেই সর্বনাশ যখন সিংহ-দুয়ারে দাঁড়িয়ে ডঙ্কা বাজাচ্ছে তখন কিছুটা শঙ্কা নিয়েও তার সঙ্গে একটা আপোষ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

অনেকে সেই কাজই করলেন।

কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্‌বলীতে বরোদা পাঠাল তিন জন সদস্য। তাঁদের সকলকেই বরোদার আইনসভার সভ্যরা নির্বাচিত করলেন। কিছুটা গড়িমিশি আর আলাপ-আলোচনার পরে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের আঠাশে এপ্রিল কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্‌বলীতে যোগ দিল কোচিন, উদয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, রেওয়া, আর পাতিয়ালা। জুলাই মাসের মধ্যে এগিয়ে এল আরও সাঁইতিরিশটি স্টেট। তাদের মধ্যে ছিল মহীশূর আর গোয়ালিয়র।

কিন্তু ওই ক'টি রাজ্য ছাড়া ভারতবর্ষে তখন আরও অনেক রাজ্য ছিল। তাদের সংখ্যাও বড় কম নয়। মোটামুটি একটা হিসাব করলে দেখা যায় যে উনিশ শো পঁয়তিরিশ সালে সারা ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির সংখ্যা ছিল পাঁচশো বাষট্টির মত। তাদের ভেতরে আঠারোটি ছিল ভি-আই-পি শ্রেণীর। এই সব রাজ্যগুলির রাজা-মহারাজাদের সম্মান দেখানোর জন্যে তোপধ্বনি করা হ'ত। আঠারোশো একষট্টি সালে ভারতের সাম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার এই তোপধ্বনির রীতিটি প্রবর্তন করেন। রাজাদের পদমর্যাদার ইতরবিশেষ অনুসারে এই তোপধ্বনি সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। সেই সংখ্যা একুশ থেকে নেমে ন'য়ে এসে থামত। যে-সব মহারাজাদের জন্যে একুশবার তোপধ্বনি করা হ'ত তাঁদের মধ্যে

ছিলেন হায়দারাবাদের নিজাম, মহীশূর, বরোদা, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর এবং গোয়ালিয়রের মহারাজা। ইন্দোর, জয়পুর, আর উদয়পুরের মহারাজাদের জন্যে বরাদ্দ ছিল উনিশটি কামান। সতেরটি কামান দাগা হত যোধপুর, ভরতপুর, বিকানীর, কোটা, টঙ্ক, বুন্দি, কারৌলি আর পাতিয়ালার মহারাজাদের জন্যে। আলওয়ার, দাতিয়া, কাপুরতলা আর নব-র মহারাজাদের জন্যে পনেরো বার কামান দাগা হত, জোয়ার মহারাজার জন্যে তেরো বার। যে-সব রাজ্যের রাজাদের জন্যে সম্মান দেখানোর প্রথা ছিল তাদের মধ্যে যেমন ছিল হায়দারাবাদের মত বিরাট রাজ্য যার পরিমাণ হচ্ছে বিরাশী হাজার ছশো উনপঞ্চাশ বর্গমাইল, তেমনি ছিল সাঁচি, যার আয়তন ছিল সাকুল্যে উনপঞ্চাশ বর্গ মাইলের মত।

এই তোপধ্বনি যাদের কপালে জুটত না তাদের সংখ্যা ছিল চারশো একচল্লিশের কাছাকাছি। এদের মধ্যে দু'শো একতিরিশটি ছিল বম্বেতে, একশো উননব্বুইটি ছিল উত্তর গুজরাট আর সৌরাষ্ট্রে (আগে এদেরই বলা হ'ত কাথিয়াড), আর একশো একুশটি ছিল মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, আর উড়িষ্যায় ছড়িয়ে।

এরা রোহিত-কাবলুস না হলেও, মৎস্যশ্রেণীর; কিন্তু মৎস্যপদবাচ্য নয় এমন কুচো চিংড়িরও অভাব ছিল না এদেশে। এদের অবশ্য 'স্টেট' বলা হত না; বলা হত এস্‌টেট। সারা ভারতে ব্যাঙের ছাতির মত এদের সংখ্যা যে কত, আর আয়তনই বা ক'ছটাক সে সব হিসাব করতে গেলে আরব্য উপন্যাসের মত সহস্র রজনী পার হয়ে যাবে। এক পশ্চিম ভারতেই এদের সংখ্যা ছিল সাত হাজার সাতশো আটানব্বুই-এর কাছাকাছি। বারো হাত কাঁকুড়ের বারোশো হাত বিচির মত এই সব এসটেটগুলির শাসনকর্তাদের উপাধি ছিল রাজা-মহারাজা। কারও কারও বাৎসরিক আয় ছিল পনেরো টাকা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার চেয়েও কম।

এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাবে যাঁরা কনস্টিটিউয়েণ্ট

অ্যাসেম্‌বলীতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের চেয়ে যাঁরা যোগ দেন নি তাঁদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশী।

এই সময়টা এঁরা করছিলেন কী? ভোপালের নবাবের এলেম কতটা তা-ই বসে-বসে দেখছিলেন আর ভাবছিলেন। হালে পানি না পেলেও তখনও পর্যন্ত এঁরা হাল ছাড়েন নি। প্যারামাউণ্টসি লোপ পাওয়ার আগে কার কাছ থেকে কতটা আদায় করে নেওয়া যায় তারই একটা হিসাব-নিকাশ করছিলেন হয়তো। কিন্তু ভোপালের নবাবের মত মুখ খোলেন নি এঁরা। কারণ, এঁরা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে কড়া কড়া কথা ব'লে, জঙ্গী মনোভাব দেখিয়ে কোন লাভ নেই। চোখ রাঙানোর দিন শেষ হয়ে এসেছে। এখন মগজ খাটিয়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচানো যায় কিনা সেইটাই ভেবে দেখা দরকার।

কিন্তু দেখবে কে? আর দেখবেই বা কী?

অন্ধের যষ্টির মত হাত বাড়িয়ে দিলেন ব্রিটিশ দোস্তরা। ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং শাসকগোষ্ঠির বেশ মোটা একটি অংশের 'এই সব গতকালের রাজত্বগুলি'র ('Kingdoms of Yesterday') প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। রাজাদের পুরানো গৌরব, হাতি-ঘোড়া, আর মণি-মুক্তার চটক এঁদের মনেও বিরাট সহানুভূতির সৃষ্টি করেছিল, মোহগ্রস্ত করেছিল এঁদের, সবার ওপরে রাজাদের কংগ্রেস বিরোধিতা এঁদের মনে আশার সঞ্চার করেছিল।

তার প্রমাণ উনিশশো পঁয়তিরিশ সালের 'ফেডারেল কনস্টিটিউশন'। এইখানেই বোধ হয় অকর্মণ্যগুলির প্রয়োজনীয়তার কথা ['worth of the worthless'] ব্রিটিশ সরকার বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। এর সংবিধানের উচ্চ আর নিম্নকক্ষে রাজাদের জন্যে মোট সদস্য সংখ্যার যথাক্রমে পাঁচ ভাগের দু'ভাগ আর তিন ভাগের একভাগ আসন সংরক্ষিত ছিল। ব্রিটিশ-ভারতে প্রদেশগুলির মত ফেডারেশনে যোগ দেওয়াটা দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে

স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। অর্থাৎ তাদের যোগ দেওয়ার ব্যাপারটি কতকগুলি শর্তের ওপরে নির্ভরশীল ছিল···the accession to the Federation was not to be automatic, as in the case of the provinces, but had to be governed by the Instrument of Accession, signed by the rulers, and allowing them to make reservation in their favour. *

এ ছাড়া রাজাদের ওপরেও একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা আইনসভাকে এই সংবিধানে দেওয়া হয় নি। রাজা আর তাঁদের রাজ্যের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি জরুরী ব্যাপারে হাত দেওয়ার ব্যাপারে আইনসভার কোন এক্তিয়ার ছিল না।

কিন্তু কেন? কীসের জন্যে দেশীয় রাজাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার এত আয়োজন? সংবিধান নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনার সময়ে লর্ড রিডিং সেকথা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন।

'If the Princes came into the Federation of all India···there will always be a steadying influence. What is it we have most to fear? These are those who agitate for independence, for the right to secede the Empire altogether. I believe myself it is an insignificant minority and it has behind it the organisation of the Congress. It becomes, therefore, important that we should get, what steadying influence we can against this veiw.' *

ব্রিটিশ সরকারের হৃদয়কন্দরে যে আশা সযত্নে লুকানো ছিল, লর্ড রিডিং তাকেই প্রকাশ্যে বার করে দিলেন। ব্রিটিশ সরকারের আসল শত্রু কারা? যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতবর্ষকে ছিনিয়ে নিয়ে

* Maharaja : by Diwan Jarmani Das. P. 338-339.

যেতে চায়। তাদের সংখ্যা নগণ্য। সেই সব লোকদের পেছন থেকে মদৎ যোগাচ্ছে কংগ্রেস। এই কংগ্রেসকে টাইট দেওয়ার জন্যে আইনসভায় একটি প্রভাবশালী বিরুদ্ধ দল গঠন করতে হবে। সেই দলটি কাদের তা বুঝে নিতে কারুরই দেরি হওয়ার কথা নয়। রিডিং সাহেবের মতে এই দলটির সহযোগিতা থাকলে তিনি আর কাউকেই তোয়াক্কা করেন না; এমন কি কংগ্রেসও যদি ফেডারেল লেজি-সলেচারে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় নির্বাচিত হয়, তা হলেও না।

ভারতবাসীদের সম্বন্ধে লর্ড রিডিং-এর অভিজ্ঞতা কতটা ছিল জানি নে; তবে এটা বুঝতে আমাদের এতটুকু অসুবিধে হয় না যে তাঁর বক্তব্যটা ছিল তখনকার দিনের ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রেরই বক্তব্য। অন্যথায় উনিশশো পঁয়তিরিশ সালে পার্লামেন্টের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে এত বড় কথা বলার সাহস তাঁর হ'ত না।

এই সাহসের পেছনে যুক্তিও কিছুটা অবশ্য ছিল; কারণ, তখনও পর্যন্ত কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যগুলির ওপরে বিশেষ কোন সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করে নি। হরিপুরা অধিবেশনেই তার নীতি ঘোষিত হল:

'Purna Swaraja means the whole of India, inclusive of States. For, the integrity and unity of India must be maintained in freedom as it had been maintained in subjection.'

অর্থাৎ, পূর্ণ স্বরাজের অর্থ ই হচ্ছে সারা ভারতের স্বরাজ। দেশীয় রাজ্যগুলি বৃহত্তর ভারতেরই অংশ। পরাধীনতার মত স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও, সারা ভারতকে এক এবং অবিভাজ্য বলে গ্রহণ করা হবে। এইটিই হল কংগ্রেসের মূল নীতি।

দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজা-সম্মেলন বসল লুধিয়ানাতে। এই সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলালকে চেয়ারম্যান করা হল। এখানে যে ক'টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে মূল প্রস্তাবটি ছিল দেশীয় রাজ্যগুলিতে সংগ্রাম পরিচালনার ভবিষ্যৎ নিয়ে। এখানেই

ঠিক করা হল, সংগ্রাম অতঃপর আর বিচ্ছিন্নভাবে চলবে না ; চলবে একটি সুসংহত পরিকল্পনার মাধ্যমে ; আর সেই সংগ্রাম চলবে কংগ্রেসের নির্দেশে।

'The time has come when this struggle should be co-ordinated with the wider struggle of Indian indepedence of which it is an integral part. Such an integrated all-India struggle must necessarily be carried on under the guidance of the Congress.'

কংগ্রেস বুঝতে পেরেছিল দেশীয় রাজ্যগুলিকে আর বেশী দিন পৃথক করে রাখা যাবে না। সেখানকার মানুষগুলো এক বর্বর যুগের পাষাণ গুহায় দিন কাটাচ্ছে। এদের কথা বলতে গিয়ে জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন—এদের কথা ভাবতে গেলেই রাজাদের অত্যাচারের কথা মনে পড়ে। সেই অত্যাচার শ্বাসরোধ-কারী। বাইরে থেকে মনে হবে সব শান্ত; গড্ডালিকা প্রবাহে জনসাধারণের জীবনযাত্রা বাঁধা ছকে চলেছে ; কিন্তু তারই তলায় জলের স্রোত বন্ধ ; চারপাশে পচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকেরই জীবনযাত্রা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই সঙ্কুচিত ; সেই সীমার বাইরে বেরোনার কোন পথ নেই তার। দেহ আর মনের দিক থেকে সে-সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাজপ্রাসাদের চমক আর উচ্ছলতার সঙ্গে তুলনা করলেই এই সব কোটি-কোটি জনসাধারণের দুঃস্থ জীবনযাত্রার মান কোথায় গিয়ে নেমেছে, তা যে-কোন মানুষের চোখেই ধরা পড়বে। করদাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের কত বিরাট অংশই না রাজাদের ব্যক্তিগত বিলাস-ব্যসনে খরচ হয় ; তার নামমাত্র অংশ যায় জনসাধারণের ব্যবহারে।

কর-বণ্টনের হিসাব করতে গিয়ে কোন একটি লেখক বলেছেন—

"The king of England receives roughly one in every 16,000 of the total revenue ; the king of Belgium one in 1,000 ; the

king of Italy one in 500 ; the king of Denmark one in 300 ; the Emperor of Japan one in 100···No king receives one in 17, like the Maharani of Travancore (which is the most progressive State of India), one in 13 as the Nizam of Hyderabad, or the Maharaja of Boroda, or one in 5 as the Maharaja of Kashmir and Bikaner. The world would be scandalised to know that not a few princes appropriate one in 3 and one in 2 of the revenue of the State."

এ তো গেল করের ব্যাপার। কর ছাড়াও তাঁদের আয় কি কম ছিল? শুল্ক বলুন, খনিজ সম্পদ বলুন, ডাক-তার আর রেলবিভাগ চালু করার সুবিধা দেওয়ার জন্যে মোটা টাকার মুনাফা বলুন—এই বিরাট ঐশ্বর্যের একমাত্র মালিকানা ছিল রাজাদের।

তারপরে সম্ভ্রম আর প্রতিপত্তির কথাই ধরুন। সেও কি কম? প্রজারা তাঁদের দেবতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করত কিনা জানি নে, তবে অসুরের মত ভয় করত। তাঁদের আদেশ অবনতমস্তকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিত। তারা ভালভাবেই জানত, দ্বিধা করলেই তাদের দেহ সরাসরি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যাবে। রাজারাই হচ্ছেন একচ্ছত্র অধিপতি ; নামে নয়, কাজে। প্রজাদের সর্বময় কর্তা। তাঁদের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলত না। নিজেদের রাজ্যের কথা ছেড়েই দিলাম, এমন কি ব্রিটিশ-ভারত বা বিদেশেও যাতে তাঁদের কোন রকম-বিরুদ্ধ আলোচনা না চলে সে-জন্যে বিশেষ কতকগুলি আইন তৈরী করা হয়েছিল। যে-ভাবে ইচ্ছে তাঁরা প্রজাদের শোষণ করতে পারতেন। তার জন্যে কাউকেই কোন কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত না তাঁদের। একাধারে তাঁরাই ছিলেন প্রজাদের রক্ষক এবং ভক্ষক।

সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রেও তাঁরা ছিলেন সমানভাবে উদাসীন। সাহিত্য-বিষয়ক বা আধা সরকারী কিছু সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা ছাড়া

(Maharaja—P. 340–341).

সংবাদপত্র জাতীয় কোন কিছুই বরদাস্ত করতেন না তাঁরা। বাইরে থেকে কোন সংবাদপত্রও এসব জায়গায় ঢুকতে পারত না। যে-কোন দেশীয় রাজ্যের আদর্শ নীতি বা 'model law'-এর পাতা ওল্টালেই এই উক্তির সততা কতটা তা বোঝা যাবে। এই আইনের পঞ্চম আর ষষ্ঠ ধারায় বলা হয়েছে:

পঞ্চম ধারা: মাকমা খান-এর (বিশেষ বিভাগীয় সরকারী দপ্তর) পূর্বাহ্নে সংগৃহীত বিশেষ লিখিত অনুমোদন ছাড়া কোন লোক বা কোন প্রেস সংবাদপত্র, বই, বা অন্য কোন কাগজ ছাপাতে পারবে না।

ষষ্ঠ ধারা: বিদেশী কোন মুদ্রিত কাগজ বা পত্র পত্রিকার সঙ্গে মেওয়াড়ের কোন ছাপাখানা বা প্রকাশক মুদ্রিত কোন পত্র-পত্রিকার আদান-প্রদান করতে পারবে না।

5: No newspaper or book shall be printed or published by any person or press, without the previous sanction of the Makhma Khan (Special Department) *

6: No printing press or publisher in Mewar shall exchange its or his publication with any foreign publication.*

তাহলে কি দেশীয় রাজ্যে সংবাদ বলে কোন বস্তু ছিল না? নিশ্চয় ছিল। সে-সংবাদ ছিল রাজকীয় সংবাদ, দস্তুরমত রাজসিক। সেই সব সংবাদ তৈরি হ'ত রাজপ্রাসাদে। ভাইসরয় রাজ্য পরিদর্শন করতে এলেন, সেই সংবাদ। তাঁকে কী ভাবে অভ্যর্থনা জানানো হল, সেই সংবাদ। তাঁর আসা আর যাওয়ার সময়ে ক'টা তোপধ্বনি করা হল, সেই সংবাদ; তাঁকে আদর আপ্যায়ন করার সংবাদ; রাজার মৃগয়া-গমনের সংবাদ, রাজার জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর সংবাদ, রাজা আর রাজপুত্রদের মহা-আড়ম্বরে জন্মতিথি পালনের সংবাদ। সংবাদের অভাব ছিল না দেশীয় রাজ্যে।

---

* Extract from the press Law—Udaipur State.

এই জন্যেই এঁদের উদ্দেশ্য করে কোন বিজ্ঞ সমালোচক বলেছেন:

'If they (the princes) are good for anything, it is for exhibiting.'

'সিভিল লিবার্টি' বলে যে একটা কথা রয়েছে, দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণ তা জানত না। 'Public meetings are almost unknown and even meetings for social purposes are often banned.' *

এই সব রাজা বাহাদুরদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্যার হেনরী কটন উনিশ শ' চার সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'India in Transition'-এ লিখেছেন: It is impossible to imagine a more sensitive body than our Indian feudatories. They are consumed by petty jealousies among themselves, by question of precedence of status of the strength of their armies.'

শুধু ভোগ আর ভোগ। ভোগের উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন রাজারা। ভোগের আগুনে অসংখ্য নারীদের পুড়িয়ে মারা, মদ খাওয়া, জুয়া খেলা, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রীদের ঘুষ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন মহৎ কাজ এঁদের করতে দেখেনি কেউ।

না; আরও একটা কাজ এঁরা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে করতেন। সেটা হল, অন্য রাজাদের চোখে ধুলো দিয়ে কেমন করে একমুঠো বেশী খেতাব ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া যায়। তার জন্যে ভাইসরয় আর পলিটিক্যাল দপ্তরের পায়ে তেল মাখানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পড়ে যেত। এই খেতাব আহরণের চেষ্টাটা যে কতখানি মারাত্মক ছিল তার কিছুটা আমরা বুঝতে পারি কর্ণেল স্যার কৈলাশ হাক্‌সারের উক্তি থেকে:

'During the last century or so, the world has witnessed unedifying spectacle of rulers of States all out to strip their compeers in the race for honours and decoration.' *

---

* Autobiography—Jawarlal Nehru.

* Maharaja—P. 342

কিন্তু তার জন্যে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের কোন অসুবিধে হয় নি; বরং সুবিধে হয়েছিল অনেক। যে গরু দুধ দেয় তার দাম গৃহস্থদের কাছে বেশী; মাঝে-মাঝে গুঁতোতে এলেও, তাকে তোয়াজ করতে গৃহস্থেরা কার্পণ্য করে না। নিজেদের ভবিষ্যৎটা দেখার মত নজরটা রাজাদের সঙ্কীর্ণ হলেও, তাঁদের নজরানার পরিধিটা এতই বিস্তৃত ছিল যে ব্রিটিশ আমলাশাহী চক্র তাঁদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ-ভারতকে বাঁচিয়ে রাখার যখন আর কোন পথ নেই তখন দেশীয় রাজ্যগুলির ওপরে তাদের দরদ যে উথলে উঠবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কী!

এই রকম একজন দুঁদে আমলাশাহীর কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে এই রাজপুরুষটির ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। পারিপার্শ্বিকতার চাপে দেশীয় রাজ্যগুলির রাজা-মহারাজারা যখন সামাল-সামাল ডাক ছাড়ছিলেন, তখনও ইনি হাল ছাড়েন নি; কংগ্রেসের কবল থেকে কয়েকটি রাজ্যকে বাঁচানোর জন্যে সর্বশক্তি পণ করেছিলেন। দেশের বরাত ভাল যে শেষ পর্যন্ত তিনি তা পারেন নি; পারলে, আরও যে কয়েক লাখ লোক অনাবশ্যক ভাবে মারা যেত তা ভাবতে গেলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

এঁর নাম স্যার কনরাড কোরফিল। তখনকার ভারত সরকারের পলিটিক্যাল দপ্তরের ইনি ছিলেন প্রধান রাজপুরুষ।

ভাইসরয়ের রাজ্যদপ্তরের প্রধান সচীব আর উপদেষ্টা হওয়ার ফলে, রাজাদের ওপরে তাঁর প্রভাব ছিল অসীম। রাজ্যগুলির বিষয়ে যা কিছু জানার প্রায় সবই তিনি জানতেন। তাদের ভেতরের ব্যাপারটাই বা কী, তাদের মধ্যে গলদ কোথায়, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঠিক কোন্ জাতীয়, সে-সব বিষয় তাঁর একেবারে নখদর্পণে ছিল। এক কথায়, দেশীয় রাজ্যগুলির বহুমুখী সমস্যা সম্বন্ধে এতখানি ওয়াকিবহাল অফিসার সে যুগে ভারত সরকারে আর কেউ

ছিলেন না, একমাত্র ভি. পি. মেনন ছাড়া। মেনন সাহেব ভারতীয় ছিলেন বলেই সরকারী মহলে কল্কে পেতে তাঁর কিছুটা দেরি হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কথা পরে বলছি। আগে সাহেবের কথাটা সেরে নিই।

কোরফিলড সাহেবের রাজপ্রীতিটাই যে কেবল বিরাট ছিল তা-ই নয়, কংগ্রেস-বিদ্বেষও ছিল তাঁর বিপুল। সে যুগে যে ক'জন ইংরেজ প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরোধিতা করতেন তাঁদের মধ্যে পয়লা নম্বরের ছিলেন স্যার কনরাড কোরফিলড। ভদ্রলোক নিজে ছিলেন একজন ছুঁদে রয়্যালিস্ট। তাই যখন মহামান্য রাজার কোন 'নিকট আত্মীয়' ভাইসরয় হয়ে ভারতে হাজির হলেন তখন তিনি বিশেষ উৎফুল্ল হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ভারতীয় রাজনীতিবিদদের, বিশেষ করে, কংগ্রেসের গ্রাস থেকে দেশীয় রাজাদের রক্ষা করার যে গুরু দায়িত্ব তিনি নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলার জন্যে নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে নীতিগত ভাবেই তিনি যথেষ্ট সাহায্য পাবেন।

কিন্তু হা হতোস্মি! তাঁর সে আশা পূর্ণ হল না। সাহায্য করা ত দূর-স্থান, নতুন ভাইসরয়ের কাছ থেকে তিনি ক্রমাগত বাধা পেতে লাগলেন। তিনি ক্রমশই বুঝতে পারলেন নিজে রাজার আত্মীয় হয়েও ভারতীয় রাজাদের জন্যে তাঁর মনে এতটুকু দরদ নেই। সেই নির্ধারিত তারিখের পরে এই সব রাজাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে সে সম্বন্ধে তাঁকে এতটুকু বিব্রত দেখা যায় নি। বার বার নিজের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি মাউন্টব্যাটেনের কাছে এগিয়ে গিয়েছেন; বার বার মাউন্টব্যাটেন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, কখনও মুচকি হেসে, কখনও বা ভ্রূকুঞ্চিত করে। তাঁর এই রকম মতিগতি দেখে কিছু ক্ষোভের সঙ্গেই কোরফিল্ড্ সাহেব বলেছিলেন: যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন পনেরোই আগস্ট বলে নির্ধারিত হল, তখন আমি এইটাই আশা

করেছিলেম যে এবারে হয়তো তিনি ভারতীয় রাজাদের দুর্দিনের কথাটা বুঝতে পারবেন। কিন্তু হায় রে ভাগ্য, তখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের সমস্যাগুলি থেকে তাঁর দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি।

'When the date (for the transfer of power) was fixed for August 15, wrote Sir Conrad Corfield, 'it became more important than ever before that he should appreciate the difficult position of the Indian States. It proved impossible, however, to distract his attention from British Indian problems.'

আসল কথাটা হল মাউন্টব্যাটেন সাহেবের একচক্ষু হরিণের দৃষ্টিভঙ্গিটা কোরফিলড সাহেবের মনঃপূত হয়নি। যে দুধ পড়ে গিয়েছে তাকে নিয়ে বিব্রত হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ব্রিটিশ-ভারতের অবস্থা সেই উপছে-পড়া দুধের চেয়েও মারাত্মক। ও কেবল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই শান্ত হবে না; আরও বিচ্ছিন্ন হবে। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের হানাহানিতে ও আর আস্ত থাকবে না, দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে; ত্রিধা, চতুর্ধাও হতে পারে। ব্রিটিশ-ভারতের রাজনৈতিক দেহে গ্যাংগ্রীন দেখা দিয়েছে। ওকে আর বাঁচানো যাবে না। মাউন্টব্যাটেন সাহেব তাঁর মতে সেই পচন রোধ করার জন্যেই তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন। অথচ যেটা অটুট রয়েছে, যেটাকে বাঁচাতে পারলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রেতাত্মা তৃপ্তি পেত, আর যাকে বাঁচানোর জন্যে তাঁকে শুভেচ্ছা আর কিছু রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই খরচ করতে হ'ত না, সেই দেশীয় রাজ্যগুলির দিকে একবারও তিনি তাঁর বরাভয় হাত বাড়িয়ে দিলেন না। কোরফিলড সাহেবের দুঃখটা ছিল এইখানে।

নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ঠিক করে ফেললেন স্যার কনরাড

[The Last Days of the British Raj—By Mosley—P. 180]

কোরফিল্ড। তিনি একবার দেশীয় রাজ্যগুলির ম্যাপের দিকে তাকিয়ে রইলেন, পলিটিক্যাল দপ্তরে সংরক্ষিত ফাইলগুলি নেড়েচেড়ে দেখলেন। ছেলে বিপথগামী হলে বাবা যেমন করে দুঃখে অনিশ্চিতভাবে নিজের মনেই ঘাড় নাড়েন, তিনিও সেই রকম করলেন। এই সব নাড়ুগোপাল পেল্লাদমার্কা রাজারা কি কিছুই বুঝবে না? ব্রিটিশ সরকার কবে থেকে তাদের সাবধান করে আসছে, বাপুহে, আর তোমরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করো না, জোট পাকাও, সাধারণের স্বার্থে মিলে-মিশে কাজ কর, মদ আর মেয়েমানুষের পেছনে টাকা না উড়িয়ে এবারে প্রজাদের জন্য কিছু কর। সংস্কার কর শাসনতন্ত্র, জনপ্রিয় সরকার গঠনে মন দাও। ঠুঁটো জগন্নাথের মত চুপচাপ বসে না থেকে আধুনিক জগতের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চল। অন্যথায় কংগ্রেসের ধাক্কা তোমাদের প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে, তোমাদের ওই সর্বহারা প্রজাদের হাতেই তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? কয়েকটি রাজ্য ছাড়া বাকি সবাই ওই 'কুছ্ পরোয়া নেহী' গোছের মস্তান। কোরফিল্ড সাহেবেরও তা অজানা ছিল না, এবং, তাঁর সত্যিকার বিপদ ছিল এইখানে।

তবুও তিনি চুপ করে বসে রইলেন না, সেই পুরানো অলিখিত ফতোয়াটাই তিনি গোপনে যতটা সম্ভব রাজাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শ্বাস যতক্ষণ রয়েছে, মানুষের আশা তো ততক্ষণ থাকবেই।

একথা অবশ্য সত্যি যে পলিটিক্যাল দপ্তরের প্রথম রাজপুরুষ হওয়ার ফলে, জোর করে তিনি তাঁদের দিয়ে অনেক কিছু করাতে পারতেন। হুমকি দিয়ে, চাবুক কষিয়ে শায়েস্তা করতে পারতেন তাঁদের, সিংহাসনচ্যুত করানোরও ক্ষমতা তাঁর কম ছিল না। কিন্তু সেদিকে তিনি যান নি। কেন যাননি? কারণ ও-রকম করার কোন রীতি ছিল না। মহামান্য রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা ছাড়া

অন্য কোন উচ্ছৃঙ্খলতাই পলিটিক্যাল দপ্তরের কাছে রাজ্যচ্যুতির কারণ বলে স্বীকৃতি হয়নি।

এই রকম একটি ব্যাপার ঘটেছিল মহারাজা টুকো-জি-রাও হোলকারের। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল তিনি একটি বিরাট রাজা। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজকীয় সম্মান আর সুযোগ-সুবিধে আদায় করার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কচাকচি শুরু করে দিলেন। অন্য রাজারা যে-সব সুযোগ-সুবিধে পেতেন না তাই তিনি আদায় করলেন। তাঁকে 'ব্রিটিশ গার্ড অফ অনার' দেওয়া হল, এবং দিল্লীর দরবারে নিজস্ব রাষ্ট্রদূত পাঠানোর অনুমতি পেলেন তিনি। তাতেও তিনি খুশি হলেন না। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এবং ভাইসরয়ের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তাঁর বিরোধ বাঁধল, এবং প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে শুরু করলেন। সেখানেই থামলেন না তিনি। রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড প্রিন্স-অফ-ওয়েলস থাকাকালীন যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন সেই সময় টুকো-জি-রাও তাঁকে ইন্দোরে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খানাপিনার আসরে তিনি প্রিন্স-অফ ওলস-এর সামনেই তাঁর মনের ঝাল মিটিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে গালাগালি দিলেন, জার্মানীর দ্বিতীয় কাইসার উইলিয়ম আর তাঁর সেনাপতিদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

ব্রিটিশ সরকার তাঁর ব্যবহারে উত্তরোত্তর বিরক্ত হচ্ছিল বটে, কিন্তু তবু তাঁকে সিংহাসন থেকে সরায় নি। যদি তিনি শেষ পর্যন্ত 'বাওলা মার্ডার কেসে' জড়িয়ে না পড়তেন তাহলে তাঁর রাজ্যচ্যুতি ঘটত কিনা তা নিশ্চয় করে বলা যায় না!

আর একটি মহারাজার রাজ্যচ্যুতি ঘটেছিল, তিনি হচ্ছেন নব স্টেটের মহারাজা হিজ হাইনেস রূপত্নমন সিংহ। ব্রিটিশ সরকার জানত ব্রিটিশ বিরোধী শিখসম্প্রদায়ের সঙ্গে মহারাজার আঁতাত রয়েছে, এবং ভেতরে ভেতরে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তিনি উত্তেজনা প্রচার করছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কোন

ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নব স্টেটের একটি চাষীর মেয়ে নীলচক্ষু রাচনিকে নিয়ে পাতিয়ালার মহারাজা স্যার ভূপিন্দর সিং-এর সঙ্গে লড়াই না বাঁধলে তাঁর রাজ্যচ্যুতি ঘটত কিনা তা হলফ করে বলা যায় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমস্ত রকম ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার রাজাদের সিংহাসনের ওপরে সহসা হাত দিতে চাইত না। দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার কেউ চেষ্টা করলে বা জনপ্রিয় সরকার গঠন করার কেউ চিন্তা না করলে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার কোন রকম বাসনা ব্রিটিশ সরকারের দেখা যায় নি।

এই ছিল তখনকার নীতি। ব্রিটিশ সরকার সময়ে রাজাদের যদি সতর্ক করে দিতে পারতেন তাহলে মরার সময় তাঁদের আর এত হরিনাম জপ করতে হ'ত না। কিন্তু মরার বাড়া গাল নেই। গাল যখন নেই তখন কী হলে কী হতে পারত তাই ভেবে বসে বসে আপশোস করেই বা কী এমন স্বর্গরাজ্য উদ্ধার হবে। তার চেয়ে এখনও যতটুকু সামলানো যায় ততটুকুই লাভ, অনেকটা পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মত। কোরফিলড সাহেব সেই চেষ্টাতেই উঠে পড়ে লাগলেন।

দুটি সমস্যা তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। একটি হচ্ছে, হায়দারাবাদ বা ওই ধরণের দু'চারটে বড় বড় রাজ্যকে কী করে বাঁচান যায়; দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কেমন করে সাধারণভাবে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীন ভারতে অন্তর্ভুক্তির পথে বাধার সৃষ্টি করা যায়।

উত্তম কথা। এগোনা যায় কোন্ পথে? সদর দরজা দিয়ে নাক গলানো যাবে না। গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল, আজাদ, জিন্না, লিয়াকতের কথা ছেড়ে দিলেও, আর একটি পাহাড় সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হচ্ছেন ভাইসরয় স্বয়ং মাউণ্টব্যাটেন। তাঁকে টপকে যাওয়ার ক্ষমতা কোরফিলড সাহেবের ছিল না। সুতরাং পেছনের পথই

পরতে হবে, অর্থাৎ, ঘোড়া ডিঙিয়ে যদি ঘাসই খেতে হয়, তাহলে ঘোড়ার চোখে ঠুলি পরাতে হবে।

কিন্তু ঠুলি পরাতে হল না; মাউন্টব্যাটেন সাহেব নিজেই সে কাজ সেরে ফেলেছিলেন। ভারতের মাটিতে পা দিয়েই তিনি বলে দিয়েছেন ওই সব রাজ-রাজড়াদের খিদমৎগিরি করার জন্যে তিনি এখানে আসেন নি। তাছাড়া তিনি মনে করেন ওই সব অকর্মণ্য রাজা-মহারাজাদের স্বাধীন হওয়ার বায়নাক্কার পেছনে কোন যুক্তি নেই। হয় ইধার আও, না হয়, উধার যাও। মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা-ধিন -ধিনা, ধিনতা-ধিনা করা চলবে না তোমাদের। ব্যস। ভদ্রলোকের এক কথা। তারপরেই তিনি সব চেয়ে বড় সমস্যা নিয়ে মাতলেন। সেটি হল হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। সে সমস্যাটি এতই গভীর যে মাউন্টব্যাটেনের মত জলচর তিমিও তল হারিয়ে ফেললেন। রাজ-রাজড়াদের দিকে নজর দেওয়ার সময় কোথায় তাঁর ?

সুতরাং মাউন্টব্যাটেন নিজের চোখে নিজেই ঠুলি পরে বসেছিলেন।

এই সুযোগে কোরফিল্ড সাহেব নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লেন চোরা পথে। পলিটিক্যাল দপ্তর হাতড়াতে লাগলেন তিনি। উদ্দেশ্য, শ্বেতহস্তীদের হাতে দেওয়ার জন্যে যদি কিছু হাতিয়ার পাওয়া যায়। সামনেই ছিল 'হেস্তালের বাড়ি'। সেইটিই হাতিয়ে নিয়ে মনসা ঠাকুরকে ধোলাই দেওয়ার চেষ্টায় চাঁদ সদাগরের মত তিনি বোম্ বোম্ করে বেরিয়ে পড়লেন। দেখা যাক না, শক্তি দিয়ে যেটা প্রায় খারিজ হয়ে যাওয়ার পথে, বুদ্ধি খাটিয়ে তা সুসম্পন্ন করা যায় কিনা।

চোখ টিপে দিলেন রাজাদের ঃ চেপে থাক, ছটফট করো না।

কাঁদ-কাঁদ হয়ে রাজারা বললেন ঃ সে কী কথা স্যার ? খাটে ওঠার আর বাকিটা কোথায় ?

আছে, আছে। এখনও অনেক বাকি রয়েছে। তাছাড়া, মরতেই যদি হয় লড়ে মরতে হবে তো !

সেকথা ঠিক। কিন্তু লড়ব কী দিয়ে ?

এই দিয়ে।

এই বলেই 'হেস্তালের বাড়ি'টি বাড়িয়ে দিলেন কোরফিল্ড সাহেব।

রাজারা ভেবেছিলেন সাহেবের হাতে হয়তো বা পাশুপত অস্ত্রের মত শিবঠাকুরের দেওয়া 'স্পেশাল' কোন অস্ত্র রয়েছে। কিন্তু ওমা! এ যে প্যারামাউণ্টসি। ও নিয়ে অনেক রথবাজি হয়ে গিয়েছে। ভোঁতা হয়ে গিয়েছে ওর দাঁত। ও এখন কোন্ কম্মে লাগবে সাহেব!

লাগবে, লাগবে, ধৈর্য ধর—আশ্বাস দিলেন স্যার কনরাড কোরফিল্ড।

অবিশ্বাসে ঘাড় নাড়লেন রাজারা: কী করে লাগবে বলুন! স্বয়ং ভাইসরয়ই যে আমাদের ডুবিয়ে দিয়েছেন।

কোরফিল্ড সাহেব চুপি চুপি বললেন: ভাইসরয়-এর ওপরে রয়েছেন রাজা। মহারাণী ভিক্টোরিয়া একদিন তোমাদের যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার ক্ষমতা ভাইসরয়ের নেই। নিজেদের ঘাঁটি আগলিয়ে বসে থাক; খবরদার কেউ ওদের ফাঁদে পা দিও না।

অন্ধকারে আশার আলো। যদিও বিদ্যুৎ, চোখ-ঝলসানো ব্যাপার, তবু আলো তো ঠিকই। ব্রিটিশ রাজার সঙ্গে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সম্বন্ধটা ঠিক কী ধরণের সে সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান হয়তো অনেক রাজারই ছিল না; থাকলেও মনের নিভৃত কন্দরে একটা কিছু আশা নিশ্চয় তাঁদের ছিল। কোরফিল্ড সাহেবের ভরসাটাকে তাই তাঁরা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না।

জিজ্ঞাসা করলেন: বর্তমানে আমাদের তাহলে কী করতে হবে ?

কোরফিলড সাহেব বললেন: চোদ্দই আগস্ট পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকতে হবে।

কংগ্রেসী নেতাদের ধাপ্পায় আর হুমকিতে কদাপি ভয় পাবে না।

তথাস্তু। কোরফিল্ড সাহেবের আন্তরিকতার ওপরে তাঁদের আস্থা ছিল অটুট। না রেখেই বা লাভ কী? যখন সব ওষুধ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তখন মা শেতলার চরণামৃতর দাম হঠাৎ বেড়ে ওঠে।

তবে, মিথ্যে বলে লাভ নেই, কোরফিল্ড সাহেবও চুপচাপ বসে-ছিলেন না। কোথা দিয়ে কোন্ ফাঁক বার করা যায় তারই চেষ্টায় তিনি উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। রাজারা সত্যি কথাই বলেছেন—প্যারামাউণ্টসি নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। সুরাহা কিছু হয়নি। ব্যাখ্যার কচকচিতে পাঁক উঠে এসেছে। নীতিগত ভাবে স্বীকার করে নিলেও, পারামাউণ্টসিকে কীভাবে কাজে লাগালে তা ভারত-বর্ষের বৃহৎ স্বার্থের পরিপন্থী হবে না সেদিক থেকে ব্রিটিশ সরকার তখনও কিছু ভেবে উঠতে পারেনি; পারলেও, সে-বিষয়ে প্রকাশ্যে স্পষ্ট করে কিছু ঘোষণা করেনি। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র শব্দটির যে ব্যাখ্যা করেছে কংগ্রেস নেতারাও তাকে মেনে নিতে রাজী নন। উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দই অগস্ট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর থেকে তার সমস্ত দায় আর দায়িত্ব তুলে নেবে—একথাটা তাঁদের মতে অবিশ্বাস্য। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে এই সব রাজারা কোনদিনই স্বাধীন ছিলেন না, কারণ যুদ্ধ ঘোষণা করা বা বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা করার কোন দায়িত্বই দেওয়া হয়নি তাঁদের। যাঁদের কোনদিনই কোন স্বাধীনতা ছিল না, রাতারাতি তাঁদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করাটা যে অহেতুকর, তাই নয়, রীতিমত বিপজ্জনকও বটে।

এই জন্যই জহরলাল নেহেরু রাজাদের কাছে আবেদন পাঠিয়ে-ছিলেন: ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপনাদের যে সমস্ত লিখিত অথবা অলিখিত চুক্তি রয়েছে সেগুলি (অবশ্য সাময়িকভাবে) ভারতবর্ষের সঙ্গে করুন, যাতে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও নয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যেতে পারেন।

কোরফিল্ড সাহেব সব দেখলেন; ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেনকে না

জানিয়ে গোপনে বিলেতের সরকারী মহল আর কিছু ঘুঘু রক্ষণশীলদের সঙ্গে শলাপরমর্শ শুরু করে দিলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল যাতে ব্রিটিশ সরকার সমস্ত টালবাহনা পরিত্যাগ করে দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সরকার তাঁর চাহিদাটিকে বাতিল করতে পারে নি। তবে ব্যাপারটি নিয়ে আরও একটু আলোচনা করার জন্যে তাঁকে লণ্ডন যেতে হবে।

সুযোগও এসে গেল, এবং হঠাৎই। সময়টা হচ্ছে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের মে মাস। 'ডিকি বার্ড' প্ল্যানটি (অর্থাৎ স্বাধীনতা বিলের যে খসড়াটি মাউনটব্যাটেন সাহেব দিল্লিতে বসে তৈরী করেছিলেন) নিয়ে তাঁর দুজন পরামর্শদাতা লর্ড ইসমে আর স্যার জর্জ অ্যাবেল তাঁর নিজস্ব উড়োজাহাজ ইয়র্ক-এ চেপে লণ্ডনে যাচ্ছিলেন। স্যার কনরাড কোরফিলড সেই জাহাজে উঠে পড়লেন। যাওয়ার সময় ভাইসরয়কে বলে গেলেন প্যারামাউণ্টসি নিয়ে কিছু জরুরী আলোচনা করার জন্য তিনি লণ্ডনে যাচ্ছেন। তিনি বুঝতেও পারলেন না (সে সময়ও তাঁর ছিল না) যে কোরফিলড সাহেব তাঁকে বেইজ্জৎ করার জন্যে ইংলণ্ডে ধাওয়া করেছেন।

তখন ভারতসচীব ছিলেন লেবার দলের জনৈক সদস্য—লর্ড লিসটোয়েল! কোরফিলড সাহেব তাঁকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে একেবারে পাট করে দিলেন।

কি বোঝালেন তিনি ?

নতুন করে বোঝালেন সেই পুরনো দুর্বোধ্য কথাটাই। ভারতের রাজাদের ওপরে আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া। সেই দায়িত্ব পালন করতে হলে রাজাদের কংগ্রেসী নেতাদের হাতে তুলে দেওয়াটা উচিত হবে না। দেওয়ার চেষ্টা করলে রক্ষণশীলদের কথা ছেড়েই দিলাম, ব্রিটেনের জনসাধারণও ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখবে না।

তা বটে, কিন্তু তাহলে করতে হবে কী ?

ব্রিটিশ সরকারকে প্রাঞ্জল ভাষায় ঘোষণা করতে হবে, যেদিন স্বাধীনতা হস্তান্তরিত হবে সেইদিনই প্যারামাউন্টসি লোপ পারে, তার আগে নয়।

তাতে রাজ্যগুলির লাভ কী হবে?

লাভ হবে এই যে ওইদিনের আগে দুটি ডোমিনিয়নের কোনটিতে যোগ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রাজাদের থাকবে না।

কোরফিল্ড সাহেবের বক্তব্য এই যে ঠিক যেদিন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছে ঠিক সেইদিনই প্যারামাউন্টসি আইনসঙ্গতভাবে লোপ পাবে। তাতে রাজাদের সুবিধে হবে এই যে দুটি ডোমিনিয়নের মত তাঁরাও স্বাধীন হয়ে যাবেন। তারপরে নিজেদের মর্জিমত যা হয় করুন তাঁরা। আমাদের কিছু বলবার থাকবে না! ব্রিটিশ সরকার কারও ওপরে কোন অন্যায় করেছেন এ অপবাদ কেউ আর দিতে পারবে না।

ভারতসচীব কোরফিলড সাহেবকে সেই আশ্বাস দিলেন।

ভারতসচীব লর্ড লিসটোয়েলের কথার নড়চড় হয় নি আর। মাউন্টব্যাটেন সাহেব বার বার অনুরোধ করেছেন, কংগ্রেস নেতারা অসংখ্যবার আপত্তি জানিয়েছেন, ভারতসচীবকে টলানো যায় নি। ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিলটির কিছুটা অংশ রদবদল করে কোরফিলড সাহেবের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে নতুন কয়েকটি লাইন যেখানে ঢোকানো হল। তাতে লেখা হল, যেদিন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে সেইদিনই প্যারামাউন্টসি লোপ পাবে। তার আগে নয়, যদি, না অবশ্য কোন রাজা স্বেচ্ছায় তার আগেই যে-কোন একটি ভারতীয় ডোমিনিয়নের সঙ্গে মিলিত হওয়ার চুক্তি করেন।

এর অর্থ দাঁড়াল, পনেরোই আগস্ট শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছ' শ'র কাছাকাছি দেশীয় রাজ্য আইনসঙ্গতভাবে স্বাধীন হয়ে যাবে। এই রাজ্যগুলির লোকসংখ্যা হচ্ছে দশকোটির কাছাকাছি।

মাউন্টব্যাটনের দুই উপদেষ্টা লর্ড ইস্‌মে আর স্যার জর্জ অ্যাবেল মন্ত্রীসভার সম্মতির জন্যে 'ডিকি-বার্ড' প্ল্যানটি নিয়ে গিয়েছিলেন

লণ্ডনে। বিভিন্ন স্তরে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে সামান্য-কিছু রদবদলের পরে যে সময় মন্ত্রীসভা সেটি গ্রহণ করলেন ঠিক সেই সময় ভাইসরয় আর একখানি পরিকল্পনা ('মেনন প্ল্যান') পাঠিয়ে দিয়ে জানালেন: 'ডিকি-বার্ড' প্ল্যানটি নাকচ করে দিন।

এটিলি সাহেব তো চটে লাল। ইস্‌মে-অ্যাবেল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মাউন্টব্যাটেনের এ হেন মতিগতিতে বিভ্রান্ত হয়ে এটিলি সাহেব তাঁকে লণ্ডনে ডেকে পাঠালেন।*

মাউন্টব্যাটেনকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁর নিজস্ব প্লেন 'ইয়র্ক' একতিরিশে মে কলকাতায় ফিরে এল। সেই প্লেনে ফিরে এলেন স্যার কনরাড কোরফিলড। ভি. পি. মেননকে সঙ্গে নিয়ে মাউন্টব্যাটেন লণ্ডন যাত্রা করলেন। তিনি জানতেন না কোরফিলড ফিরে এসেছেন। কোরফিলড-ও জানানোর চেষ্টা করেন নি এতটুকু। ভারত-সচিবের সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছিল সে বিষয়েও তিনি চুপচাপ ছিলেন।

ভারতে ফিরে তিনি আর সময় নষ্ট করলেন না, কাজে লেগে পড়লেন। কাজ মানেই ধ্বংস যজ্ঞ। প্রথমেই তিনি দপ্তরের কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন: প্যারামাউন্টসি পাওয়ারের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের যে-সব চুক্তি হয়েছে সেগুলি বাতিল করে দেওয়ার পরোয়ানা পাঠাও—এখনই।

কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কী কী চুক্তি ছিল?

চুক্তি একটি নয়, অনেকগুলি। প্রায় একটি শ' বছর ধরে ভারতীয় প্রদেশগুলির সঙ্গে রাজ্যগুলির একাধিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তির মুসৌলিয়ম দাঁড়িয়েছিল দুটি স্তম্ভের ওপরে। একটির ভিত ছিল প্রদেশে, আর একটির ভিত ছিল দেশীয় রাজ্যে। সর্বভারতীয় নীতিগুলি রেসিডেন্সীর মারফতে দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রয়োগ করা

---

* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আমার 'স্বাধীনতার হাতবদল' গ্রন্থটিতে পাবেন।

হত। প্রধান প্রধান সৈন্য-শিবির আর সামরিক ঘাঁটিগুলি দেশীয় রাজ্য গুলির ভৌগলিক সীমানার মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। ভারতীয় রেল সড়কগুলি দেশীয় রাজ্য এবং ভারতীয় প্রদেশগুলির মধ্য দিয়ে বিস্তৃত ছিল। নিরাপত্তা আর যাত্রীদের সুবিধের জন্য রেলগাড়ি চলাচলের সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 'ক্রাউন রিপ্রেসেনটেটিভে'র ওপরে। এমন কি কোন একটি প্রদেশের রাজধানী ছিল ছোট একটি রাজ্যের সীমানার মধ্যে। ডাক ও তার বিভাগ, অস্ত্র-শস্ত্রের ওপরে বিধি-নিষেধ, পলাতক আসামীদের ধরে আনা বা পাঠানোর ব্যাপার, আফিং এবং অন্যান্য আবগারি দ্রব্যের বিলি-ব্যবস্থায়, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ নীতিতে, এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় ব্যাপারে, পলিটিক্যাল দপ্তর আর রেসিডেন্সীগুলি পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে এতদিন কাজ করে এসেছে। এ দুটির যে-কোন একটি অঙ্গ অপরটির সঙ্গে অসহযোগিতা করলে সারা ভারতের জীবনযাত্রা একদিনে অচল হয়ে পড়ত।

স্যার কনরাড কোরফিলড-এর প্রথম লক্ষ্য হল ভারতবর্ষের একটি অঙ্গকে অপর অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

তাঁর দ্বিতীয় নির্দেশ হল: দেশীয় রাজাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত গোপন কাগজপত্র পলিটিক্যাল দপ্তরে রয়েছে, সেগুলি ফাইল থেকে ছিঁড়ে পুড়িয়ে দাও।

এগুলির মধ্যে ছিল বিভিন্ন সময়ে রাজ্যগুলিরসঙ্গে পলিটিক্যাল দপ্তরের যে সমস্ত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল সেগুলি, রাজাদের দুর্নীতি আর অবিমৃষ্যকারীতা নিয়ে দপ্তর যে সমস্ত কঠোর বিরূপ মন্তব্য করেছে সেই সমস্ত দলিল, রাজাদের উচ্ছৃঙ্খলতা আর অযোগ্যতা নিয়ে যেখানে লিখিতভাবে তিরস্কার করা হয়েছে সেই সমস্ত কাগজপত্র, এককথায় রাজাদের অনেক অকাজ, কুকাজ, নারীহত্যার নীরব সাক্ষী ছিল ওই কাগজগুলি। এক-আধখানা নয়, দুচার ডজন

নয়, ওজনে প্রায় চার টনের মত, সেই সব কাগজ স্যার কনরাড কোরফিলড-এর নির্দেশে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এগুলি ছাড়া, আরও অনেক মূল্যবান দলিলপত্র ছিল। সেগুলিকে ছিঁড়ে 'ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে' পুরে লণ্ডনে 'ইম্পিরিয়েল আরকাইভস'-এ পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সাফ হয়ে গেল পলিটিক্যাল দপ্তর, যাকে বলে একেবারে ঝরঝরে তকতকে।

ব্যাপারটা এখানেই হয়তো মিটে যেত; কিন্তু, মিটল না। কোরফিলড সাহেব চালে মারাত্মক রকমের একটা ভুল করে ফেলে-ছিলেন। সেই ভুলেরই মাসুল দিতে হল তাঁকে।

ভুলটা হল, ফিরে আসার সংবাদ তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে দেননি। ভারতসচিবের সঙ্গে তাঁর যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল সে-কথাও তিনি তাঁকে কিছু বলেন নি। মাউণ্টব্যাটেন ভি. পি. মেননকে সঙ্গে নিয়ে যে প্লেনে বিলেতে যাচ্ছিলেন সেই প্লেনেই যে কোরফিলড ফিরে এসেছিলেন, সে-সংবাদও ভাইসরয়ের জানা ছিল না।

জানলেন কখন?

জানলেন, যখন তাঁর প্লেনটি লণ্ডন যাওয়ার পথে দিল্লী আর করাচীর মধ্যে উড়ে যাচ্ছে। বিমানের একটি কর্মচারী তাঁকে জানালেন যে ফেরার পথে ওই বিমানেই স্যার কনরাড কোরফিলড ফিরে এসেছেন।

খবরটা পেয়েই মেননকে তিনি একটি কাগজে লিখে জানালেন: জানেন, সেই কুত্তিকা বাচ্চা কোরফিলড কী করেছে?

মেনন লিখে জানালেন: না তো।

আমাকে কিছু না জানিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে। সে কী করতে চায় তাই আমি ভাবছি।

---

*Mosley The Last days of British Raj—P. 184]

কোরফিলড সাহেব মাউন্টব্যাটেনের কাছে খতম হয়ে গেলেন।

তারপরেই শুরু হল হই-হই কাণ্ড! পলিটিক্যাল দপ্তরের কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলার সংবাদ বাইরে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতারা রেগে কাঁই হয়ে গেলেন; মুসলিম লীগের নেতারা মুখে বিশেষ কিছু না বললেও মনে মনে বেশ অস্বস্তিতে পড়লেন।

তেরোই জুন ভাইসরয়ের প্রাসাদে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা-সভা বসল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নেহেরু, জিন্না, আর কোরফিলড।

পলিটিক্যাল দপ্তরের কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলার সংবাদের জওহরলাল নেহেরু এমনিতেই চটে ব্যোম হয়ে ছিলেন; সভা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানতে চাইলেন, কোন্ অধিকারে পলিটিক্যাল দপ্তর এমন সব কাজ করেছে যে কাজগুলি ভারত সরকারের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর?

'By what right have the Political Department,' he asked, 'gone ahead and taken action that will be highly injurious to the Govt. of India?'*

নেহেরু বলে গেলেন: বিষয়টি নিয়ে চার মাস ধরে আমি চিঠি লিখে চলেছি। কিন্তু সামান্য একটা ভদ্রতার খাতিরেও আমার এবং আমার সহকর্মীদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে একবারও আলোচনা করা হল না। সব কাজেই আপনারা একতরফা করে গিয়েছেন।

তারপরেই তিনি কোরফিলড সাহেবের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন: পলিটিক্যাল দপ্তর, বিশেষ করে স্যার কনরাড কোরফিলড-এর বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ করছি যে তিনি বৈধ ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। আমি মনে করি এঁরা যা করেছেন তা অনুসন্ধান করার জন্যে উচ্চতম পর্যায়ের একটি বিচার-বিভাগের তদন্ত বসানো হোক।

[G, I Records.]

'I have been writing letters on this subject for four months,' said Nehru, 'and I have got nowhere. I and my colleagues havenot till now been shown the common courtesy of being brought into consultation. A completely unilateral action has been taken.'

'Then turning to the Political Adviser he said, 'I charge the Political Department and Sir Conrad Corfield particularly, with misfeasance. I consider that a judicial enquiry of the highest level into their actions is necessary.'*

ভাবাবেগে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন জওহরলাল।

কোরফিলড সাহেব লর্ড মাউন্টব্যাটনের দিকে একবার মুখ তুলে তাকালেন। জওহরলালের উদ্ধত আক্রমণের তিনি কোন জবাব দেবেন কি না এই ছিল তাঁর জানার উদ্দেশ্য। কিন্তু চুপচাপ বসে রইলেন মাউন্টব্যাটেন সাহেব।

এগিয়ে এলেন মহম্মদ আলি জিন্না। তিনি চেয়ারটাকে একটু নাড়িয়ে তাঁর ঠাণ্ডা কনকনে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বললেন: মিঃ নেহেরু যদি আলোচনা করতে এসে এই ধরনের ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেন, এবং সামান্য বক্তব্যটিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ঢোল করেন, অথবা ভিত্তিহীন সব অভিযোগ নিয়ে আসেন, তাহলে এই আলোচনায় আর বসে থেকে লাভ নেই।

'If Mr. Nehru is to introduce emotion, bombast, and unfounded allegations into the discussion, it does not seem worthwhile going on in the meeting.'*

*[G. I. Records]

কোরফিলড নিজেকে সামলিয়ে নিলেন একটু, তারপরে পরিচ্ছন্নভাবে বললেন: লুকানোর কিছু নেই আমার। ক্রাউন রিপ্রেসেনটেটিভ-এর নির্দেশ আর ভারত-সচীবের অনুমোদন নিয়ে আমি সর্বত্রই কাজ করেছি। আর অধিকার পরিত্যাগ করার কথা যদি বলেন, তাহলে আমি বলব যে ওই প্রস্তাবটিও ভারত-সচিব সমর্থন করেছেন। প্যারামাউন্টসি যদি স্বাধীনতা হস্তান্তরের দিন পর্যন্ত থেকে যায় তাহলে ব্রিটিশ সরকারকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হতে হবে।

'I have nothing to hide. Everywhere I have acted under the instructions of the Crown Representative and with the approval of the Secretary of State. As to the relinquishing of right, it has been accepted by the Secretary of State that if such rights were retained by the Paramount Power up to the very date of transfer, His Majesty's Govt. would be false to their promise that Paramountcy would not be transferred to the new Dominions.

কেন? না, দেশীয় রাজাদের সঙ্গে চুক্তিই হচ্ছে যে তাদের লিখিত সম্মতি ছাড়া প্যারামাউন্টসি নবগঠিত দুটি ডোমিনিয়নের কারও হাতেই তুলে দেওয়া হবে না।

বেশ কথা? কিন্তু আপনি পলিটিক্যাল দপ্তরের রেকর্ডপত্র নষ্ট করলেন কেন?

তাতেও দমানো গেল না সাহেবকে। কিছু রেকডপত্র ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের দক্ষ অফিসারদের সঙ্গে যুক্তি করেই নষ্ট করা হয়েছে। বাকি রেকর্ডগুলি গোছানো হচ্ছে। তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র নষ্ট করা হবে না। তবে সেই স্তূপের ভেতরে

*[G. I. Records as quoted by Mosley.]

এমন কিছু দলিল থাকতে পারে যেগুলি ভারত সরকারের হাতেও তুলে দেওয়া হবে না। তবে সেগুলি তিনি পোড়াবেন না, ইংলণ্ডের হাইকমিশনারের হাতে তুলে দেবেন।—সাফ জবাব দিলেন কোরফিলড সাহেব।

না, এ হেন সাহেবকে নিয়ে আর যা কিছু করা যাক্, ঘর করা যায় না। অথবা ঘর করা বিপজ্জনক। সেই আলোচনাতেই জহরলাল নেহেরু ঘোষণা করলেন যে, দেশীয় রাজন্যবর্গের বিষয়টি নিয়ে কাজ করার জন্যে কংগ্রেস একটি স্টেট দপ্তর খুলতে মনস্থ করেছে। মহম্মদ আলি জিন্নাও জানালেন মুসলীম লীগেরও সেইরকম বাসনা রয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেন মুখ খোলার আগেই প্রতিবাদ জানালেন কোরফিলড সাহেব। স্বাধীনতা পাওয়ার পরে ডোমিনিয়নগুলি যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা হস্তান্তরের আগে ওরকম কোন কাজে সম্মতি দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের নীতিবিরুদ্ধ।

কিসের জন্যে নীতিবিরুদ্ধ?

তাহলে মনে হবে ব্রিটিশ সরকারের প্যারামাউণ্টসি ভারত সরকারের ওপরে এসে বর্তেছে। আইনত এটা সিদ্ধ হতে পারে না। চৌদ্দই আগস্ট পর্যন্ত পলিটিক্যাল দপ্তরই স্টেটগুলির একমাত্র অভিভাবক।

বৃথাই প্রতিবাদ করলেন তিনি। কংগ্রেস আর মুসলীম লীগ কোরফিলড সাহেবের ওপরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আর মাউণ্টব্যাটেন সাহেব অপ্রসন্ন হয়েছেন তাঁর লুকোচুরিতে। ফুরিয়ে গেল ল্যাঠা। কোরফিলড সাহেব মুখ চুন করে ফিরে গেলেন।

কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা অটুট রইল। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে তাঁর 'বশ' অর্থাৎ লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও কংগ্রেস আর মুসলীম লীগের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছেন। আরও সাবধান হয়ে গেলেন তিনি, আরও প্যাঁচ কষতে লাগলেন। তিনি আর তাঁর বন্ধুরা রাজাদের

কানে অনবরত ফুসমন্ত্র দিতে লাগলেন: চুপ করে থাক, ধৈর্য ধর। স্বাধীনতা তোমাদের মুঠোর মধ্যে।

ট্রাভাঙ্কোর আর হায়দারাবাদ তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে দিল যে তারা হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান কোন দলেই যোগ দেবে না। পনেরোই অগস্ট তারা সরাসরি স্বাধীন হয়ে যাবে। এইখানেই থামল না তারা। পনেরোই অগস্ট থেকে দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে কী ভাবে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন হবে তাই নিয়ে শলা-পরামর্শ শুরু করে দিল।

বিপদ হল হায়দারাবাদকে নিয়ে।

রাজধানীর কাছাকাছি সেকেন্দ্রাবাদে একটি সৈন্য-শিবির ছিল। সেই শিবিরে ছিল সাত থেকে আট হাজারের মত ভারতীয় পল্টন, সঙ্গে ছিল সাঁজোয়া। দেশীয় রাজ্যগুলির অসুবিধে ছিল ওইখানে। সেইজন্যে লণ্ডন থেকে ফিরে কোরফিল্ড সাহেব দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে ভারতীয় সৈন্যবহর সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রতিরক্ষা সদস্য বলদেও সিংকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বলদেও সিং সেই অনুরোধটিকে কোন আমল না দিয়ে যথারীতি ছেঁড়া কাগজ ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছিলেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর এ হেন ব্যবহারে মহামান্য নিজাম বাহাদুর বিশেষ বিপন্ন হয়েছিলেন! সৈন্য অপসারণের কাজটা ত্বরান্বিত করার জন্যে ভারত সরকারকে বার বার তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোন কাজ হয় নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর আইন-উপদেষ্টা স্যার ওয়াল্টার মঙ্কটন ২২শে জুন লর্ড ইস্‌মেকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। সেই পত্রটির বঙ্গানুবাদ আমি নীচে রাখলাম:

এখানে [হায়দারাবাদে] কোনদিক থেকেই অশান্তির শেষ নেই আমার। আমাদের সৈন্যশিবির থেকে ভারতীয় পল্টন তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হায়দারাবাদ পলিটিক্যাল দপ্তরের ওপরে বার বার চাপ দিচ্ছে। সাঁজোয়াবাহিনী সমেত সাত থেকে আট হাজার সশস্ত্র ভারতীয় বাহিনী এ রাজ্যে রয়েছে। পনেরোই অগস্টের পরে

ওইসব সৈন্য এখানে থাকবে একথা ভাবতেই নিজাম বাহাদুরের অসহ্য লাগছে, কারণ সেই ক্ষেত্রে এটি প্রকৃতপক্ষে একটি অবরোধ-বাহিনী হিসাবে প্রতিভাত হবে। কিন্তু পলিটিক্যাল দপ্তর এ-বিষয়ে যতটুকু চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, তাতে কোন কাজ হয় নি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সমস্ত ব্যাপারটিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন কি না জানি নে, কিন্তু মনে হয় যাঁরা ভারতীয় সরকার গঠন করবেন তাঁরা এইখানে এই ধরণের অবরোধকারী একটি সৈন্যদল রাখতে অনিচ্ছুক নন। আমি প্রধান সেনাপতি অচিন্‌লেকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলাম। তিনি আমাকে গোপনে বলেছেন যতদিন সৈন্যবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপরে রয়েছে ততদিন আমাদের দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। এটা একটি ঠাণ্ডা সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছু নয়।

রাজপ্রতিনিধি [Crown Representive] এখনও রাজারই প্রতিনিধি। পনেরোই অগস্টের আগেই এই রাজ্য থেকে সমস্ত সৈন্য অপসারণ করার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে সরকারকে তিনি নির্দেশ দিতে পারেন।

ব্রিটিশ সরকারের দ্রুত অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে, কবে আর কী ভাবে ভারতীয় সৈন্য হায়দারাবাদ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে সেই সংবাদ জানার জন্যে সরকারীভাবে চিঠি লেখা হচ্ছে। উত্তরের জন্যে চিঠিতে একটি নির্দিষ্ট সময় দেওয়া থাকবে। সেই সময়ের মধ্যে যদি কোন উত্তর না আসে তাহলে স্টেট কী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, আর তার ফলই বা কী হবে সে সম্বন্ধে মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচিত হবে, সেই সঙ্গে অবরোধকারী সৈন্যবাহিনীকে এখানে থাকতে দেওয়া হবে কি না সে-সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠবে।

হায়দারাবাদের মনোভাবটা কী ধরনের জঙ্গী ছিল তারই কিছুটা নমুনা এখান থেকে পাওয়া যাবে। এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত কিছু বিবরণ যথাস্থানে দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। কিন্তু স্টেটগুলির এরকম

মনোভাব যে কতটা বিষময় হতে পারে সে কথা ভি. পি. মেনন স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন :

...that any decision which allowed the States to return to a state of complete political isolation was fraught with the gravest danger to the integrity of the country'

সেই জন্যেই তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন : The prophets of gloom predicted that the ship of Indian Freedom would founder on the rock of the States.

কথাটা যে কত বড় সত্যি তা পরবর্তী ঘটনাগুলির গতি আর প্রকৃতি লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায়। একটা দেহের ওপরে কয়েকশো বিষফোড়া গজালে যে অবস্থা দাঁড়ায়, তখনকার ভারতবর্ষের অবস্থা তার চেয়ে বিন্দুমাত্র ভাল ছিল না। কংগ্রেসের নেতারা যে উদ্দেশ্যে ভারতকে দ্বিধা-বিভক্ত করতে সম্মত হয়েছিলেন সে উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হবে কি না সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত হতে পারেন নি। স্টেটগুলিই যদি হাত-ছাড়া হয়ে যায় তাহলে আর থাকে কী?

স্যার কনরাড কোরফিল্ড এবং তাঁর চেলারা ভেতরে-ভেতরে মোক্ষম চাল চেলে যাচ্ছিলেন। যেমন সাহেবের ভাষায় ভারতের স্বাধীনতার তরীটিকে দেশীয়-রাজ্যের পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা দিয়ে চুরমার করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন কোরফিল্ড সাহেব !

হঠাৎ সে স্বপ্ন তাঁর চুরমার হয়ে গেল।

বিনামেঘে বজ্রপাতের মত কংগ্রেসের একটি মোক্ষম চাল ধরাশায়ী করল তাঁকে। এবারে যাঁর সঙ্গে তাঁকে সম্মুখ-সমরে নামতে হল তিনি কেবল ধূর্ত নন, লৌহমানব। তিনি হলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

বুনো ওলকে শায়েস্তা করতে হলে বাঘা তেঁতুলের দরকার হয়।

*[Ibid]

*[Integration of the Princely States]

কোরফিল্ড সাহেব যদি বুনো ওল হন, বল্লভভাই প্যাটেলকে তাহলে বাঘা তেঁতুল বলতে হবে। কংগ্রেস বেছে-বেছে শেষপর্যন্ত সর্দার প্যাটেলকেই স্টেট দপ্তরের সর্বময় কর্তার পদে বসিয়ে দিল।

কাজটা যে কঠিন, সর্দার প্যাটেলেরও অজানা ছিল না। কোরফিল্ড সাহেব যে কংগ্রেস-বিদ্বেষী, এবং ক্ষতি করার ক্ষমতা তাঁর যে অসীম তাও সর্দার বুঝতে পেরেছিলেন। সেই অল্প সময়ের ভেতরেই সাহেব যে গণ্ডগোলটি বাঁধিয়ে ফেলেছেন তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল ভদ্রলোক বেশ একটি এলেমদার ব্যক্তি।

কিন্তু তিনিও এদিক থেকে বড় কম যান না। বরং কোরফিল্ড সাহের যদি ডালে-ডালে ঘোরেন সর্দার প্যাটেল ঘোরেন পাতায় পাতায়। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন এখন ঘুষি বাগিয়ে চেঁচামেচি করে আর লাভ নেই। তাতে ফলটা খারাপ হতে পারে। বিশেষ করে জিন্না সাহেব তো তৈরী হয়েই বসে রয়েছেন! চালে একটু ভুল হলে রক্ষা থাকবে না আর।

স্টেট দপ্তরের ভার নিয়েই তিনি একটু ভেবে দেখলেন, তাকিয়ে দেখলেন চারপাশে। দিন তিনেক পরে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন ভি. পি. মেননকে, অনুরোধ করলেন স্টেট দপ্তরের সেক্রেটারী হওয়ার জন্যে। মেনন সাহেব তখন লর্ড মাউণ্টব্যাটনের কনস্টিটিউশন্যাল অ্যাডভাইসর।

পানগুনি মেনন ভাপাল, ছোট করে ভি. পি. মেনন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হস্তান্তরের ইতিহাসে যাঁর দান সবচেয়ে বেশী, যাঁর দক্ষতা সবচেয়ে মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়েছে তিনি হলেন এই ভি. পি. মেনন।

ভারতবর্ষের পথ-ঘাট-জনপদ যখন রাশি-রাশি রাজনীতিবিদদের কম্বুনাদে চকিত দিশেহারা হয়ে উঠেছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি-কাটাকাটিতে রক্তলোলুপ জানোয়ারের দল উন্মাদের মত প্রকাশ্য রাজপথে অথবা অলিতে-গলিতে তাথৈ-তাথৈ নৃত্য করছে,

কংগ্রেস আর মুসলীম লীগের মধ্যে পলিটিক্যাল দর-কষাকষি যখন জোর কদমে এগিয়ে চলেছে, ব্রিটিশ সরকার, এমন কি ধুরন্ধর সোসিয়ালিস্ট মাউণ্টব্যাটন সাহেব পর্যন্ত যখন হালে পানি পাচ্ছেন না, তখন প্রায় সকলের অলক্ষ্যে বসে পলিটিক্যাল দপ্তরের এই মানুষটি নিঃশব্দে সব সমস্যার সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য সমাধান করার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। এর বুদ্ধি দক্ষতা, আর অভিজ্ঞতা যে কতখানি তা ভাবতেও আমাদের বিস্ময় লাগে যখন আমরা দেখি বিলেতের স্কুল-কলেজের বিদ্যে তাঁর এতটুকু ছিল না, ভারতীয় রাজনীতি-বিদদের মত তিনি আইনজ্ঞও ছিলেন না, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখও তিনি কোনদিন দেখার সুযোগ পান নি। একমাত্র নিজের চেষ্টা, সাধনা, আর আত্মবিশ্বাসের ওপরে নির্ভর করে তিনি ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো-র রিফর্মস কমিশনার এবং কনস্টিটিউশন্যাল অ্যাডভাইসর হয়েছিলেন।

আঠারোশ উননব্বুই সালে মালাবার উপকূলের একটি সাধারণ জৈন পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পনের বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা দেন, এবং-পাসও করেন।

কিন্তু কোন সার্টিফিকেট পান নি তিনি। পান নি এইজন্যে যে অসুস্থ থাকার ফলে স্কুলের যাবতীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলতে পারেন নি তিনি। সেই ঘাটতি পুরণ করার জন্যে আরও একটি বছর স্কুলে পড়াশোনা করার নির্দেশ তাঁকে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে তাঁকে বলে দেওয়া হয় যে একটি বছর যথারীতি স্কুলে যাতায়াত না করলে তাকে কোন সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না।

ভাগ্যের মার দুনিয়ার বার। পড়াশুনা করার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না তাঁর। সংসারে তখন চরম অনটন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বাবা মারা গিয়েছেন। অনেকগুলি ভাই-বোন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। ভাইদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ

করতে হবে; বোনদের দিতে হবে বিয়ে। এমন অবস্থায় আরও এক বছর স্কুলে কাটানোর কথা তিনি চিন্তাও করতে পারলেন না। আরও হাজার হাজার হতভাগ্য কিশোরের মত রোজগারের ধান্দায় তাঁকেও ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হল।

কিন্তু চাকরি পাওয়া কি অত সহজ? তিনি লিখতে পারেন ভাল, বলতে পারেন ভাল। ইংরিজী বলেন চোস্ত, অঙ্কে মাথাটা তাঁর পরিষ্কার। বড় বড় হিন্দু ব্যবসাদারদের দরজায় বার বার তিনি ধর্ণা দিলেন, কিন্তু মুখ চুন করে ফিরে এলেন বার বার। ম্যাট্রিকিউলেসন পাশের সার্টিফিকেট পর্যন্ত যার নেই তাঁকে আবার চাকরি দেবে কে?

না, চাকরি দেওয়ার কেউ ছিল না তাঁর। ঘুরতে-ঘুরতে কিশোর মেনন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এমন সময় 'ম্যাড্রাস মেইল'-এ একটি বিজ্ঞাপন বেরোল। মহীশূরে কোলার সোনার খনিতে লোক চাই। লোক একটি নয়, দুটি, একজন কেরানী, আর একজন ঠিকেদার।

দুটি পদের জন্যেই দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন মেনন।

এবারে ডাক এল তার।

ম্যানেজার ছিলেন একজন ইংরাজ। মেননের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেশ খুশী হলেম ভদ্রলোক।

এখন আর দেওয়ার অপেক্ষা নয়, নেওয়ার অপেক্ষা।

কোন্‌টা নেবে বল? কেরানীর চাকরি? তা, খারাপ নয়, তাছাড়া, এ চাকরি অনেকদিক থেকেই নিরাপদ। পরিশ্রম করতে পারলে আখেরে তোমার ভালই হবে, মাইনে বাড়িয়ে দেব অনেক— বললেন ম্যানেজার সাহেব।

এবারে ভাবতে হল মেননকে। মনে-মনে হিসাব-নিকাশও করতে হল অনেক। চাকরিতে উন্নতি করা যে যায় না সেকথা সত্যি নয়, তবে বড়লোক হওয়া যায় না। লক্ষ্মীকে কায়েমী করে বাঁধতে গেলে চাই ব্যবসা। ঠিকেদারি করে রাতারাতি জুড়িগাড়ি হাঁকিয়েছে এমন

মানুষের সংখ্যা কম নেই, সেই রাতারাতি বড়লোক হওয়ার চেষ্টায় তিনি ঠিকেদারের কাজটা চাইলেন।

ম্যানেজার তাতেও খুশী।

ঠিক হল, কোম্পানীর তহবিল থেকে কিছু টাকা তাঁকে অগ্রিম দেওয়া হবে। সেই টাকা দিয়ে তিনি কুলি ভাড়া করবেন। সেই কুলিরা খনির ভেতরে নামবে, সেখান থেকে তুলে আনবে সোনা। মাসের শেষে কোন মাইনে পাবেন না তিনি, পাবেন কমিশন।

তাতেই রাজী হলেন মেনন।

ম্যানেজার উৎসাহ দিয়ে বললেন : যত খাটবে, রোজগার তোমার তত বাড়বে। তবে একটা কথা : বেশী রোজগারের আশায় কুলিদের বেশী খাটিয়ো না, তাহলে ওরা সব মরে যাবে।

তথাস্তু।

জোর কদমে কাজে লেগে গেলেন মেনন। কথায় রয়েছে না, ভগবান যাকে দেন তাকে ছপ্পর ফুঁড়ে দেন। মেননের কপালেও তাই ঘটল। শিসে নয়, লোহা নয়, কয়লা নয়, একেবারে সোনার খনি। যত তুলতে পারবে ততই তোমার মুনাফা বাড়বে। ধারে কারবার নেই এখানে ; একেবারে নগদ বিদায়।

প্রথম কয়েকটি সপ্তাহ কাজ বেশ ভালই চলল। সপ্তাহে প্রায় হাজার টাকার মত রোজগার হতে লাগল মেননের। নিশ্চিন্ত মনে দিলদরিয়া হয়ে বাড়িতে টাকা পাঠাতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু এ বরাত বেশী দিন টিকল না তাঁর।

রোজগার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কুলিদের জন্যে কিছু সুষ্ঠু নীতি চালু করলেন। তিনি তাদের র‍্যাশনের ব্যবস্থা বাড়িয়ে দিলেন। পুরো মাইনেতে অসুস্থ কুলিদের ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা তোলার নিয়ম ছিল সেই নিয়ম শিথিল করে দিলেন তিনি।

উদ্দেশ্যটা তাঁর ভালই ছিল ; কিন্তু ফলটা বিপরীত দাঁড়াল

কুলিরা তাদের মনিবকে চিনে নিতে দেরি করল না। তারা কাজের পরিমাণ কমিয়ে ফেলল। কষ্ট করে বেশী নীচে নামতে চাইল না তারা। যতটা ওঠার কথা ততটা সোনা উঠল না।

এক আধ দিন নয়; সপ্তাহের পর সপ্তাহ ওই একই ব্যাপার ঘটতে লাগল।

তিন মাস পরে হিসাব মেলাতে বসলেন মেনন; দেখলেন কোম্পানীর কাছে অনেক টাকা ধার হয়ে গিয়েছে তাঁর। ভয় আর দুর্ভাবনায় বুক তাঁর শুকিয়ে গেল। এ ঋণ তিনি শোধ করবেন কেমন করে? শেষ পর্যন্ত ওই কোম্পানীর কাছেই কি আবার তাঁকে কেরানীর চাকরি নিতে হবে?

কিন্তু সে আশাও পূর্ণ হল না তাঁর।

সাহেব ম্যানেজার একদিন তাঁকে ডেকে পাঠালেন, তিনি এলে তাঁর হাতে দু'শো টাকা দিয়ে বললেন, এই টাকা নিয়ে তুমি কাটো আর এ অঞ্চলে এসো না। এ পৃথিবী ভাল মানুষদের জন্যে নয়।

এ আঘাত তাঁর কাছে হয়তো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সাহেব ম্যানেজার তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, বাঙ্গালোরে একজন তামাকের ব্যবসাদারের কাছে একখানা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। দেখ; সেখানে যদি কিছু কাজ জোটে তোমার।

এর পরেও একটি বছর কেটে গেল। এই সময়টা তিনি কী করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। রোজগারের ধান্দায় চারপাশ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তবে রোজগার যে বিশেষ কিছু হচ্ছিল না তা তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। কোন রকমে ট্রেন-ভাড়াটি সংগ্রহ করে মালাবার যাওয়ার জন্যে গুটি-গুটি তিনি স্টেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটি ইংরাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। মেননকে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন। ভদ্রলোক দিল্লীর হোম ডিপার্টমেণ্টের একজন কর্তা। বম্বেতে তাঁর সঙ্গে মেননের

আলাপ হয়েছিল। মেননের দুরাবস্থার কথা শুনে নিজের দপ্তরে তিনি তাঁকে একটি চাকরি দিলেন।

এতদিন পরে মনের মত কাজ পেলেন মেনন! সেই কাজের মধ্যে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিলেন তিনি। উনিশ শো চল্লিশের মধ্যে ভারতের নানা জটিল সমস্যাগুলিকে তিনি এমন ভাবে রপ্ত করে ফেললেন যে দপ্তরে তিনি প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়লেন। কোন জটিল সমস্যা উঠলেই ডাক পড়ত মেননের।

ভারতীয় সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তিনি প্রচুর এবং সমস্যাগুলির সমাধান কেমন করে হতে পারে সে-সম্বন্ধেও চিন্তা তিনি কম করেন নি। ব্রিটিশ ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পরে ভারতীয় স্টেটগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক কী রকম হওয়া উচিত, সে-বিষয়েও তিনি একটি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। উনিশ শো একচল্লিশ সালেই, অর্থাৎ, স্বাধীনতা হস্তান্তরের প্রায় ছ-বছর আগেই, এবিষয়ে তিনি একটি পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছিলেন। সেই পরিকল্পনায় তিনি বলেছিলেন স্বাধীন ভারতের সঙ্গে কয়েকটি নির্ধারিত শর্তে [on a limited basis] স্টেটগুলির যোগদান করা উচিত। সেই শর্তগুলি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্টেটগুলি মোটামুটি স্বাধীন থাকবে, কিন্তু প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগ সংরক্ষণের ব্যাপার-গুলি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। তখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষকে ভাগাভাগি করার কথা কেউ চিন্তাই করে নি, কিন্তু তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষ ভাগাভাগি হোক আর নেই হোক, ব্রিটিশ ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেই তার সামনে যে সমস্যাটি জটিলতম হয়ে দেখা দেবে সেটি হচ্ছে রাজন্য সমস্যা, এবং তিনি এটাও জানতেন যে ভারতীয় রাজ্যগুলিকে যদি একই শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে না আনা যায়, তাহলে ভারত-শত বিভক্ত হয়ে পড়বে। সমগ্রভাবে ভারতের পক্ষে সেটা এক মহাদুর্দিন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

পরিকল্পনা খসড়া করেই তিনি চুপ করে বসেছিলেন না, তদানীন্তন ভাইসয়র লর্ড লিনলিথগোর হাতে সেটি দিয়েছিলেন। শোনা যায় লিনলিথগো সাহেব পরিকল্পনাটি তাঁর একান্ত 'ছোট কালো বাক্স'টির মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। এই বাক্সটিকে তিনি এক মুহূর্তও কাছ-ছাড়া করতেন না। তিনি সেটিকে টয়লেটে যাওয়ায় সময়েও কাছে রাখতেন। কিন্তু ওটি নিয়ে কোনদিন তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেন নি।

'Lord Linlithgow, the Viceroy, locked the plan away in his famous Little Black Box (which he was reputed to take with him to the toilet, in case some one tried to look inside) and never even acknowledged it.

এ বিষয়ে ভাইসরয়ের মন্তব্যটা কী তা জানার জন্যে তিনি নিশ্চয় কিছুটা উসখুস করেছিলেন। ভাইসরয়ও হয়তো তা বুঝতে পেরেছিলেন। মেননের বাসনাটি বুঝতে পেরে তিনি মনে-মনে হেসেছিলেন কি না জানি নে, কিন্তু একদিন তিনি তাঁকে সোজাসুজিই জানিয়ে ছিলেন : তুমি যতই আমার চারপাশে ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে বেড়াও না কেন, কাজ কিছু এগোবে না। তুমি ভেবেছ, সুযোগ এলেই তোমাকে আমি রিফরমস কমিশনার করে দেব, এই না? সে আশায় জলাঞ্জলি দাও। ও-পদ কোন ভারতীয়ের জন্যে নয়।

'It's very well for you to hang around, Menon, he said on one occasion, 'You expect me to make you Reforms Commissoner when the job comes up, don't you? You had batter get out of your mind. It is not a job for an Indian.'

কোন মন্তব্য করলেন না মেনন সাহেব। ভাইসরয়ের উপহাস তিনি নিঃশব্দে হজম করে গেলেন।

[The Last Days of British Raj—p. 94 : Mosley]

[The Last Days of British Raj—p. 94].

যথারীতি রিফরম্স কমিশনারের পদটি খালি হল, এবং ভাইসরয়ও যথারীতি তাঁর শ্বেতাঙ্গ নীতিটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে এইচ. ভি. হডসন নামক একটি ইংরাজ-সন্তানকে টেনে এনে মেনন সাহেবের মাথার ওপরে বসিয়ে দিলেন।

মেনন সাহেব এর কোন প্রতিবাদ করেন নি, মনক্ষুণ্ণ নিশ্চয় কিছুটা হয়েছিলেন, কিন্তু মুখে তিনি একটুও তা প্রকাশ করেন নি। সব মেনে নিয়েছিলেন। এমন কি হডসন সাহেবের সঙ্গেও কালক্রমে তাঁর একটা বেশ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই স্বেচ্ছাচারিতার ফলে লর্ড লিনলিথগোর ওপরে তাঁর শ্রদ্ধা স্বাভাবিকভাবে কমে এলেও, কেবল এরই জন্যে ব্রিটিশ সরকারের ওপরে তাঁর যে স্বভাবজাত একটি শ্রদ্ধা ছিল তা কমে নি।

তিনি জানতেন ধৈর্যের পরীক্ষায় তাঁকে পাসমার্ক পেতেই হবে। সুতরাং, অপেক্ষা তিনি করলেন, এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হলেন, তাঁর জীবনের আশা পূর্ণ হল।

উনিশ শো তেতাল্লিশ সাল। হডসন সাহেব লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিলেত চলে গেলেন। তাঁর শূন্য স্থানটি পূরণ করার জন্যে ভাইসরয় একটি দক্ষ ব্রিটিশ অফিসারের খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এমন একটি অফিসারও পাওয়া গেল না যাঁর ওপরে ওই কাজটির দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া যায়। তাঁর উপদেষ্টারা তাঁকে জানালেন যে ওই রকম গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্যতা তামাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একটি মাত্র মানুষেরই রয়েছে। তিনি হলেন ভি. পি মেনন। এক কথায় মেনন সাহেবই এদিক থেকে একমেবাদ্বিতীয়ম্।

নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করলেন লর্ড লিনলিথগো। রিফরম্স কমিশনারের পদটি গ্রহণ করার জন্যে তিনি ভি. পি. মেননকে আমন্ত্রণ জানালেন। ঠকেন নি তিনি। ভারত সরকারের অধীনে যে ক'জন প্রথম শ্রেণীর অফিসার রিফরম্স কমিশনারের পদটি অলঙ্কৃত

করেছিলেন, ভি. পি. মেনন তাঁদের মধ্যে নিঃসংশয়ে পয়লা নম্বরের। তারপর থেকে লর্ড লিনলিথগো এবং তাঁর পরবর্তী ভাইসরয়েরা সবাই তাঁর ওপরে নির্ভর করে এসেছেন। কোন দিনই তিনি হাঁক-ডাক করে কাজ করেন নি। তাই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আর স্টেটগুলির অন্তর্ভুক্তির মূলে তাঁর কর্মক্ষমতা যে কত বিরাট ছিল তা অনেকেই জানেন না। তাঁরই পরিকল্পনার [যেটিকে আমরা মেনন প্ল্যান বলি] ভিত্তিতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে, এবং স্টেটগুলির অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারেও তাঁর সক্রিয় সাহায্য না পেলে প্রায় ছ'শো স্টেট নিয়ে ভারত সরকারকে যে কী ঝামেলার মধ্যে পড়তে হত তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

ভি. পি. মেননের মত একজন সাধারণ ভারতবাসী কেমন করে যে ভারত সরকারের একটি প্রথম শ্রেণীর রাজপদ দখল করলেন তা ভাবতেই আমাদের কেমন আশ্চর্য লাগে। ভদ্রলোকের গায়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন ছাপ ছিল না। বলতে গেলে, একরকম পেছনের দরজা দিয়েই তিনি চাকরিতে ঢুকেছিলেন। তা ছাড়া অন্যান্য অনেক রাজনীতিবিদদের মত তাঁর মুখ আর মনের মধ্যে ফারাক ছিল। তিনি যা বলতেন সব সোজাসুজি। কাউকেই ছেড়ে কথা বলার বান্দা ছিলেন না তিনি। কেউ ভুল করেছেন বুঝতে পারলে তিনি যতবড় অফিসারই হোন না কেন, তাঁর মুখের ওপরে সেই ভুলটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে দ্বিধা করতেন না। অধিকাংশ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মত নিজেকে কোন দিনই তিনি উদ্ব্যস্ত থাকতে পারেন নি।

কিন্তু তাই বলে রগচটাও কম ছিলেন না। এদিক থেকে জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে তাঁর বেশ কিছুটা মিল ছিল। ভাব-প্রবণতাকে তিনি কোন দিনই এড়াতে পারেন নি। তবে জওহরলালের চেয়ে অনেক কম সময়ের মধ্যেই, অর্থাৎ, বড় ধরণের ক্ষতি হওয়ার আগেই, নিজেকে তিনি সামলিয়ে নিতেন।

তাঁর চরিত্রের এই দিকটির কথা বিশ্লেষণ করে লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁকে একটি চিঠি লিখেছেন :

Your only weakness which is shared by so many of the greatest in India, is that you lose your sense of balance in emotional periods. Fortunately, unlike many others, you yourself recover your balance long before any wrong decisions have been taken. You have been kind enough to attribute this recovery of your balance to my influence, but unless you have inherent stability in you. I could not have helped you".

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় উনিশ শো ছেচল্লিশ সালে। তারপর থেকেই দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মায়। পরস্পরের কর্মদক্ষতা, আর চারিত্রিক নিষ্ঠার ওপরে পরস্পরের অগাধ শ্রদ্ধা আর নির্ভরতা থাকার ফলেই স্বাধীনতা হস্তান্তরের শেষ কটা দিন চারপাশের বিপুল ঝড়ঝাপটার হাত থেকে ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনসাধারণ কোন মতে রেহাই পেয়েছিল। বিশেষ করে কোরফিলড সাহেবের মত একজন পয়লা নম্বরের ভারত-বিদ্বেষী ডাইহার্ড ব্রিটিশ রাজপুরুষের সমস্ত চাল যে শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, তার বারোআনা কৃতিত্ব ছিল ভি. পি. মেননের।

বেশ কিছুদিন ধরেই স্যার কনরাড কোরফিলডের ক্রিয়াকলাপ তিনি শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে আসছিলেন। তিনি দেশীয় রাজন্যবর্গকে হাড়ে-হাড়ে চিনতেন। তিনি জানতেন মেড়ারা যেমন খুঁটোর জোরে লড়াই করে, তেমনি দেশীয় রাজাদের যত পিঁড়িলাফ ওই কোরফিলড সাহেবের উসকানিতে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতীয় স্টেটগুলির মত

[The Last Days of British Raj. p. 95 Mosley]

একটি বিরাট অংশকে কিছুতেই ভারতীয় সরকারের মুঠোর বাইরে চলে যেতে দেওয়া যায় না। যদি দেওয়া হয় তাহলে বুঝতে হবে যে দুর্ভাগ্য ভারতের স্বাধীনতার জাহাজটিকে ষ্টেটের পাহাড়ের গায়ে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলতে বদ্ধপরিকর।

সে হয় না, সে কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। কোরফিলড সাহেবের সমস্ত কারসাজি ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে।

সর্দার প্যাটেলের আমন্ত্রণ তাই তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না।

কেন তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি'' গ্রন্থটিতে বিশদভাবে বলেছেন ঃ আমি সর্দারকে বললাম, আজ পর্যন্ত যত ছুটি আমার জমেছে সব নিয়ে পনেরই অগষ্ট থেকে আমি অবসর গ্রহণ করব—এই ছিল আমার অভিপ্রায়। উনিশশো সতের সাল থেকেই আমি কেবল শাসনতান্ত্রিক সংস্কার নিয়ে একটানা কাজ করে চলেছি। আমি কেন দিন ভাবতেও পারি নি যে আমার জীবদ্দশায় ভারতের স্বাধীনতা আসবে। সেই সম্ভবনা সার্থক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত আশা পূর্ণ হয়েছে। ...তার উত্তরে সর্দার বললেন, দেশের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমার মত মানুষের বিশ্রাম বা অবসর গ্রহণ করার কথা চিন্তা করাও উচিত নয়। সেই সঙ্গে তিনি একথাও জানালেন যে স্বাধীনতা হস্তান্তরের সময়ে আমি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেম, এবং সেই স্বাধীনতাকে সুসংবদ্ধ করার জন্যে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করাটা আমার অবশ্য কর্তব্য। স্বভাবতই আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা না করে বিরাট জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করাটাই আমার প্রথম কর্তব্য।

'I told Sarder that it was my intention to take all the leave I had earned and to retire from Government service after 15 August. Ever since 1917, I had been dealing with Constitutional reforms. I have never expected that I would

see freedom for India in my life-time. Since that had materialised, My life's ambition was achieved...Sardar told me that because of the abnormal situation in the country, people like myself should not think in terms of rest or retirement. He added that I had taken a prominent part in the transfer of power and that I should consider it my bounden duty to work for the consolidation of freedom. I naturally agreed that the country's interests, and not my personal predilections, should be the guiding factor'.

হাতে হাত মেলালেন ছুই ধুরন্ধর। ভি, পি, মেননের উর্বর মস্তিষ্কের সঙ্গে মিলিত হল সর্দার প্যাটেলের দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্ব, আর ব্যক্তিত্ব, আর সংগঠন পরিচালনা করার অসম্ভব কর্মদক্ষতা। ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হল কোরফিলড সাহেব আর তাঁর সাকরেদদের সঙ্গে।

স্বাধীনতা হস্তান্তরের শেষ দিনটি ধার্য হয়েছিল পনেরই অগষ্ট। 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্স বিলটি হাউস-অফ-কমন্সে উঠল চৌঠা জুলাই। সেই বিলটিতে স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে রাজাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ সরকারের যে সমস্ত চুক্তি হয়েছিল সেগুলির ভিত্তিতে পনেরই অগষ্টের আগে প্যারামাউন্টসি লোপ পাবে না। অবশ্য কোন দেশীয় রাজা ব্যক্তিগত কারণে তার আগেই যদি ভারতীয় কোন একটি ইউনিয়নের সঙ্গে যোগ দিতে চান সে অধিকার তাঁকে দেওয়া হবে।

এই সুযোগটিকে হাতিয়ার করে কোরফিল্ড সাহেব রাজাদের চোখ টিপে দিয়েছিলেন। রাজারাও বিপুল আস্থায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন; মাত্র ছ'টি সপ্তাহ; তারপরেই নেহেরু-প্যাটেলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তারা নিজের নিজের রাজ্যে শাহানশা বনে যাবেন।

[The Integration of the Princely States by V. P. Menon]

সর্দার প্যাটেলও কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন। রাজারা সত্যি সত্যিই যদি বেঁকে বসেন তাহলে পনেরই অগস্টের পরে নয়া শাসনতন্ত্রকে একেবারে নাজেহালে পড়তে হবে, আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে সব কিছুর। সৈন্য বল, রেলওয়ে বল, ডাক আর তার বিভাগ বল, শুল্ক বিভাগ বল, কারেনসী—সব কিছুর জন্যে নতুন ভাবে আলোচনা করতে হবে, চুক্তি করতে হবে প্রতিটি রাজ্যের সঙ্গে। এতদিন ভারত সরকারের সঙ্গে দেশীয় রাজাদের যে সব লিখিত আর অলিখিত চুক্তি ছিল, পলিটিক্যাল দপ্তর সে সব নাকচ করে দিচ্ছে। ভারত এখন ঘর সামলাবে, না, রাজাদের তোয়াজ করবে? ওদিকে পাকিস্থানের কাঁটা তো গলাতে বিঁধেই রয়েছে।

ভয় পাওয়ার কথাই বটে।

ভি. পি, মেননও প্রথমে একটু দমেই গিয়েছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি একটা পথ বাতলে দিলেন; বললেন: অত বিষয় নিয়ে প্রতিটি রাজার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মত অত সময় আমাদের হাতে নেই। আসুন, আমরা রাজাদের জানিয়ে দিই যে তিনটি দায়িত্ব ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়ে তাঁরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হোন।

কোন কোন দায়িত্ব?

প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক দপ্তর আর যোগাযোগে ব্যবস্থা। এগুলি বাদ দিয়ে সমস্ত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেই তাঁরা আগের মত স্বাধীন থাকবেন।

সর্বনাশ দরজার গোড়ায় হুমকি দিলে, অর্ধেক দিয়েও তার সঙ্গে একটা রফা করতে হয়। কিন্তু তাতেও যদি কোন কাজ না হয়?

সর্দার প্যাটেলের সন্দেহটা একেবারে অমূলক ছিল না। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু রাজা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে পনেরই অগস্ট থেকেই তাঁরা স্বাধীন হয়ে যাবেন শুধু বলেই ক্ষান্ত হন নি, রীতিমত মহড়াও শুরু করে দিয়েছেন।

সবই সত্যি, কিন্তু স্বাধীনতাটা তো আর একটা কথার কথা নয় যে বললাম আর হয়ে গেলাম!

মেনন সাহেব সেই কথাই বললেন: রাজী না হওয়ার পেছনে রাজাদের কোন যুক্তি নেই। এতদিন পর্যন্ত সবকিছু ঝুটঝামেলা থেকে ব্রিটিশ সরকারই ওদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনই হোক, বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই হোক, আইন-শৃঙ্খলা যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল ব্রিটিশ সরকারের। সেই ব্রিটিশ সরকার আজ চলে যাচ্ছে। এখন তাদের বাঁচাবে কে? অবশ্য একথাও মিথ্যে নয় যে এমন কিছু বড় স্টেট রয়েছে যারা নিজেদের সৈন্য দিয়েই আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখতে পারে, কিন্তু সেই সব স্টেটে যদি বড় ধরনের গোলমাল বাঁধে, বা দেশের লোকেরা গণ-আন্দোলনের ভেতর দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়ে বসে, বলে যে তারা ভারতের সঙ্গে যোগ দেবে, যদি সেই আন্দোলনের ফলে দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, রাজাদের জীবন আর ধন-সম্পত্তি বিপন্ন হয়ে ওঠে, তখন এক আমরা ছাড়া তাদের বাঁচাবে কে?

এতক্ষণে ভি. পি মেননের মনের কথাটা বুঝতে পারলেন সর্দার প্যাটেল। অনেক দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস লুকিয়ে সংগঠন গড়ে তুলেছিল। সর্দার প্যাটেল এক সময় নিজেই এদের সর্বময় কর্তা ছিলেন। প্রয়োজন হলে তাদেরই আবার কাজে লাগাতে হবে।

কিন্তু সে-ও তো অনেক ঝামেলার ব্যাপার। স্বাধীনতা মুঠোর মধ্যে এসে পড়ায় কংগ্রেস নেতারা বিপুল জনসাধারণ থেকে একটু একটু করে সরে আসছিলেন। আবার তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। দিল্লীর মসনদ ছেড়ে দেশীয় রাজ্যে ঘুরে বেড়ানোর মত নেতা তখন কোথায়? যে কাজটা স্বাধীনতা হস্তান্তরের মতই সহজ হয়ে দাঁড়াত সেইটাই দাঁড়াল রীতিমত জটিল হয়ে। সর্দার প্যাটেলের মতে এই অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টির জন্যে ব্রিটিশ সরকারই দায়ী। পনেরই অগস্ট প্যারামাউন্টসি লোপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কোন

দিক থেকেই সমীচীন হয় নি। এই প্যারামাউন্টসি লোপ পাওয়ার ফলেই স্বাধীন ভারতের নিরাপত্তা নষ্ট হতে বসেছে।

ভি. পি. মেনন তাতেও ঘায়েল হলেন না। তাঁর মতে প্যারা-মাউন্টসি লোপ করে ব্রিটিশ সরকার ভালই করেছে। ওটা ভারতের কাছে অনেকটা শাপে বর হয়েছে।

কী রকম?

এত দিন প্যারামাউন্টসির দৌলতে দেশীয় রাজারা অনেক সুযোগ-সুবিধে ভোগ করতেন। জঘণ্য রকমের দুর্বিনীত আচরণ অথবা রাজদ্রোহীতা ছাড়া তাদের ঘরোয়া ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার বিশেষ হস্তক্ষেপ করত না। নিজেদের রাজত্বে ওই সব রাজারা প্রচণ্ড বিক্রমে উপদেবতার মত ঘুরে বেড়াতেন। হাতে মাথা কাটতেন প্রজাদের। প্যারামাউন্টসি যদি ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়ে যেত তাহলে ভারতকেও রাজাদের সেই সব বিশেষ অধিকারগুলি স্বীকার করে নিতে হোত। কিন্তু এখন আর সে-রকম বাধ্যবাধকতা রইল না। নতুন করে শুরু করব আমরা। নতুন পরিস্থিতিতে কী ভাবে রাজাদের চলাফেরা করতে হবে সে সম্বন্ধে আমরা তাদের নতুন নির্দেশ দিতে পারব।

সর্দার প্যাটেল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মেননের দিকে। হ্যাঁ, মাথা বটে একখানা। সত্যিই তো, প্যারামাউন্টসি আইন-সঙ্গত ভাবে লোপ পাওয়ার পরে রাজাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যে সমস্ত লিখিত আর অলিখিত চুক্তি হয়েছিল সে সব চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এখন কেবল অপেক্ষা করা, মিষ্টি কথা বলে দলে ভিড়িয়ে আনার চেষ্টা করা; তারপর দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

শুরু হয়ে গেল কাজ! নরম আর গরম সুরে কথা বলতে লাগলেন কংগ্রেসী নেতারা। কারও গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন, চোখ রাঙালেন কাউকে বা।

জওহরলাল নেহেরু কড়া স্বরে জানিয়ে দিলেন: যদি কোন বিদেশী শক্তি কোন ভারতীয় স্টেটের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় তাহলে সেই বিদেশী শক্তিকে আমাদের শত্রু বলেই বিবেচনা করা হবে।

অমন যে সহনশীল গান্ধীজি তিনি পর্যন্ত হুঙ্কার দিতে লাগলেন: যদি কোন রাজা পনেরোই অগস্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে স্বাধীন ভারতের কোটি কোটি মানুষের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধঘোষণা করেছেন।

ইতিমধ্যে সর্দার প্যাটেল রাজাদের উদ্দেশ্য করে একটি বক্তব্য রাখলেন।

'This country with its institutions is the proud heritage of the people who inhabit it. It is an accident that some live in the States and some in British India, but all alike partake of its culture and character. We are knit together by bonds of blood and feeling no less than self-interest. None can segregate us into segments, no impassable barriers can be set up between us....

'We are at a momentous stage in the history of India.... ....Let not the future generations curse us for having had the opportunity but failed to turn it our mutual advantage. Instead, let it be our proud privilege to leave a legacy of mutually beneficial relationship which should rise this sacred land to its proper place amongst the nations of the world and turn it into an abode of peace and prosperity.'

বক্তব্যটি সহজ এবং সরল।

ভারতবর্ষের সবাই আমরা এক জাতি, এক প্রাণ, এক মন।

[G. I. Recsrds].

আমাদের ঐতিহ্য বিরাট, বিরাট আমাদের ভবিষ্যৎ। এত দিন আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল ব্রিটিশ সরকার। সেই সরকার বৃহৎ ভারতকে দুটি ভাগে ভাগ করে বিদায় নিচ্ছে ; পেছনে রেখে যাচ্ছে ভারতীয় নাগরিকদের ভেতরে অবিশ্বাস, হতাশা, আর বিভেদ। সেই আত্মবিধ্বংসী জালে আমরা যেন নিজেদের জড়িয়ে না ফেলি। আজ যদি আমরা ভেদবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে সংহত হতে না পারি তাহলেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এই অক্ষমতার জন্যে আমাদের কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

অতএব, আসুন, আর ভেদ নয়। বিরাট জাতি গড়ে তোলার কাজে আমরা সবাই একসঙ্গে এগিয়ে পড়ি।

শুধু বক্তৃতা দিয়েই থেমে গেলেন না কংগ্রেসের নেতারা। দেশীয় রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস সংগঠনের যে সব শাখা ছিল তাদেরও উসকে দিলেন! সেই সব সংগঠনগুলি স্থানীয় রাজাদের বিরুদ্ধে দল পাকিয়ে, হই-চই করে জানিয়ে দিল যে প্রয়োজন হলে ষ্টেটের সকল জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে তাদের বেশী সময় যাবে না ; সেই সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় এই কথাটাও তারা জানিয়ে দিল যে রাজাদের সম্পদ, সম্মান, আর প্রতিপত্তি বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করা ; সেটা যত তাড়াতাড়ি তাঁরা করতে পারবেন ততই তাঁদের পক্ষে মঙ্গল।

অর্থাৎ, হয় তোমরা কংগ্রেসের হাতে আত্মসমর্পণ কর, নতুবা, তোমাদের দফা আমরা রফা করে ছেড়ে দেব। দেখি, কে তোমাদের বাঁচায়।

এ-ত গেল কট্টরপন্থীদের হুমকি।

ওদিকে সর্দার প্যাটেল আবার মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলতে শুরু করলেন ; রাজাদের প্রচুর আশ্বাস দিয়ে ঘোষণা করলেন কেবল তিনটি বিষয়ে তোমরা আমাদের সঙ্গে চুক্তি কর ঃ প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক দপ্তর, আর যোগাযোগ, অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তোমাদের স্বাধীনতা

আমরা স্বীকার করে নেব। 'আমি একথা স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি যে ষ্টেটের কোন আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হাত দেওয়ার ইচ্ছে কংগ্রেসের নেই। কংগ্রেস রাজাদের শত্রু নয়; কংগ্রেস সব সময়ে চায় দেশীয় রাজ্যের প্রজারা তাদের নিজ-নিজ শাসনকর্তার অধীনে থেকে পরম সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করুক। একথাটাও আমি সেই সঙ্গে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে নতুন ভারতীয় দপ্তর এমন কোন কাজ করবে না যা থেকে মনে হতে পারে যে স্বাধীন ভারত ছলে-বলে কৌশলে কোন ষ্টেটের ওপরে প্রভুত্ব বিস্তার করতে চাইছে, যদি না অবশ্য সেটা পরস্পরের স্বার্থজড়িত হয়।'

'In other matters, we would scrupulously respect their autonomous existence...I should like to make it clear that it is not the desire of Congress to interfere in any manner whatsoever with the domestic affairs of the States. They [Congress] are no enemies of the princely order but on the other hand wish them and their people under their aegis all prosperity, contentment, and happiness. Nor would it be my policy to conduct relations of the new Department with the States in any manner which savours of domination of one over the other; if there would be any domination it would be that of your mutual interests and welfare.'

সোজা কথায়, প্যারামাউন্টসির ভাঁওতাবাজিতে পড়ে অনেকদিন তোমরা নাকানি-চোবানি খেয়েছ, এবারে এস, মিলে-মিশে আমাদের সঙ্গে এক হয়ে যাও। স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সহকর্মী হিসাবে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও।

বল্লভভাই প্যাটেলের মিষ্টি কথায় আর গান্ধী-নেহেরুর চোখ-

[G. I. Records as quoted by Michael Edwards—P. 203—The Last years of British India.]

রাঙানিতে, এবং স্থানীয় কংগ্রেস সংগঠনগুলির জুলুমবাজিতে একটা কথাই রাজাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে কংগ্রেসের সঙ্গে তাড়াতাড়ি একটা সমঝোতায় আসতে না পারলে অদূর অবিষ্যতে তাদের বিশেষ ঝামেলায় পড়তে হবে! এতদিন তারা স্বাধীনতালাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে মনের আনন্দে ডুগডুগি বাজিয়েছিল; সত্যিকার স্বাধীনতার পথে কত কঠিন অন্তরায় থাকতে পারে তা তারা বুঝতে পারেনি। যতই দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই তাদের সামনে সমস্যার পাহাড় জমে উঠল, ততই তারা শঙ্কিত হল অনাগত দিনগুলির জন্যে। যেসব কংগ্রেস-নেতাদের একদিন তারা কাগুজে বাঘ বলে মনে করেছিল এখন তারাই সত্যিকার বাঘের মূর্তি ধরে তাদেরই সিংহদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে।

সবই সত্যি, কিন্তু তবু রাজারা তখনই কোন সাড়া দিল না। বোঝা গেল সর্দার প্যাটেলের মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজে নি। ভিজবে কী করে? তখনও তারা একেবারে হাল ছেড়ে দেয় নি। তখনও তারা ব্রিটিশ সরকারের বন্ধুত্ব আর বদান্যতার ওপরে নির্ভর করে বসে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার নিশ্চয় তাদের জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দেবে।

সে-আশংকা কংগ্রেস-নেতাদেরও যথেষ্ট ছিল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার যে কী খেল খেলবে ভগবান জানে। সেই খেলা প্রথম চোটেই খতম করতে না পারলে ভারত শত-বিভক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কোন পথে এগুনো যায়? পথের ওপরে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওই স্যার কনরাড কোরফিল্ড—পলিটিক্যাল দপ্তরের অধিকর্তা। রাজাদের ওপরে সাহেবের প্রভাব অসামান্য। তাঁর প্রভাবটিকে নাকচ করতে না পারলে বিশেষ সুরাহা হবে বলে মনে হচ্ছে না।

কিন্তু কী করে তা সম্ভব? অন্ধকারে পথ হাতড়াতে লাগলেন কংগ্রেস নেতারা।

পাহাড় কাটাতে গেলে ডিনামাইট দরকার। সেই ডিনামাইট কোথায়?

ভি-পি-মেনন বললেন: আছে, এবং তা হাতের কাছেই।

কে?

লর্ড মাউন্টব্যাটন।

মাউন্টব্যাটন?

হ্যাঁ, তাঁকে যদি আমাদের দলে টানা যায় তাহলেই পাহাড় কাটানো সম্ভব হবে।

বিশ্বাস হয় না অনেক নেতার। তাতে কাজ হবে?

ভি-পি-মেনন বললেন: না হওয়ার কিছু নেই; অন্তত, হওয়ার সম্ভবনাটাই বেশী। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?

না, দোষ অবশ্য কিছু নেই; তবু…

বুঝিয়ে বললেন ভি-পি মেনন: তাঁর পদমর্যাদা, সহজাত মেধা ছাড়াও রাজবংশের সঙ্গে আত্মীয়তা দেশীয় রাজাদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য।

সর্দার প্যাটেল এ বিষয়ে মেনন সাহেবের সঙ্গে একমত হলেন, বললেন: তাহলে আর দেরী করে লাভ নেই। লর্ড মাউন্টব্যাটনের সঙ্গে আপনি তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন।

মেনন সাহেব সর্দারের সবুজ নিশানা পেয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সর্দারের সঙ্গে তাঁর যে-সব আলোচনা হয়েছিল এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটাই বা কী, সে-সব বিষয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটনের সঙ্গে তাঁর খোলাখুলি ভাবে আলোচনা হল। ষ্টেটগুলি যাতে মোট তিনটি বিষয়ে (প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, আর যোগাযোগ ব্যবস্থা) ভারতের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়, সেদিক থেকে তিনি তাঁর সহানুভূতি এবং সক্রিয় সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

'I proposed that the active co-operation of Lord Mountbatten should be secured. Apart from his position, his grace, and his gifts, his relationship to the Royal Family was bound to influence the rulers. Sardar wholeheartedly agreed and asked me to approach him without delay. A day or two later, I met Lord Mountbatten and mentioned to him my talk with Sardar and our tentative plan. I asked for his help in getting the States to accede to India on three subjects (defence, external affairs and communication)

তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে যে যথেষ্ট জোর রয়েছে তা প্রমাণ করার জন্যে মেনন অনেক তথ্য পরিবেশন করলেন, বিস্তার করলেন অনেক যুক্তি-তর্কের জাল, বললেনঃ এই রকম একটা ব্যবস্থা করতে পারলে রাজাদের কোন ক্ষতি হবে না ; কারণ, বর্তমানেও তাদের হাতে ওই তিনটি জিনিস নেই।

মাউন্টব্যাটন ঘাড় নাড়ালেন ঃ সেকথা সত্যি, কিন্তু তারা কি রাজী হবে ?

ভি-পি-মেনন বললেনঃ সে-দক্ষতা একমাত্র ভাইসরয় ছাড়া আর কার রয়েছে !

ভাবতে লাগলেন মাউন্টব্যাটন সাহেব।

বেশীক্ষণ ভাবার সুযোগ দিলেন না ভি-পি, ভাবাবেগটিকে উঁচু পর্দায় তুলে বললেনঃ দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভূক্ত করতেই হবে। পাকিস্তান বেরিয়ে যাওয়ার ফলে ভারতের যে বিরাট ক্ষতি হতে চলেছে সে-ক্ষতি পূরণ হবে কেমন করে ?

তবুও ভাবতে লাগলেন-লর্ড মাউন্টব্যাটন।

ভি-পি-মেনন মাউন্টব্যাটন সাহেবকে চিনতেন। তিনি বললেন ঃ এদিক থেকে আপনি যদি আমাদের সাহায্য করেন তাহলে ভারতের কোটি-কোটি মানুষ আপনার নাম চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

[V. P. Menon —The Integration of the Princely States.']

কথাটা মনে ধরল মাউণ্টব্যাটন সাহেবের। কিন্তু তখনই কিছু তিনি কথা দিলেন না, কেবল মাত্র বললেন : আচ্ছা, ভেবে দেখি।

উঠে এলেন ভি-পি-মেনন; কিন্তু দুর্ভাবনা গেল না, কারণ, মাউণ্টব্যাটনের দপ্তরের বদ বুদ্ধি দেওয়ার মত লোকের অভাব ছিল না তখন। কোথা থেকে কে তাঁর কানে ফুসমন্তর পড়ে দেবে কে জানে?

শেষ পর্যন্ত সেরকম কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। মাউণ্টব্যাটন রাজী হয়ে গেলেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন কংগ্রেসের নেতারা। মন্ত্রীসভার জরুরী বৈঠক বসল। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে দেশীয় রাজাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার পূর্ণ দায়িত্ব লর্ড মাউণ্টব্যাটনের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এ-সম্বন্ধে ভি-পি-মেনন বলেছেন :

I was seized momentarily by the fear that Lord Mountbatten might be adversely influenced by some of his advisers. But to my relief and joy he accepted the plan··· Nehru with the apporuval of the cabinet, entrusted Lord Mountbatten with the last of negotiating with the rulers on the question of accession and also with the task of dealing with Hyderabad.

কিস্তি মাৎ হয়ে গেল। লর্ড মাউণ্টব্যাটন ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিলেন।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন স্যার কনরাড কোরফিল্ড। শিরে হইল সর্পাঘাত, তাগা বাঁধব কোথায়? স্বয়ং ভাইসরয়ই যদি একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মেলান, তাহলে রাজাদের বাঁচাবে কে? অবশ্য তাঁর ওপরে স্যার কনরাডের কোনদিনই বিশেষ একটা আস্থা ছিল না; এখন প্রকাশ্যভাবে তাঁর এবং পলিটিক্যাল দপ্তরের

(V. P. Menon—Integration of the Princely States.)

বিরুদ্ধে রণাঙ্গণে নামতে দেখে তিনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বার বার মাউন্টব্যাটনকে জানালেন যে ইচ্ছে করলে রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন ; হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান—এ ছুটির কোন ডোমিনিয়নেই যোগ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা তাঁদের নেই ; অন্তত ইণ্ডিপেনডেনস বিল সেই কথাই বলে।

কিন্তু মাউন্টব্যাটনকে বোঝানো গেল না। তিনি বিলটির অনুশাসনের ভেতরেই কাজ করতে শুরু করলেন। পনেরোই অগস্ট ছুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্যারামাউন্টসি লোপ পাবে। তার আগে কোন রাজাকে জোর করে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করা হবে না ; কিন্তু কোন রাজা যদি ইচ্ছে করে যোগ দেয় ? তার বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেনস বিলের বলার কিছু রয়েছে ?

কিছু যে নেই সেকথা স্যার কনরাডও জানতেন, কিন্তু তাতে বা সুরাহাটা হচ্ছে কোথায় ? মাউন্টব্যাটনের মিষ্টি কথার টোপ যদি ছু-চারটে রাজাও গিলে ফেলে তাহলেই কাজ শেষ। ঝাড়ে-বংশে লোপাট হয়ে যাবে সব।

মাউন্টব্যাটনের নীতিটি যে ব্রিটিশ-নীতি বিরোধী সেই কথাটা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর কাজের কঠোর সমালোচনা করেছেন (অবশ্য অনেক পরে) :

'In order to make this proposal [the Instrument of Accession] less unpalatable, he [the Viceroy] had persuaded Mr. Patel to agree that adherence would be limited to the sphere of Defence, External Affairs and Communications, with a definite promise that no financial lialbility would be involved and that in no other matters would the new Dominion encroach upon the internal autonomy or the sovereignty of the States.'

[p. 195-196, Mosley—The last days of the British Raj.]

অর্থাৎ, সমস্ত প্রস্তাবটিকে কম অরুচিকর করার জন্যে কয়েকটি বিষয়ে প্যাটেলকে তিনি রাজী করিয়েছিলেন। প্রথমত, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক দপ্তর, এবং যোগাযোগ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে রাজাদের অন্তর্ভুক্তি দাবি করা হবে না। দ্বিতীয়ত, এর জন্যে রাজাদের রাজস্ব থেকে একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না; তৃতীয়ত, আর কোন দিক থেকে নতুন রাষ্ট্র রাজাদের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা বা রাজ্যের সার্বভৌমত্বের ওপরে হাত দিতে পারবেন না।

স্যার কনরাড জানতেন—ওই তিনটি বিষয়ই যথেষ্ট। এর পরের ঘটনাগুলি নিজেদের স্বাভাবিক গতিবেগেই দৌড়ে চলবে। সামরিক শক্তি যার হাতে তাকে ঠেকাবে কে? ঠেকাতে যে পারে নি তার নজির পরবর্তী ঘটনাবলী। তাই তিনি ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছেন সমস্ত ব্যাপার জেনেও কী করে যে ভাইসরয় তাঁর ওপরে নির্ভরশীল রাজাদের এই রকম একটা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলেন সেইটাই বড় আশ্চর্যের কথা।

'For the Viceroy to use his influence, built upon the past exercise of Paramountcy, in order to persuade the trusting Rulers to accept such dubious propositions was, to say the least, un-British'.

কিন্তু মাউন্টব্যাটনের অন্য যুক্তি ছিল, তিনি বেশ ভালভাবেই জানতেন যে প্যারামাউন্টসি লোপ পাওয়ার আগেই দেশীয় রাজ্যগুলিকে তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে; আর সেটা তাদের নিজেদেরই স্বার্থে। অন্যথায় স্বাধীনতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলিতে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেবে; কেন্দ্র থেকে সহসা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ছত্রাকার হয়ে পড়বে তারা, আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাবে সব।

জওহরলাল নেহেরু আর সর্দার প্যাটেলেরও অভিমত তাই।

জিন্না সাহেব অন্য মত পোষণ করেন। এদিক থেকে তাঁর

ব্যস্ততা নেই। করাচীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রয়োজন হলে প্রতিটি স্বাধীন রাজার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে খোলাখুলি ভাবে আলাপ করতে তিনি রাজী। তার আগে নয়; এবং তা-ও, পরস্পরের হৃদয়-বিনিময়ের ভেতর দিয়ে সম্ভব হলেই তবে। এদিক থেকে তাড়াতাড়ি করার কোন যৌক্তিকতা তিনি দেখেন নি।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কোনদিনই জিন্নাপ্রীতি ছিল না। ওই রোগা লিকলিকে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরোদস্তুর কেতাবী, স্বল্পভাষী, ঋজু মানুষটিকে তিনি কেমন যেন সহ্য করতে পারতেন না। সুতরাং তাঁর মতবাদকে আমল দিলেন না তিনি; স্যার কনরাডকে নির্দেশ দিলেন ভারতের সমস্ত রাজা-মহারাজা, অথবা তাঁদের প্রতিনিধিদের ভাইসরয়ের দিল্লীর প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানাতে।

উদ্দেশ্য কী কোরফিলড সাহেবের তা অজানা ছিল না; তবু তিনি তা জানতে চাইলেন।

ওই সভাতেই আমি অনুরোধ জানাব যাতে প্যারামাউন্টসি লোপ পাওয়ার আগেই তাঁরা ভারতীয় য়ুনিয়নের সঙ্গে যোগ দেন।

দাঁতে দাঁত চেপে ভাইসরয়ের নির্দেশনামা নিয়ে স্যার কনরাড কোরফিলড বেরিয়ে গেলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ঝামেলা মিটেছে। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানে ভাগ হয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষ। শুরু হয়েছে ভাগাভাগির পালা। ব্রিটিশ ভারতের দিকে-দিকে দর-কষাকষির উত্তেজনা বাড়ছে। বিলেত থেকে এসেছেন সিরিল র‍্যাডক্লিফ জমি-জায়গা ভাগ করার জন্যে। ওদিকে আর করার কিছু নেই তাঁর।

এখন তিনি ভারতীয় রাজাদের একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন।

তাঁর প্রেস-উপদেষ্টা অ্যালেন ক্যাম্পবেল-জনসন তাঁর 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' গ্রন্থে তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন:

'Mountbatten is now in the thick of the States Problem. As with his diplomacy prior to the June 3 plan, he took a calculated risk and is personally sponsoring the Instrument of Accession and undertaking to get all the Princes into his particular bag, while V. P. sold the project to Congress. He embarked with the assurance of Patel's decisive support.'

স্টেটের কাগজপত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে অবাক হয়ে গেলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটন। ওরে বাবা, এ যে গভীর অরণ্য। এর মাটিতে কোনদিনই সূর্যের আলো পড়েনি; নিভাঁজ অন্ধকারে তলদেশ আচ্ছন্ন। কাঁটাগাছ, ঝোপ-ঝাড়ে বোঝাই। এগোলেই বিপদ।

স্টেটে যে সমস্যা অনেক তা তিনি জানতেন; কিন্তু সে-সমস্যা যে এত গভীর তা হয়তো তিনি বুঝতে পারেন নি।

তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন স্যার বি, এন, রাও।

সারা ভারতে কতগুলি দেশীয় রাজ্য আছে জানেন? প্রায় ছ'শো। এদের মধ্যে তিনশো সাতাশটি রাজ্যের গড়পড়তা পরিমাণ হচ্চে কুড়ি বর্গমাইলের মত। আর লোকসংখ্যা? হাজার করে। বাৎসরিক আয়? ধরুন হাজার পাউণ্ডের কাছাকাছি। প্যারামাউণ্টসি লোপ পাওয়ার পরে এরাই সব হবে এক-একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র।

এই স্বাধীনতার অর্থ কী?

স্যার বি, এন, রাও-এর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মাউণ্টব্যাটন সাহেব।

এতদিন পর্যন্ত এই সব ছোট-ছোট স্টেটের রাজাদের ক্ষমতা ছিল নগণ্য। প্রজাদের তাঁরা বড়জোর তিন মাস জেলে পাঠাতে পারতেন। স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের ক্ষমতা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে জানেন? তাঁরা প্রজাদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারবেন। যাকে বলে হর্তা-কর্তা-বিধাতা, তাই হয়ে যাবেন তাঁরা।

রাও সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কি একটা কথার মত কথা, না কাজের মত কাজ?

সেকথা সত্যি—মনে-মনে স্বীকার করে নিলেন মাউন্টব্যাটন। আরশোলাকে টেনে-টুনে পাখি করা যায় না।

রাও সাহেব তাঁর মগজে দুঃসংবাদটা ঢুকিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন তিনি। কালবিলম্ব না করেই তিনি ভারত-সচিবকে তার পাঠালেন! সমস্ত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করুন। রাও সাহেবের মতের সঙ্গে আমি একমত! প্যাটেলের যুক্তির সারবত্তা এখন আমি বুঝতে পারছি। তিনশো সাতাশটির মত ছোট ছোট জমিদারদের দুটি ডোমিনিয়নের মধ্যে যে-কোন একটির সঙ্গে যোগ দেওয়াটা বাধ্যতামূলক করা হোক।

ফেরত তার পাঠালেন ভারত-সচিব: অসম্ভব। বিলের একটি শব্দেরও আর রদবদল করা যাবে না। প্যারামাউণ্টসি নাকচ হওয়ার নীতিটি পূর্ববৎ অপরিবর্তিতই থাকবে।

দেশীয় রাজ্যগুলি তাতে যদি জাহান্নামে যায় তাহলেও?

হ্যাঁ, তা হলেও। ওর আর নড়চড় হবে না।

ও-কে।

মুখে কিছু বললেন না মাউন্টব্যাটন সাহেব। মনে-মনে গেলেন ক্ষেপে। স্যার কনরাড কোরফিল্ড ভেতরে-ভেতরে কী কাজ করার জন্যে যে সেবারে লণ্ডনে গিয়েছিলেন সেটা এতদিন পরে পরিষ্কার করে বুঝতে পারলেন তিনি।

পলিটিক্যাল দপ্তরের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক প্রায় খতম হয়ে গেল।

স্যার কনরাড তাঁর কাছ থেকে সরে গেলেন অনেক দূরে।

লর্ড মাউন্টব্যাটন তাঁর সমস্ত বুদ্ধি, শক্তি, আর সাহস নিয়ে বাজপাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজাদের ওপরে। ভাইসরয় হিসাবে তখনও তিনি ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিভূ, এবং দেশীয়

রাজন্যবর্গের একমাত্র কর্ণধার। স্যার কনরাড তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী।

কাজে-কর্মে সেইটাই তিনি বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে। উপদেষ্টা পরিষদের তালিকা থেকে অলিখিতভাবে নামটা তাঁর খারিজ হয়ে গেল।

পঁচিশে জুলাই, উনিশ শো সাতচল্লিশ সাল।

দিল্লীতে ভাইসরয়ের মসনদে সেই ঐতিহাসিক সম্মেলন বসল।

ভারতীয় রাজন্যবর্গের ইতিহাসে দিনটি হল স্মরণীয়, তাদের বিলুপ্তির দিন।

লর্ড ম্যাউন্টব্যাটনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতেই হবে তাঁকে।

তারই মহড়া শুরু হল পঁচিশে জুলাই।

সেদিন লর্ড মাউন্টব্যাটেনই হচ্ছেন একমাত্র নায়ক। আগামী রাজসূয় যজ্ঞের একমাত্র পুরোহিত। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের মত এক-একটি রাজা সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন। কোরফিলড সাহেব জুল-জুল করে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

একে জুলাই মাস, তার ওপরে দিল্লী। আবহাওয়ার অবস্থাটা একবার বিবেচনা করুন। সেদিন তার মেজাজটা আরও এক ধাপ উঁচুতে। ব্যারোমিটারের মাপ ১০৮·৪ ডিগ্রী। সেই যে কথায় রয়েছে না, 'লোলুপ চিতাগ্নি শিখা লেহি-লেহি বিরাট অম্বর', সেদিন দিল্লীর অবস্থাটাও প্রায় সেই রকম। আগুনের হলকায় চারপাশ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। রাজারা জানতেও পারেন নি সেই আগুনে তাঁদের অনেক যত্নে গড়া তাসের প্রাসাদও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

স্যার কনরাড কোরফিলড তাঁদের সাবধান করে দেন নি। তিনি জানতেন, লর্ড মাউন্টব্যাটন পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে রাজী নন। তবু ব্রিটিশ সরকারের প্রতিভূ হয়েও তিনি যে প্রকাশ্যেই তার নীতিকে বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এমন আশঙ্কা তিনি স্বপ্নেও করতে

পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন, মাউণ্টব্যাটন সাহেব তাঁদের উপদেশ দেবেন, অনুরোধ জানাবেন। জোর করে কিছু করার সাহস তাঁর হবে না। কারন, আইন তাঁর বিরুদ্ধে। এই কথাটাই এতদিন ধরে তিনি রাজাদের পাখি পড়িয়ে এসেছেন। কুছ পরোয়া নেহি।

রাজারাও বিপুল সংখ্যায় বিপুলতর হর্ষধ্বনির মধ্যে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্যারামাউণ্টসি লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজারা সব স্বাধীন হয়ে যাবেন তাঁর এই আশ্বাস সত্যি বলেই মনে হয়েছিল তাঁদের। কেবল ক'টা দিন চুপ করে বসে থাকা। সুতরাং মাউণ্টব্যাটনের ধাক্কায় তাঁরা যে ছত্রাকার হয়ে পড়বেন এটা তিনি ভাববেন কেমন করে?

কিন্তু মাউণ্টব্যাটনকে কোরফিলড চিনতে পারেন নি, পারলে, ঘোড়া ডিঙিয়ে তিনি ঘাস খেতে যেতেন না। এদেশের রাজাদেরও তিনি বুঝতে পারেন নি, পারলে, কতগুলি 'কাগজে আঁকা' বাঘকে আস্ত 'রয়্যাল বেঙ্গল' বলে ভুল করবেন না।

জমজমাট সভা। ভারতের চারপাশ থেকে রাজা-মহারাজা এবং তাঁদের প্রতিনিধিরা হাজির হলেন। এলেন পাতিয়ালার মহারাজা যাবভিন্দ্র সিং, গোয়ালিয়রের মহারাজা জিভাজি রাও সিন্ধিয়া, নবনগরের মহারাজা জামসাহিব রঞ্জিৎ সিং, বরোদার মহারাজা প্রতাপ সিং গাইকোয়াড়, এলেন বিকানীরের মহারাজা সাদুল সিং এবং আরও অনেকে।

মাউণ্টব্যাটন তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা আর সেই সঙ্গে তাঁর বহুঘোষিত মোহিনী শক্তি নিয়ে দরবার 'হলে' হাজির হলেন। ভাইসরয়ের পূর্ণ রাজকীয় পোশাক তাঁর দেহে, মেডেল এবং বহু কৃতিত্বের স্মারকচিহ্নগুলি তাঁর বুকের ওপরে আঁটা ছিল। দেখলে মনে হবে দেহের প্রতিটি অঙ্গে তিনি রাজার আত্মীয়, এবং স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় রাজাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আর ভবিষ্যতের ধারক এবং বাহক।

সেদিন লর্ড মাউণ্টব্যাটন যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সে-সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ক্যাম্পবেল জনসন লিখেছেন :

He used every weapon in his armoury of persuation, making it clear at the outset that in the proposed Instrument of Accession, which V. P. Menon had devised, (the Princes) were being provided with a political offer from Congress which was not likely to be repeated...He reminded them that after the 15th of August he would no longer be in a position to mediate on their behalf as Crown Representative, and warned those Princes who were hoping to build up their own store of arms that the weapons they would get would in any case be obsolete.

অর্থাৎ যত রকমের অনুরোধ-উপরোধ করা যায় তাদের কোনটিই তিনি বাদ দেন নি। সেই সঙ্গে কিছুটা ভয় দেখাতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। প্রথমেই তিনি তাঁদের বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন, ভি, পি, মেনন রাজ্য অন্তর্ভূক্তির যে চুক্তিটি উপস্থাপিত করেছেন সেটি আসলে কংগ্রেসের একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব। রাজারা এই প্রস্থাব গ্রহণ করতেও পারেন, নাও পারেন। এদিক থেকে কোনরকম বাধ্য-বাধকতা তাঁদের নেই। তবে রাজারা যদি এটিকে প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে দ্বিতীয়বার এই সুযোগ তাঁদের দেওয়া হবে না।

তিনি তাঁদের আরও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে পনেরোই অগস্টের পরে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে রাজাদের পক্ষ নিয়ে আর কিছু মোকাবিলা করার আইন-সঙ্গত অধিকার তাঁর থাকবে না।

একটু চুপ করে রইলেন তিনি। রাজাদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। মুখগুলি তাঁদের সাদা হয়ে আসছে,কুঞ্চন দেখা গিয়েছে কপালের ওপরে।

[Mission with Mountbatten].

মুখ খুললেন তিনি। আপনাদের মধ্যে যাঁরা প্রয়োজনে ভারত সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য নিজেদের গুদোমে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছেন, তাঁরা যেন মনে রাখেন যে কার্যকালে সেই সব অস্ত্রশস্ত্র পুরনো হয়ে যাবে।

অর্থাৎ ভারত সরকার এমন সব নতুন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠবে, যাদের তাঁরা নাম শোনেন নি।

সমস্তটাই ভয়ের ব্যাপার, সোজা কথায়, হুমকি। সুতরাং ভালভাবে যদি রাজত্ব করতে চাও তাহলে এই তার সুবর্ণ সুযোগ। ভাবনা-চিন্তা, শলা-পরামর্শ করার, জোট পাকিয়ে জট পাকানোর সময় আর নেই। সুতরাং কী করবে চটপট করে ফেল।

একেই বলে বুকের ওপরে বন্দুকের নল বসিয়ে আপসের প্রস্তাব করা। হয় সই কর, না হয়, গোল্লায় যাও।

অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন রাজারা। ভেবেছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটনই তাঁদের শেষ সম্বল। তিনি কেবল ভাইসরয় নন, বিলিতি রাজবংশের নীলরক্ত তাঁর শরীরে; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভাষায়, তাঁদের স্বগোত্র। তিনি নিশ্চয় আসন্ন বিপদ থেকে তাঁদের বাঁচাবেন, উদ্ধার করবেন কংগ্রেসী গুণ্ডাদের হাত থেকে। কিন্তু অহো ভাগ্যম্! সেই মাউন্টব্যাটন তাঁদের জওহরলাল-প্যাটেলের খপ্পরে ফেলে দেওয়ার জন্যে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বহুবার ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। রক্ষকই যদি ভক্ষক হয় তাহলে বাঁচার পথটা কোথায়?

অবশ্য আশার কথা, কংগ্রেসের কাছে সর্বসত্ত্ব বিলিয়ে দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে রাজাদের তিনি একবারও অনুরোধ করছেন না। বলছেন, মাত্র তিনটে বিষয়ের (প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক দপ্তর, আর যোগাযোগ) দায়িত্ব রাজারা কংগ্রেসের ওপরে ছেড়ে দিন; বাকি সমস্ত বিষয়ে তাঁরা আগের মতই স্বাধীন থাকুন। সেই সঙ্গে রাজাদের তিনি এই আশ্বাসও দিয়েছেন যে এর জন্যে রাজাদের পাই-পয়সা

খরচ করতে হবে না; এবং ভারতীয় গণতন্ত্র কোনদিন দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যাপারে হাত দেবে না, বা, তাদের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করবে না।

লর্ড মাউন্টব্যাটনের সব আশ্বাসগুলিই যে অন্তঃসারশূন্য, রাজাদের ফাঁদে ফেলে কার্যোদ্ধার করার কৌশল মাত্র, সে-বিষয়ে স্যার কনরাড কোরফিলডের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারত তার আশ্বাসের ইজ্জৎ কতটা রাখবে, আদৌ রাখবে কি না, সে-সম্বন্ধে হলফ করে কেউ বলতে পারে না। এতদিন ধরে জওহরলাল যে সব হুমকি দিয়ে এসেছেন, তাদের কিছুটাও যদি সত্যি হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে রাজারা যে বিপদে পড়বেন সে-কথা কংগ্রেসের রাজ-নীতি সম্বন্ধে যার কিছুটা জ্ঞান রয়েছে সে-ই বুঝতে পারবে। নিরপেক্ষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটনও যে স্বজ্ঞানে কংগ্রেসের সেই জঙ্গী নীতিটাকেই প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করছেন—এরই জন্যে কনরাড কোরফিলড পরে তাঁকে un-British বলে অভিযুক্ত করেছিলেন।

ব্রিটিশ-নীতিবিরোধীই হোন বা যাই হোন, লর্ড মাউন্টব্যাটন কিন্তু বিবেকের দিক থেকে পরিচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই বিশ্বাস করতেন যে দেশীয় রাজ্যগুলির নিরপেক্ষ অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ভারত বা পাকিস্তান—দুটির যে কোন একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের যোগ দিতেই হবে। অন্যথায় সারা ভারতে একাধিক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের সৃষ্টি হবে।

এই কথাটা ব্রিটিশ সরকারেরও অজানা ছিল না, অজানা ছিল না লর্ড মাউন্টব্যাটনের। এই জন্যে প্রথম দিকে তিনি রাজাদের যুগপৎ লোভ আর ভয় দেখিয়েছিলেন। তিনি এপর্যন্ত বলেছিলেন যে রাজারা যদি কোন একটি সরকারে যোগ না দেন তাহলে স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁরা কমনওয়েলথের বাইরে চলে যাবেন, তখন মহামান্য সম্রাটের দেওয়া খেতাব থেকে বঞ্চিত হবেন তাঁরা। লোভের মধ্যে ছিল মহামান্য সম্রাটের প্রস্তাব: ছোট-ছোট রাজাদেরও 'হাইনেস'

খেতাব দেওয়া হবে, এবং তাঁদের আর তাঁদের আইন-সঙ্গত পত্নী বা বিধবাদের সম্মান দেখানোর জন্যে কামান দাগা হবে ন'বার।

সেদিনের সেই সভায় লর্ড মাউন্টব্যাটন আবার সেই প্রস্তাবগুলি তুলতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর উপদেষ্টা জর্জ অ্যাবেল বাধা দিয়েছিলেন। তার একমাত্র কারণ, ওই সম্মান আগে থেকেই ভোগ করে আসছেন সেই সব বড়-বড় রাজাদের কাছে ওই ধরনের প্রস্তাব আদৌ লোভনীয় হবে না। তাছাড়া, মুড়ি-মিছরির দর এক হয়ে গেলে মিছরির ইজ্জত তাতে বাড়বে না; বরং কমে যাবে।

এগিয়ে এলেন সর্দার প্যাটেল; বললেন: মাভৈ! আপনাদের আমরা অনেক সুযোগ-সুবিধা দেব, আর সেই সঙ্গে দেব প্রচুর পরিমাণে ভাতা—এই ভাতার নাম হবে 'প্রিভিপার্স', খেতাব দেব রাজপ্রমুখ, উপরাজপ্রমুখ, এবার আপনারা নির্ভয় হোন।

রাজকীয় সুযোগ-সুবিধে কী?

সুযোগ-সুবিধে হচ্ছে, রাজপ্রাসাদ থাকবে আপনার নিজস্ব; আপনাদের আয়ের জন্যে কোন আয়কর দিতে হবে না, বিদ্যুৎ আর জল সরবরাহ করা হবে বিনা পয়সায়; মোটরগাড়িতে একটি বিশেষ ধরনের লাল প্লেট বসাতে পারবেন, সেই সঙ্গে গাড়ির মাথায় উড়াতে পারবেন আপনাদের নিজ-নিজ স্টেটের পতাকা। বিদেশ থেকে আসার সময় শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা তাঁদের ব্যক্তিগত জিনিস পত্রপরীক্ষা করতে পারবেন না; আদালতে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের হাজিরা দিতে হবে না। কোন মহারাজার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে ভারত সরকারের অনুমোদন নিতে হবে।

এই শেষ? না, আরও রয়েছে।

আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ব্রিটিশ আমলে তাঁরা যে সুযোগ-সুবিধে পেতেন এখনও তাই পাবেন। 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হবে তাঁদের এবং যে পথ দিয়ে তাঁরা রাজভবনে যাবেন সেই পথের ওপরে লাল

কার্পেট পেতে দেওয়া হবে। তাঁদের প্রাসাদগুলি পাহারা দেওয়ার জন্যে মিলিটারি গার্ডও তাঁরা রাখতে পারবেন।

এছাড়া আরও সুযোগ-সুবিধে রাজাদের জন্যে বরাদ্দ করা হল।

একমাত্র সরকারী মণিমুক্তা [সেগুলি হচ্ছে স্টেটের সম্পত্তি] ছাড়া মহারাজারা তাঁদের ব্যক্তিগত মণিমুক্তা নিজেদের ব্যবহারের জন্যে রাখতে পারবেন। এগুলির মূল্য কোটি-কোটি টাকা। অন্তর্ভুক্তির সময়ে রাজা-মহারাজারা কেবল ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়েই খুশি হন নি। স্টেটের অনেক মূল্যবান সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছিলেন। এই সম্পত্তির মধ্যে ছিল ডায়মণ্ড, রুবি, এবং অন্যান্য মূল্যবান পাথর। এদের মূল্য কয়েক কোটি টাকা। দামী-দামী পাথরগুলি সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় মেকীপাথর রেখে দিয়েছিলেন তাঁরা, সেইগুলিই তাঁরা, ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বরোদার মহারাজা এদিক থেকে আরও এক কাঠি সরেস ছিলেন। সাতটি মুক্তোর হার যার দাম হচ্ছে দু-কোটি টাকা, এবং তিনটি বহুমূল্য পাথর-বসানো বিখ্যাত হীরের হার ছিল বরোদা স্টেটের। এগুলির নাম হচ্ছে 'স্টার অফ দি সাউথ', 'ইউজিন' এবং 'সাহী আকবর'। সেই সঙ্গে ছিল মুক্তাখচিত দুটি বিরাট কার্পেট। হিসাব করার সময় হঠাৎ দেখা গেল জিনিসগুলি নিখোঁজ হয়েছে। সর্দার প্যাটেল সবই বুঝতে পারলেন; কিন্তু ইচ্ছে করেই চোখ দুটি বন্ধ করে রেখেছিলেন তিনি। মওকা লুটেছিলেন স্টেট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষেরা।

যাক গে ; যা বলছিলাম।

সাধারণ রাজ্যগুলির সম্বন্ধে যতটা দুর্ভাবনা ছিল, তার চেয়ে অনেক দুর্ভাবনা ছিল হায়দারাবাদকে নিয়ে। ভাইসরয় জানতেন, এবং কংগ্রেসও তা জানত, যে শেষ পর্যন্ত ওই হায়দারাবাদই একটা ঝামেলা বাধাবে। রাজ্যটি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে যে প্যারামাউন্টসি লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বাধীন হয়ে যাবে, অর্থ, সৈন্য আর মগজ কোনটারই কমতি নেই তার। নিজামের ঘরে ভাঙন ধরানোর জন্যে

মাউন্টব্যাটনের সুপারিশে মহামান্য রাজা জানালেন যে সুবিধে বুঝলে নিজামের দ্বিতীয় পুত্রকে 'হিজ হাইনেশ' উপাধি দাও।

সব ক'টি টোপই ফেললেন। ভয়ে-দুর্ভাবনার মুখ শুকিয়ে গেল রাজাদের। ডিনারের নিমন্ত্রণ করে এনে সোজা গ্যাস-চেম্বারে ঢুকিয়ে দিলে যে রকম অবস্থা হয়, রাজাদের অবস্থাও তার চেয়ে কিছু কম দাঁড়াল না। চেম্বার অফ প্রিন্সেস এর 'লড়কে লেঙ্গে' ভাবটা ইতিমধ্যে উধাও হয়ে গিয়েছে। ভোপালের নবাবের 'নহী ছোড়েঙ্গে' আস্ফালনটাও স্তিমিত হয়ে এসেছে। ভেঙে প্রায় চুরমার হয়ে গিয়েছে রাজাদের জোট। বিকানীরের মহারাজা ইতিমধ্যে কয়েকটি বড-বড় স্টেটের সঙ্গে জোট পাকিয়ে ঘোষণা করেছেন যে স্বাধীনতা হস্তান্তরের আগেই তাঁরা ভারতীয় ফেডারেশনে যোগ দেবেন।

ঠিক এই রকম একটা ছন্নছাড়া অবস্থায়, রাজারা নিজের নিজের সুবিধে আদায় করার চেষ্টায় ইতস্তত দৌড়ে বেড়াতে লাগলেন। কোরফিলড-এর দৌলতে যেটুকু আশ্বাস তাঁরা পেয়েছিলেন, পঁচিশে জুলাইয়ের সম্মেলনে মাউন্টব্যাটনের সামনে দাঁড়িয়ে সেটুকুও তাঁরা হারিয়ে ফেললেন। সামনে সাঁপ আর পেছনে বাঘ। রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। তবু, রাবণের চেয়ে রামের হাতে মরলে হয়তো আখেরে কিছুটা সদগতি হতে পারে এই ভেবে তাঁরা অযথা আর কালবিলম্ব না করে চুক্তিপত্রে সই করার জন্যে লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

তবে সবাই নয়। এই লাইন থেকে যারা সরে দাঁড়াল, তাদের মধ্যে ছিল হায়দারাবাদ, ট্রাভাঙ্কোর, ভোপাল, যোধপুর, ইন্দোর আর জুনাগড়।

হায়দারাবাদকে যে টোপ গেলানো যাবে না লর্ড মাউন্টব্যাটন তা আগেই জানতেন। প্রথম রাউণ্ডে তিনি নিজাম বাহাদুরের সঙ্গে প্যাঁচ কষতে রাজী হলেন না। তাই হায়দারাবাদকে বাদ দিয়ে অন্যান্য স্টেট থেকে একটি করে প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

কেন ডেকে পাঠালেন সে-সম্বন্ধে অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু তিনি বললেন না। তবে বুঝতে কারও বিশেষ অসুবিধে হয় নি। বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে প্রতিনিধিরা ভাইসরয়ের নিজস্ব মন্ত্রণা-কক্ষের ভেতরে ঢুকে গেলেন ; কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন, কেউ বা ঘামতে ঘামতে, কেউ বা চোখ মুছতে মুছতে।

যে-সব প্রতিনিধিরা মাউন্টব্যাটনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ট্র্যাভাঙ্কোরের দেওয়ান স্যার রামস্বামী আয়ার একজন। তিনি কিছু শুনতে আসেন নি, এসেছিলেন কিছু বলতে। সেই কথাটাই বলে গেলেন তিনি ঃ ট্র্যাভাঙ্কোরের মহারাজা ভারতের নয়া সরকারের কাছে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবেন না। পনেরোই অগস্টের পর থেকেই স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন তিনি। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর কোন আঁতাত থাকবে না।

মহারাজার আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করলেন তিনি।

জিজ্ঞাসা করলেন ভি-পি-মেনন : আপনার মহারাজার স্টেটে যে কমিউনিস্টরা গিজ-গিজ করছে তা কি জানেন ?

(স্বাধীনতার পরে এই স্টেটটি কেরালার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।)

ঘাড় নাড়লেন দেওয়ানজি। অর্থাৎ, তা তিনি জানেন।

পনেরোই অগস্টের পরে এরা যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে ? দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন মেনন সাহেব।

দেওয়ানজি কোন উত্তর দিলেন না ; কেবল তেরচা চোখে তাকিয়ে রইলেন একটু।

দেওয়ানজির ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য না করে নিজের বক্তব্যটিকে আরও পরিচ্ছন্ন করে তুললেন ভি-পি-মেনন : আপনি বলছেন পনেরোই অগস্টের পরেই ট্র্যাভাঙ্কোরের মহারাজা স্বাধীন হয়ে যাবেন। উত্তম কথা। কিন্তু তখন যদি কমিউনিস্টরা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে, মহারাজার সিংহাসন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, তখন তাঁকে ঠেকাটা দেবে কে ?

অর্থাৎ, ভগবান না করুন, তেমন কোন বিপদ ঘটলে কার কাছে সাহায্য চাইবেন? ভারতের কাছে? আপনি নিশ্চয় জেনে রাখুন, স্বাধীন ভারত আপনার মহারাজাকে তখন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবে।

ওই রকম একটি আশঙ্কা করার মূলে কোন সত্য ছিল, না ওটি কেবলই একটি ভড়কিবাজি, তা আমরা জানিনে; কিন্তু ট্র্যাভাঙ্কোরের দেওয়ান ওসব বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা করতে রাজী হলেন না। মহারাজার বক্তব্যটি যথাযথ ভাবে লর্ড মাউণ্টব্যাটনের কাছে পেশ করে তিনি স্বস্থানে ফিরে গেলেন। ফিরে গেলেন বটে, তবে বহাল তবিয়তে নয়। কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা এগিয়ে আসছে দেখে বেশ শঙ্কিতভাবেই ফিরে গেলেন তিনি।

রাজা-মহারাজাদের মতিগতি দেখে ভেবে পড়ল কংগ্রেস। যতই দিন যাচ্ছে, ততই ব্যাপারটা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। কিন্তু সর্দার প্যাটেল ঘাবড়ালেন না তাতে। তিনি আর ভি-পি-মেনন শক্ত হাতে দাঁড় বাইতে লাগলেন। হাল ধরে রইলেন স্বয়ং মাউণ্টব্যাটন।

স্টেট দপ্তরটিকে মোটামুটি একটা আয়ত্বের মধ্যে এনে মহীরুহের গোড়ায় আঘাত হানার জন্যে তৈরি হলেন মেনন। গুপ্তচর-বাহিনীর কাছ থেকে তিনি সংবাদ পেলেন যে স্যার কনরাড কোরফিল্ড আর তাঁর সাকরেদরা ভোপাল এবং অন্যান্য কয়েকটি স্টেটের রাজাদের নিয়ে শেষ বারের মত একটি প্রতিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টায় রয়েছেন।

কংগ্রেসের স্টেট দপ্তর ব্যাপারটাকে মোটেই সুনজরে দেখল না। যে কোরফিল্ড সাহেব মাউণ্টব্যাটনকে পর্যন্ত ল্যাং দিয়ে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' বিলটি পাস করিয়ে নিয়েছিলেন, এবং যিনি রাজাদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চিরটা কাল ক্ষেপিয়ে এসেছিলেন, তাঁকে এ সময়ে ভারত সরকারের পলিটিক্যাল দপ্তরের শীর্ষস্থানে বসিয়ে রাখার বিপদ যে কতখানি সেটা বুঝতে কংগ্রেসী নেতাদের কোনরকম অসুবিধে হয়

নি। ঘরের মধ্যে দুধ-কলা দিয়ে জাতসাপ পুষে রাখার কোন অর্থ নেই।

শোনা যায়, কোরফিল্ড সাহেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিলেন মেনন নিজে। সাহেবের ওপরে তাঁর রাগ ছিল প্রচণ্ড। বেশ কিছুদিন আগে কোন একটি প্রথম শ্রেণীর দেশীয় রাজ্যে একজন দেওয়ানের দরকার হয়েছিল। সেই পদের প্রার্থী ছিলেন মেনন নিজে। প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, সেই পদটি তিনি পান নি। গুজব, ঐ কোরফিল্ড সাহেবই তখন প্রবল বাধা দিয়েছিলেন। সে-অপমান তখন তিনি নিঃশব্দে হজম করেছিলেন। এবারে সেই অপমান তিনি কোরফিল্ড সাহেবকে সুদ-শুদ্ধ ফিরিয়ে দিলেন।

তিনি সোজাসুজি মাউণ্টব্যাটন সাহেবের কাছে হাজির হলেন, কোরফিল্ড সাহেবের অনুগত চেলারা যে অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত রয়েছেন তা সাক্ষীসাবুদ দিয়ে প্রমাণ করলেন, তারপরে বললেন: আমার পক্ষে এভাবে কাজ করা আর সম্ভব নয়। হয় স্যার কনরাড কোরফিল্ড থাকবেন, না হয়, আমি থাকব। আমাদের দুজনের একজনকে আপনি বেছে নিন।

কিছুদিন আগে হলেও, এ বিষয়ে তিনি কিছুটা হয়তো চিন্তা করতেন। কিন্তু তখন আর কিছু চিন্তা করার ছিল না, ছিল না কিছু বাছাবাছির। সর্দার প্যাটেল আর ভি-পি-মেননের সঙ্গে একই পথের যাত্রী তিনি। কোরফিল্ড সাহেবকে তিনিও আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি কোরফিল্ড সাহেলকে তলব করে বললেন: আর নয়, এবার তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেল।

কোরফিল্ড সাহেবের খেল খতম হয়ে গেল। নিষ্কণ্টক হল স্টেট দপ্তর।

মিথ্যা বলে লাভ নেই, নিতান্ত অসম্মানের সঙ্গেই ভারতীয় রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে হল তাঁকে। কিছুদিন আগে বম্বেতে রাজাদের যে সম্মেলন বসেছিল, সেদিনও তাঁর প্রতাপ ছিল দুর্দান্ত।

সেদিনও তাঁর ডাক কোন স্টেটই অবহেলা করতে পারে নি। কিন্তু বিদায় নেওয়ার দিন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সেদিন তিনটি স্টেটের প্রতিনিধি ছাড়া আর কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন নি।

কোরফিল্ডের পরাজয় মেননের ব্যক্তিগত বিজয় ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু তাই বলে ঝামেলার শেষ হল না তাতে। বরং শুরু হল বলা যায়।

পঁচিশে জুলাইয়ের ঐতিহাসিক সম্মেলন একদিকে যেমন আশার সৃষ্টি করল, অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টি করল জটিলতা, মন-কষাকষি, দর-কষাকষি, অসংখ্য তিক্ততা। সবাই বুঝল স্টেটের রাজাদের খাঁচায় পোরা অত সহজ ব্যাপার নয়।

বিকানীরের মহারাজা ঝড় ওঠার আগেই অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নিলেন, ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির চুক্তিতে সই করে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে আপস রফায় এলেন। এগিয়ে এলেন বরোদার মহারাজা। চুক্তিতে সই করলেন। অনেক দিনের প্রিয়জনকে চিতায় তুলে দিয়ে মানুষ যেমন অসহায়ের মত আর্তনাদ করে ওঠে, বরোদার মহারাজও চুক্তিপত্রে সই করে ফুঁপিয়ে উঠলেন। তিনি মেননের গলা জড়িয়ে ধরে শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন।

শুরু হল একটির পর একটি রাজ্য বা রাজ-প্রতিনিধির শোকযাত্রা। কেউ অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নিলেন খেলোয়াড় মনোবৃত্তি দেখিয়ে; কেউ বা মেনে নিলেন কাপুরুষের মত। বলিদানের বাজনা বেজে উঠল চারপাশে। মহারাজা শিবাজীর স্বপ্ন বুঝি সফল হতে চলেছে। নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছেন রাজন্যবর্গ।

কিন্তু যতটা নিঃশব্দে ভাবছি ততটা নিঃশব্দে কাজ শেষ হল না। কিছু রাজা ঘাড় বাঁকিয়ে সরে দাঁড়ালেন। লোভ দেখিয়ে তোয়াজ করে খোঁয়াড়ের মধ্যে ঢোকানো গেল না তাঁদের। ট্র্যাভাঙ্কোর,

কাশ্মীর, হায়দারাবাদ, মহীশূর, ভোপাল, যোধপুর আর পশ্চিম ভারতীয় উপকূলের ছোট একটি কাথিয়াড় স্টেট জুনাগড়ের নবাব।

স্যার রামস্বামী আয়ার ট্র্যাভাঙ্কোরের দেওয়ান। দিল্লীতে মাউণ্টব্যাটনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি স্টেটে ফিরে গেলেন। মেননের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল তা সব তিনি মহারাজার কাছে নিবেদন করলেন। ভাবনার কথাই বটে। কমিউনিস্টদের আন্দোলন নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল মহারাজকে। স্বাধীনতা হস্তান্তরের পরে সেই ঝামেলা যদি সশস্ত্র অভ্যুত্থানে রূপায়িত হয় তাহলে তাঁকে বাঁচাবে কে? যে-পরিমাণ সামরিক বাহিনী থাকলে ওদের উৎখাত করা যায়, মহারাজার তা কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। একমাত্র সাহায্য করতে পারে ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হলে বিপদের দিনে মহারাজাকে যে একটা কানাকড়ি দিয়েও সে সাহায্য করবে না, সেকথা ভি-পি-মেনন স্পষ্টাস্পষ্টিই বলে দিয়েছেন।

তা ছাড়া, ওই সব স্টেট কংগ্রেসের চেলাদের। ওরাই বা কমতি কিসের! সব কংগ্রেসের হুকুমদার। ওরাও শাসিয়ে রেখেছে মহারাজা যদি বেয়াড়াপনা করেন তাহলে পয়লা অগস্ট থেকে সারা স্টেটের মধ্যে তুলকালাম বাঁধবে।

বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়লেন ট্র্যাভাঙ্কোরের মহারাজা।

দেখা যাক ভড়কি দিয়ে কিছু করা যায় কি না!

মহারাজা মাউণ্টব্যাটনকে জানিয়ে দিলেন: ঠিক আছে; আমি ভারতের সঙ্গে যোগ দেব কথা দিলাম, কিন্তু লেখাপড়া কিছু করব না। আশা করি, মহারাজার মুখের কথার দাম চুক্তিপত্রে সই করার চেয়ে অনেক বেশি।

মাউণ্টব্যাটন সাহেব ধান দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন একথা কেউ বলবে না। তিনি সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন—উঁহু। শুকনো

কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। সই করতে হবে ছাপানো চুক্তিপত্রে।

মাউণ্টব্যাটনের টেলিগ্রামখানি পেয়ে মহারাজ উচ্চবাচ্য করলেন না।

মহারাজার দোনামোনা দেখে ভি-পি মেনন আর সর্দার প্যাটেল শলা-পরামর্শে বসলেন। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পরেই কলকাঠি নাড়িয়ে দিলেন সর্দার প্যাটেল। স্টেট পিউপিলসের গুপ্ত সংগঠনের নেতা ছিলেন সর্দার প্যাটেল।

সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাভাঙ্কোরের কংগ্রেসী সংগঠনের কার্যকরী সমিতি মাটির তলা থেকে বেরিয়ে এসে মহারাজার বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন জাগিয়ে তুলল। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বেরুল, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মহারাজার মুণ্ডপাত করল, শ্লোগানে শ্লোগানে ফাটিয়ে দিল আকাশ। স্টেটের পুলিসদের সঙ্গে তাদের মারপিট চলল, রাস্তার ওপরে উঠল অবরোধ, আগুনের ধোঁয়ায় আর বারুদের গন্ধে ট্র্যাভাঙ্কোরের আকাশ গেল ভরে।

তাতেও মিটল না। কে বা কারা স্যার রামস্বামী আয়ারের পিঠে ছোরা বসিয়ে দিয়ে গেল।

ব্যস, ওই এক ছোরাতেই মহারাজ কাত। আন্দোলনকারীরা পরোক্ষে জানিয়ে দিয়ে গেল এখনও যদি টালবাহানা কর, তাহলে ওই ছোরা তোমার বুকে গিয়ে বসবে। খুব সাবধান।

আর বলতে হল না মহারাজাকে। প্রাণে বাঁচলে তবে তো রাজ্য-সম্পদ।

মহারাজ তার পাঠালেন ঃ এখনই সই করছি চুক্তিপত্রে। এই সব ঝুটঝামেলাগুলোকে হটানোর ব্যবস্থা করুন।

সর্দার প্যাটেলও তৈরি হয়েই বসেছিলেন। মহারাজা চুক্তিপত্র সই করার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন, উত্তেজনা সব একেবারে ম্যাজিকের মত থেমে গেল।

যে-সব রাজারা তখনও পর্যন্ত করছি-করব বলে ধোঁয়ার আড়ালে চুপচাপ বসে থেকে ট্র্যাভাঙ্কোরের মহারাজার পিঁড়িলাফ দেখছিলেন, তাঁরা আর কালবিলম্ব না করে চুক্তিপত্রে সই করে দিলেন। কংগ্রেসও দেখিয়ে দিল ইচ্ছে করলে সে জোর করে অনেক কিছুই করতে পারে, করে না যে সেটা হল তার মহানুভবতা। কিন্তু তোমরা যদি তার সুযোগ নাও, তাহলে তোমাদের ঝাড়ে-বংশে লোপাট করে দিতে সে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

যাক, কুয়াশা প্রায় পরিষ্কার হয়ে এল।

কিন্তু যতটা তাড়াতাড়ি ভাবা গিয়েছিল ততটা তাড়াতাড়ি হল না।

খবর এল, কোরফিল্ড সাহেবের চেলারা আবার মামদোবাজি শুরু করেছে। সেই যে কথায় রয়েছে না, সিন্দুক ভাঙতে না পার, ঘটি-বাটি যা পাও তাই হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়, গৃহস্থের ক্ষতি কিছু করতেই হবে। কোরফিল্ড সাহেবের চেলারা সেই ঘটিটা-বাটিটা নিয়ে কেটে পড়ার তালে রইল।

যোধপুরের মহারাজা হনোবন্ত সিং। বয়সে যুবক, একেবারে আরবী ঘোড়ার মত তেজীয়ান। জীবনটাকে তিনি কানায় কানায় ভোগ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। মদ, মেয়েমানুষ, আর পোলো এই তিনটি জিনিসই ছিল তাঁর জীবনের সঙ্গী। দুহাত ভর্তি করে তিনি টাকা খরচ করতেন, শৃঙ্খলার পরোয়া তিনি কোনদিনই করতেন না, স্ফূর্তি করাটাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

এঁর পূর্বপুরুষদের কথা বলতে গিয়ে মস্‌লে সাহেব তাঁর একটি গ্রন্থে বলেছেনঃ শোনা যায় এই বংশেরই একটি মহারাজা একবার লর্ড আর লেডী কার্জনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ছিল প্রায় দুশোর মত। তাঁদের প্রত্যেককে তিনি একটি করে কৌটো দিয়েছিলেন। সেই কৌটোর ঢাকনি খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে একটি করে ছোট রঙীন পাখি ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। পাখিগুলি

মধুরকণ্ঠী ফিঙ্গে জাতীয়। লেডী কার্জন পরে বলেছিলেন তাদের মধ্যে একটি ফুড়ুৎ করে উড়ে এসে তাঁর টায়রার ওপরে বসেছিল।

হনোবন্ত সিং তাঁর চেয়েও এককাঠি সরেস, ওসব দিকে এঁর লক্ষ্য ছিল না, ছিল এমন সব দিকে যেখানে অর্থ অপচয়ের সুযোগ অনেক বেশি। রাজত্ব পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি বেপরোয়া ছিলেন। জনপ্রিয় সরকার গঠন করার কথা চুলোয় থাক, কোন আইন-কানুনই তিনি মানতেন না। এক কথায় দুর্দান্ত প্রকৃতির রাজা ছিলেন এই হনোবন্ত সিং।

অনেক রাজা-মহারাজার মত কংগ্রেসের ওপরে হনোবন্ত সিংয়ের কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন একবার কংগ্রেসের খপ্পরে পড়লে তাঁর সমস্ত সুযোগ-সুবিধে নষ্ট হবে, বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ।

অথচ লর্ড মাউণ্টব্যাটনের ইচ্ছেটাকেও তিনি সরিসরি নাকচ করে দিতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। কে জানে, শেষ পর্যন্ত যদি ভরাডুবি হয়ে যায়।

কী করবেন ভাবছেন এমন সময় কোরফিল্ডের চেলারা তাঁর কানে ফুসমন্তর দিয়ে দিল : পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিন না কেন?

কিন্তু যোধপুরের প্রজারা যে হিন্দু।

তাতে কিছু যায় আসে না। পাকিস্তান যোধপুরের লাগোয়া।

ভারতবর্ষও যোধপুরের লাগোয়া।

সত্যি কথা, কিন্তু মাউণ্টব্যাটনের নির্দেশ মত আপনি আপনার স্টেটের লাগোয়া ভারত অথবা পাকিস্তান যে-কোন রাষ্ট্রেরই অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। আইনের দিক থেকে কোন বাধা নেই তাতে। তাছাড়া, কংগ্রেসের চেয়ে জিন্নাসাহেব অনেক বেশি বিবেচক।

সে একটা কথা বটে। মনস্থির করার আগে জিন্নাসাহেবকে একবার বাজিয়েই দেখা যাক না, ক্ষতি কী? অন্তত, কংগ্রেসের সঙ্গে দর-কষাকশিরও একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

ছুটলেন যোধপুরের মহারাজা হনোবন্ত সিং জিন্নাসাহেবের কাছে। সঙ্গে নিলেন আর একটি রাজপুত স্টেট জয়সলমিরের মহারাজকুমারকে। তাঁরও রাজ্যের পাশ থেকেই পাকিস্তানের সীমানা শুরু হয়েছে। তাঁর রাজ্যের প্রজারাও হিন্দু, কংগ্রেসের ওপরেও তাঁর আস্থা নেই বললেই হয়।

যুগল মূর্তিকে দেখে জিন্নাসাহেব তো আনন্দে আত্মহারা। হিন্দু রাজারা তাঁর শরণাপন্ন হবেন এমন কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। কিন্তু পাকিস্তান যে পাওয়া যাবে তেমন কথাও কি তিনি কোন দিন সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবতে পেরেছিলেন? সবই ওই কংগ্রেসের দৌলতে পাওয়া; ভুলের মাসুল দিতে হয়েছে কংগ্রেসকে। কিন্তু তবু জিন্না-সাহেবের আপসোস যাচ্ছেন না। পাঞ্জাব আর বাংলার অর্ধেকটা ছেড়ে দিতে হয়েছে তাঁকে। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্য বলতে এক কাশ্মীর ছাড়া প্রায় সবগুলিই হিন্দু রাজ্য। দু দশটিতে যে মুসলমান নবাবজাদারা রয়েছে তাঁদের প্রজারাও হিন্দু, এবং তাঁদের স্টেটগুলিরও চারপাশে ভারতের হিন্দু সরকার। সুতরাং দেশীয় রাজারা যে তাঁর দলে ভিড়বেন, এমন আশা তাঁর ছিল না। কংগ্রেস যখন দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে গরম-গরম বক্তৃতা দিচ্ছিল, তখন তাই তিনি রাজাদের পক্ষে অনেক ভাল কথা বলেছেন। তিনি জানতেন এই ভাল কথা বলার জন্যে দাম তাঁকে এক পয়সাও দিতে হবে না, মান তাঁর অনেক বেড়ে যাবে।

বাড়লও তাই; অন্তত সেই রকমই ভাবলেন তিনি। এদের যদি কোন রকমে খাঁচায় পোরা যায়, তাহলে, আরও কিছু পাশাপাশি রাজপুত রাষ্ট্র যে আসবে না এমন কথাও হলফ করে বলা যায় না। যদি আসে, তাহলে পাঞ্জাব আর বাংলার ক্ষতিটা পুষিয়ে নেওয়া যাবে, আর সেই সঙ্গে টাইট দেওয়া যাবে কংগ্রেসকেও।

ড্রয়ারের ভেতর থেকে একখানা সাদা কাগজ বার করে যোধপুরের মহারাজার সামনে ধরে এবং নিজের ফাউন্টেনপেনটি এগিয়ে দিয়ে

জিন্নাসাহেব বললেনঃ মহারাজ, আপনি কোন্ শর্তে পাকিস্তানে যোগ দিতে রাজী রয়েছেন, সেগুলি এই কাগজে লিখে দিন। আমি তার নীচে সই করে দেব।

কাগজটি নেওয়ার আগে জয়সলমিরের মহারাজকুমারের দিকে তাকিয়ে যোধপুরের মহারাজা জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমার সঙ্গে আপনিও সই করবেন তো?

জয়সলমিরের মহারাজা বললেনঃ সই করতে পারি; কিন্তু এক শর্তে।

শর্তটি কী?

হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে যদি কখনও দাঙ্গা বাঁধে, তাহলে আমি হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দেব না। এই শর্তটি লিখিত ভাবে মেনে নিতে হবে।

জিন্নাসাহেব বরাভয় হস্ত প্রসারিত করলেনঃ মা ভেতব্যম্, মা ভেতব্যম্। তা দিতে যাবেন কোন্ দুঃখে?

অর্থাৎ, হিন্দু-মুসলমানে লড়াই আর হবে না, কেন হবে? পাকিস্তানই যখন মিলে গেল তখন হিন্দুদের সঙ্গে আর বিবাদ কিসের? হিন্দুরাও সুখে থাক, মুসলমানরাও সুখে থাক, এই সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না।

জিন্নাসাহেবের কথার মধ্যে সততা কতটুকু ছিল তা ভাববার মত সুযোগ আমাদের নেই, কিন্তু যোধপুরের মহারাজা হঠাৎ ভাবতে শুরু করলেন। সাদা কাগজখানার ওপরে কালির কোন আঁচড় তাঁর চোখে পড়ল কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু কাগজখানা হাতে ধরতে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। হাজার হোক তিনি হিন্দু রাজা, রাজপুত বংশের রক্ত তাঁর শিরায়-শিরায় বইছে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা চিরকালই মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করে এসেছেন। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহেবী কেতাতে পোক্ত হয়েছেন সত্যি কথা, জাতির কুসংস্কার তাঁকে আর ততটা আচ্ছন্ন করতে পারে না, সেকথাও মিথ্যে নয়, তবু

নিজের জাতভাইদের পরিত্যাগ করে তিনি মুসলমানদের দলে ভিড়ে যাবেন? তাছাড়া, তাঁর স্টেটের অধিকাংশ প্রজারাই তো হিন্দু। সাধারণ হিন্দুরা চিরকালই মুসলমানদের সংস্পর্শ এড়িয়ে এসেছে। তারাই কি তাঁর এই কাজ মেনে নেবে? না নেওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশী, মানে, প্রায় পনেরো আনার কাছাকাছি।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে যোধপুরের মহারাজা বললেনঃ আমাকে আর একটু ভাবতে দিন, কালকেই আমি ফিরে আসব।

এই বলেই তিনি যোধপুরে ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি তিন দিন ছিলেন।

মহারাজা যে জিন্নাসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সে-সংবাদটা ফাঁস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্টেটের জনসাধারণের মধ্যে একটা অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল। যোধপুর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে—এটা কেউ মেনে নিতে পারল না; জায়গীরদার আর সম্ভ্রান্ত-বংশীয়েরা ঠিক করল মহারাজা যদি এই ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে তারা বাধা দেবে। প্রয়োজন হলে গণ-আন্দোলন জাগিয়ে তুলবে।

গণ-আন্দোলন জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা তাদের কতটা ছিল জানি নে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহারাজা নিজেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। জিন্নাসাহেবের সঙ্গে আর দেখা না করে তিনি দিল্লীর ইম্পিরিয়েল হোটেলে এসে উঠলেন।

ভি. পি. মেননের হয়েছে যেন এক জ্বালা। এক মিনিট তাঁর নিশ্বাস ফেলার উপায় নেই। ছ'টি ইন্দ্রিয়কেই তাঁকে সব সময় সজাগ করে রাখতে হয়েছে। কোন্ রাজা জালে পড়তে চাইছে না, কে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথায় অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপ চলেছে, কাকে মিষ্টি কথায় বশ করতে হবে, কাকে দিতে হবে ধমক এই সব ভাবতে-ভাবতেই তাঁর প্রাণটা হৃদগহ্বর ছেড়ে কণ্ঠে এসে হাজির হয়েছে।

দুটো চোখ, আর দুটো কানে কুলোচ্ছে না তাঁর। তা ছাড়া, যৌবনের সে-শক্তিও তখন তাঁর নেই।

যোধপুরের মহারাজার পেছনে তাঁর গুপ্তচরেরা ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারাই সংবাদ দিল পাখি উড়ে এসেছে।

সংবাদ পেয়েই মেনন সাহেব মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলেন হোটেল ইমপিরিয়েলে। সংবাদ পাঠালেন মহারাজাকে।

মহারাজা তখন শ্যাম্পেনের বোতল গলায় ঢেলে রংয়ের পর রং চড়িয়ে টঙ হয়ে বসেছিলেন। মেনন এসেছেন শুনেই খাপ্পা হয়ে উঠলেন; বলে পাঠালেন: নেই মাংতা। অভি ফুরসুৎ নেহী হ্যায়।

কিন্তু মেননও ছোড়নেওয়ালা নন। তিনি বলে পাঠালেন: লর্ড মাউন্টব্যাটনের কাছ থেকে জরুরী বার্তা নিয়ে আমি এসেছি। দেখা না করে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।

ভাইসরয়ের নাম শুনে হনোবন্ত সিং মেননকে ডেকে পাঠালেন। মেনন কোন রকম ভূমিকা না করেই বললেন: আমি ভাইসরয়ের কাছ থেকে আসছি।

তা তো শুনলাম; কিন্তু কেন?

তিনি আপনার সঙ্গে এখনই দেখা করতে চান।

বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু কেন?

তা আমি জানি নে। আপনাকে এখনই আমার সঙ্গে ভাইসরয়ের কাছে যেতে হবে।

হনোবন্ত সিং কী যেন ভাবলেন একটু; তারপর, শ্যাম্পেনের বোতলটা গলায় ঢেলে দিয়ে বললেন: চলুন।

মহারাজাকে পাকড়িয়ে ভাইসরয়ের প্রাসাদে হাজির হলেন মেনন। নিয়ে তো এলেন; কিন্তু সত্যিই তো তাঁকে মাউন্টব্যাটন আসতে বলেন নি। স্টেটের ব্যাপার নিয়ে তিনি এতই নাকানি-

চোবানি খাচ্ছিলেন যে যোধপুরের মহারাজার কথা তাঁর মনেই ছিল না।

মেনন তাঁকে বসিয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়ে মাউণ্টব্যাটনের সঙ্গে দেখা করলেন; সমস্ত কিছু খুলে বললেন তাঁকে। পাকিস্তান যে তলে-তলে সীমান্তবর্তী রাজপুত স্টেটগুলিকে হাতানোর যোগাড় করছেন সে সংবাদও দিতে ভুললেন না; এবং যোধপুরের মহারাজা যে জিন্নাসাহেবের সঙ্গে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন সে সংবাদও জানালেন।

সব শুনে লর্ড মাউণ্টব্যাটন মেননকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসাদারী ভঙ্গিতে বাইরে এসে মহারাজার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন। মাউণ্ট-ব্যাটনকে তখন দেখলেই মনে হ'ত তিনি যেন কোন একটি পাদরি স্কুলের রেক্টর; বিপুল গাম্ভীর্য, আর নিজের শক্তিতে পূর্ণ আস্থাশীল—এইভাবে তিনি যেন তাঁর কোন একটি বাচাল ছাত্রের চরিত্র সংশোধন করার কাজে মনোনিবেশ করেছেন।

মহারাজ, চুক্তিপত্রে সই করতে দেরি করছেন কেন?

মহারাজা বললেন: সই তো করব; তবে ভারতের সঙ্গে নয়, পাকিস্তানের সঙ্গে। পাকিস্তানও আমার স্টেটের লাগোয়া ভূখণ্ড।

মাউণ্টব্যাটন হাসলেন, অনেকটা বিজ্ঞের মত হাসি, মহারাজার কথার অন্তঃসার-শূন্যতার বেদনার হাসি; বললেন: তা ঠিক; কিন্তু ভারত-বিভক্তিকরণের মূল নীতিটাই হচ্ছে, একটি মুসলীম ভূখণ্ড, আর একটি অ-মুসলীম খণ্ড। এটা আপনি কি জানেন?

নিশ্চয়ই জানি।

ভাল কথা। আপনার স্টেটের জনসংখ্যা হিন্দু, না মুসলমান?

মুসলমান নেই, সেকথা বলছি নে; তবে বেশীর ভাগই হিন্দু।

তা সত্ত্বেও আপনি পাকিস্তানে যোগ দেবেন?

মহারাজ বললেন: নীতির দিক থেকে কিছু অন্যায় করছি না।

মাউণ্টব্যাটন হেসে বললেন: কিন্তু রীতি, ধর্ম, সংস্কার? আপনার

হিন্দু প্রজারা তা মেনে নেবে কেন? আপনি যদি জোর করে তাদের দিয়ে কিছু করাতে চান তাহলে আপনার সারা স্টেটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হবে। তখন আপনি করবেন কী?

মাউন্টব্যাটন কথাটা স্মরণ করিয়ে না দিলেও, মহারাজার বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না; কারণ, ওই জিনিসটাই তিনি এতক্ষণ মনে মনে আলোচনা করছিলেন; আর ঐ জন্যেই তিনি সাদা চিরকুটে কোনরকম শর্ত না লিখেই জিন্নাসাহেবের কাছ থেকে চলে এসেছিলেন।

কিন্তু সুস্থ মাথায় ভাববার সময় ভাইসরয় তাঁকে দিচ্ছেন না। দিচ্ছেন না যখন, তখন দরটা একবার যাচাই করেই নেওয়া যাক। যদি কিছু মওকা পাওয়া যায় তো মন্দ কী?

তিনি বললেন: মিঃ জিন্না আমাকে একখানা সাদা কাগজ দিয়ে বলেছেন, আমি যা চাইব তা-ই তিনি আমাকে দেবেন। আপনি আমাকে কী দেবেন?

মাউণ্টব্যাটেন তো অবাক। বয়স অল্প হলে হবে কী, একেবারে ঝুঁদে ব্যবসাদার। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন দরটা ভাল পেলে মহারাজা ভারতবর্ষকেই তাঁর স্টেটটি বিক্রী করে দেবেন।

মুখ খুললেন মেনন: আপনি যদি চান আমিও আপনাকে একখানা সাদা কাগজই দেব; কিন্তু এক মিথ্যে আশা ছাড়া শেষ পর্যন্ত কিছুই পাবেন না আপনি। জিন্নাসাহেবও আপনাকে অন্য কিছু দিতেন না।

শুরু হল দর-কষাকষি। মেনন যতই সুতো গুটিয়ে নেন মহারাজা ততই লাটাই টানতে থাকেন। এই টানা-পোড়েনের মধ্যে মধ্যস্থতা করে দিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটন।

শেষ পর্যন্ত রফা একটা হল। কথা হল ঐ পরিমার্জিত চুক্তিগুলি নিয়ে মেনন যোধপুরে মহারাজার সঙ্গে দেখা করবেন।

মীমাংসা করে দিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটন জরুরী একটা কাজে কয়েক

মিনিটের জন্যে ভেতরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা রেগে কাঁই হয়ে মেননের বুক লক্ষ্য করে রিভলভার উঁচিয়ে ধরলেন : আপনাকে আজকে আমি খুন করে ফেলব।

ভি. পি. মেনন ছাপোষা ঘরের মানুষ। যুদ্ধবিগ্রহ করারও কোন সুযোগ ছিল না তাঁর, কোনদিন করেনও নি কিছু। অপ্রকৃতিস্থ মহারাজার এই আস্ফালনে মনে মনে কিছুটা ঘাবড়িয়ে গেলেন তিনি ; কিন্তু বাইরে সেরকম কোন ভাব না দেখিয়ে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন : আপনি যদি ভেবে থাকেন আমাকে খুন করে এর চেয়েও বেশী সুবিধে পাবেন তা হলে আপনি ভুল করেছেন। এসব ছেলেমানুষী থামান।

হো-হো করে হেসে উঠলেন মহারাজা; রিভলভার সরিয়ে নিয়ে সোফার ওপরে মৌতাত করে বসলেন।

আশ্বস্ত হলেন ভি. পি. মেনন। এবারে চুক্তিপত্র সই করার পালা।

কিন্তু তারপরেও তিনটি দিন কেটে গেল।

মেনন পরিমার্জিত চুক্তিপত্র নিয়ে যোধপুরে হাজির হলেন। মহারাজার প্রাসাদের কাছাকাছি তাঁর গাড়িটি এগিয়ে আসতেই দেখতে পেলেন বিরাট একটি জনতা উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে মেনন আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে, মেননের গাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলে প্রচণ্ড আবেগে হাত-পা ছুঁড়ছে : মেনন, ফিরে যাও, কংগ্রেস জাহান্নামে যাক।

ঠিক এই ধরনের একটি বিরুদ্ধ গণ-আন্দোলনের জন্যে মেনন প্রস্তুত ছিলেন না। মহারাজা যে তলে-তলে এইভাবে তাঁকে টাইট দেবেন তা তিনি বুঝতে পারেন নি। সেদিন তাঁর কী হ'ত বলা যায় না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অঘটন কিছু ঘটার সুযোগ আসে নি। তার আগেই স্টেট পুলিস অনেক কষ্টে তাঁকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

মেননের দুরাবস্থাটা রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করেই মহারাজা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

দেখলেন, আমিও কেমন জোট পাকাতে পারি ?

মেনন মুখে হাসি টেনে বললেন ঃ তা তো দেখলাম, কিন্তু এসবের উদ্দেশ্য কী ?

মহারাজা হেসে বললেন ঃ আমিও যে কেউ-কেটা নই, সেইটাই আপনাকে দেখানো। চাক্ষুষ প্রমাণ পেলে আর অস্বীকার করতে পারবেন না।

চুক্তিপত্রটি বার করে মেনন বললেন ঃ ধন্যবাদ। তাহলে এবারে এই চুক্তিপত্রটি সই করুন !

ওঃ, সিয়োর। ভদ্রলোকের এক কথা। এই বলেই চুক্তিপত্রটা নিয়ে খস খস করে সই করে দিলেন মহারাজা।

চুক্তিপত্রটি পকেটের মধ্যে পুরে মেনন উঠতে যাবেন এমন সময় মহারাজা তাঁকে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ এরই মধ্যে ? আজ আমাদের আনন্দ করার দিন। আমি হেরেছি, জিতেছেন আপনি। আসুন আমরা প্রাণ ভরে মদ্যপান করি। মদ খাওয়ার এমন দিন আর আসবে না আমার জীবনে।

মেননকে প্রতিবাদ করার এতটুকু সুযোগ না দিয়েই, মহারাজা দুটি চেটোয় শব্দ করলেন। লে অ্যাও হুইস্কি, আউর দোঠো গিলাস, জলদি।

হুইস্কি এল, এল দুটো বিরাট বিরাট গ্লাস। মহারাজা মেননকে আধ গ্লাস ঢেলে দিয়ে নিজের গ্লাসে ঢেলে নিলেন হুইস্কি, তারপরে ঢক ঢক করে গলায় ঢালতে লাগলেন গ্লাসের পর গ্লাস।

মেনন সাহেব ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। এখন তাঁর দিল্লীর পথে রওনা হওয়ার সময়। চুক্তিপত্রটিকে দপ্তরে জমা না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি ছিল না তাঁর। আর পথটাই বা কী কম ? দিল্লী অনেক দূর।

কিন্তু কে কার কথা শোনে ? আচ্ছা বদমেজাজী মাতালের পাল্লায়

পড়া গিয়েছে রে বাবা ! বাধা দিতে গেলেই বিপদ। শেষ পর্যন্ত বুড়ো বয়সে মেননকে ছোকরা মহারাজার কোমর ধরে টুইস্ট নাচ না নাচতে হয়। গেরোর ফের আর কাকে বলে !

হুইস্কি শেষ হওয়ার পরে স্যাম্পেন এল।

মেনন ভয়ে-ভয়ে বললেন ঃ স্যাম্পেন খেলেই আমার মাথা টিপ টিপ করে। আমাকে বরং হুইস্কি দিন।

এই কথা। মেনন সাহেব তোমার ওই মাথাটাকে লোপাট করতে না পারলে আমার সোয়াস্তি নেই। তোমার ঐ মাথাটাই আমাদের জাহান্নমে পাঠিয়েছে। অতএব, লে আও স্যাম্পেন।

চিঁহিঁ চিঁহিঁ ডাক ছাড়লেন মেনন ঃ একটু হুইস্কি।

এসে হাজির হল বোতল চারেক স্যাম্পেন।

স্যাম্পেন-পর্ব শেষ হলে, এ ডি· সি-র ডাক পড়ল, ব্যাণ্ড লে আও, ব্যাঙকোয়েট ভি সাঝাও।

ঢালাও মাংস, ফল, মিষ্টি, আর স্যাম্পেন। সব খেতে হবে মেনন সাহেব। এ তোমার বিজয়-সংবর্ধনা। না বললে শুনছি নে।

অবিশ্রাম বাজতে লাগল ব্যাণ্ড। নর্তকীরা ঘুঙুর পায়ে হেলে দুলে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। মেননের এসব দিকে লক্ষ্য নেই। মহারাজার কানের কাছে ফিস ফিস করে চুক্তিপত্রের সম্বন্ধেই আলোচনা করতে লাগলেন।

ক্ষেপে উঠলেন মহারাজ ঃ এই হতভাগা ব্যাণ্ডের জ্বালায় আপনার কথার বিন্দু-বিসর্গ আমার কানে ঢুকছে না। ভাগো ভাগো। নিয়ে এস অর্কেস্ট্রা।

হুকুম হল এ-ডি-সিকে ঃ অর্কেস্ট্রা,. অর্কেস্ট্রা।

মেনন বললেন ঃ ব্যাণ্ড আনতে তো আপনিই বলেছিলেন।

বেশ গম্ভীর মেজাজে মহারাজা বললেন ঃ না, ভারত সরকারের হাতেই এ রাজ্যের ভার তুলে দেওয়া উচিত। এই কি আমার রাজত্ব ?

আমারই এ-ডি-সি এমন একজনের হুকুম তামিল করছে যে মানুষটা মাত্র এক বোতল হুইস্কি আর তিন বোতল স্যাম্পেন খেয়েছে। হায় রে কপাল! এও আমাকে দেখতে হবে?

এই বলেই তিনি মাথা থেকে পাগড়ি খুলে মেঝের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আর মহারাজার অভিনয় করে হবে কী? হুনিয়াটাই ঝুটা হ্যায়।

এবারে আর না উঠলেই নয়। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে, মেননকে ফিরতেই হবে দিল্লীতে। মহারাজা রঙে টঙ হয়ে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে তাল দিতে গেলে রাত পুইয়ে যাবে।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে মহারাজা বললেন: কুছ পরোয়া নেই আমার প্লেন রয়েছে।

একে মাতাল, তার ওপরে প্লেন; তারও ওপরে পাইলট স্বয়ং মহারাজা, মেননের অবস্থা তখন 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা'-র মত, এই ব্যহস্পর্শ থেকে পৈত্রিক প্রাণটা কোন রকমে বাঁচিয়ে দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে পিতৃপুরুষদের সৌভাগ্য বলতে হবে।

শেষ পর্যন্ত প্লেনেই উঠতে হল মেননকে। বাপ রে বাপ। সে কী প্লেন চালানো! এই ওঠে তো, সোঁ সোঁ করে নেমে যায়। যেমন মনিব তেমনি তার বাহন। সেফটি বেলট তো ছেলেমানুষ; জাহাজ-বাঁধা কাছি দিয়ে বাঁধলেও ঝাঁকানীর চোটে তাও ছিঁড়ে-খুড়ে শেষ হয়ে যাবে। আকাশের বুকে হাজার রকমের ছক্করবাজি খেলতে খেলতে শেষ পর্যন্ত দিল্লীর মাটিতে নিরাপদেই নেমে এল প্লেনটি। ভগবানের নাম স্মরণ করতে-করতে শক্ত মাটিতে পা দিলেন মেনন। মদই খান, আর যাই করুন, হ্যাঁ, পাইলট বটে যোধপুরের মহারাজা! হ্যাটস অফ!

মেননের উদ্দেশ্য সফল হল। যোধপুরী কাতলাকে জালে লটকানোর পরেই অন্যান্য রাজপুত রাজারা নিজেরাই ধরা দিলেন।

এবারে ধরা দিলেন ভোপালের নবাব। এঁর প্রজাদের বেশীর

ভাগই হিন্দু, উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে ইনিই ছিলেন চেম্বার অফ প্রিনসেস-এর চ্যানসেলর। এঁকে সম্মান দেখানোর জন্যে উনিশ বার তোপ দাগা হত। উনিশ শ' ছাব্বিশ সালে এঁকে সিংহাসনে বসানোর জন্যে এঁর মা সিংহাসন ছেড়ে দেন। চরিত্রের দিকে ইনি যেমন চতুর ছিলেন, তেমনি ছিলেন কর্মঠ এবং কংগ্রেসবিদ্বেষী। সেই বিদ্বেষটি প্রকাশ্যে ফুটিয়ে তুলতে কোনদিনই তিনি দ্বিধা করেন নি। চ্যানসেলর হিসাবে ভারতীয় স্বাধীনতা-বিলের খসড়াটি মাউন্টব্যাটন তাঁকে পড়তে দিলে তিনি ক্ষেপে গিয়ে ভাইসরয়-এর মুখের ওপরে বলে এসেছিলেন ভোপালকে আমি কিছুতেই কংগ্রেসের হাতে তুলে দেব না। পনেরই অগস্টের পর থেকেই আমি স্বাধীন হয়ে যাবে। জহরলাল নেহেরু আর সর্দার প্যাটেলকে আমি তোয়াক্কার মধ্যেই আনিনে।

সেটা কেবল কথার কথা ছিল না ; ছিল তাঁর সত্যিকার মনোভাব। তিনি চ্যানসেলর-এর পদে ইস্তফা দিলেন, কিছু বড়-বড় স্টেটকে জোটে এনে ঘোঁট পাকানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে চেষ্টায় সার্থক না হয়ে নিজে একাই [হায়দারাবাদ, জুনাগড়, কাশ্মীর—এরাও নিঃশঙ্কভাবে শেষ পরিখায় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল] পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আর সাহস পেলেন না। ত্রিবাঙ্কুরে গণ অভ্যুত্থান করে কংগ্রেস যে খেল দেখিয়েছে তারপরে গোঁ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা বিপজ্জনক। রাজাদের নিয়ে ভারতে একটি তৃতীয় শক্তির সংগঠন করার চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বেশ খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির সঙ্গেই ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলেন। তিনি সর্দার প্যাটেলকে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখলেন ঃ

'আমি একথা গোপন করতে চাই নে যে, যতক্ষণ অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছিল ততক্ষণ আমার স্টেটের স্বাধীনতা আর নিরপেক্ষতা রক্ষা করার জন্যে আমার হাতে যতটুকু ক্ষমতা ছিল সেটুকুর সদ্ব্যবহার করতে আমি কার্পণ্য করি নি। এখন আমি পরাজয়

স্বীকার করলাম। একদিন আমি কংগ্রেসের যতটা শত্রু ছিলাম, আশা করি, পরাজয় বরণ করার পর আমি আপনাদের ততটা মিত্র হতে পারব। কারও বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই; কারণ, প্রথম থেকেই আপনারা আমার বক্তব্য সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করেছেন, যতটুকু সম্মান আর ভদ্রতা আমার প্রাপ্য সেটুকু দিতে আপনারা কার্পণ্য করেন নি। বর্তমানে আমি আপনাকে বলতে চাই যে আপনাদের ঘোষিত নীতির মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা দেশের অকল্যাণকর শক্তির বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে লড়বেন এবং স্টেটগুলির সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আপনারা একটি অনুগত আর বিশ্বাসী বন্ধু বলেই মনে করবেন।'

এই চিঠির উত্তরে সর্দার প্যাটেলও যা লিখেছিলেন সেটাও উল্লেখযোগ্য:

'সত্যি কথা বলতে কি, ভারতীয় য়ুনিয়নের সঙ্গে আপনার স্টেটের অন্তর্ভুক্তিটিতে আপনার পরাজয় আর আমাদের জয় হয়েছে এমন কথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারিনে। যা সত্য এবং হওয়া উচিত তাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে, আর সেই বিজয় অভিযানে আমরা দুজনেই নিজের নিজের অংশ গ্রহণ করেছি। ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিটাই যে একমাত্র খাঁটি পথ, এটি বুঝতে পারার জন্যে, এবং এতদিন আপনি যে ভূমিকাটি গ্রহণ করেছিলেন সেটি যে ভারত ও আপনার রাজ্য উভয়ের দিক থেকেই ক্ষতিকর সেটি স্বীকার করে আপনি যে শক্তি, সাহস, আর সততা দেখিয়েছেন তার সমস্ত গৌরবই আপনার নিজস্ব। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশের অকল্যাণকর শক্তিগুলিকে ধ্বংস করার জন্যে ভারতীয় ডোমিনিয়নকে আপনি যে সব দিক দিয়ে সাহায্য করবেন, আপনার এই আশ্বাসটিই আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে দেশের ভেতরে যে সব অমঙ্গলকারী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ভারত জেহাদ ঘোষণা করেছে, এবং

যে বিপদের মধ্যে দিয়ে আমরা আজ অগ্রসর হচ্ছি সেগুলি বিনষ্ট করার জন্যে আমরা যে এতদিন মূল্যবান এবং নিঃসন্দেহে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তাইতে আমরা হতাশ হয়েছি। বিশেষ করে সেই জন্যে আপনার সহযোগিতার আর বন্ধুত্বের আশ্বাসকে আমি এতটা মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করছি!'

এবারে ইন্দোরের পালা। বিদেশ ভ্রমণ শেষ করে মহারাজা ভারতে ফিরে এসেছিলেন বটে, কিন্তু পঁচিশে জুলাই-এর আলোচনায় সভায় তিনি যোগ দেন নি। যোগ দেওয়া তো দূরস্থান, ওই আলোচনা যোগ দেওয়ার জন্যে তাঁকে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তারও তিনি কোন উত্তর দেন নি। কয়েকটি মারাঠা রাজ্যের রাজারা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে মহারাজার প্রাসাদে অপেক্ষা করছিলেন একদিন। বরোদার গাইকোয়াড স্যার প্রতাপ সিং-এর মুখে শোনা যায় সেই সময় ইন্দোরের মহারাজা হাজির হলেন, কিন্তু উপস্থিত রাজন্যবর্গের সঙ্গে একটি কথাও না বলে তাঁদেরই সামনে দিয়ে তিনি সোজাসুজি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

পরে অবশ্য ভোপালের নবাব আর ইন্দোরের মহারাজা লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন; কিন্তু সে-সময়েও, তিনি ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ দেবেন কি না সে সম্বন্ধে হ্যাঁ কিংবা না —কিছুই বলেন নি তিনি।

কিন্তু তারপরে একদিন সকালে সকলকে সচকিত করে সাধারণ খামের মধ্যে মহারাজার সই করা চুক্তিপত্র ডাকহরকরা মারফৎ এসে হাজির হল।

কিন্তু তাতেই কি ঝামেলা মিটল? ভারতবর্ষে রাজা-মহারাজার সংখ্যা কি কম? বড়, মাঝারি প্রায় শেষ হয়ে এল; এবারে ছোট-গুলোর পালা।

এমনি কপাল যে তারাও শেষ পর্যন্ত পাঁয়তারা কষতে শুরু করল। তাদের সঙ্গে আবার বোস, আলোচনা কর, কী করলে কী হবে,

আর কী না করলে কী হবে না, তা-ই বোঝাও, তোয়াজ কর। শেষ পর্যন্ত নব, ধোলপুর, ভরতপুর, বিলাসপুর দলিলে সই করল।

পনেরই অগস্ট উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে স্বাধীনতা হস্তান্তরের পালা শেষ হল, সেই সঙ্গে সমাধান হল স্টেটগুলির সমস্যা। রাজা-মহারাজা, জাগিরদার, ছোট-বড়-মাঝারি প্রায় সব স্টেটই ভারতীয় য়ুনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চুক্তি সাক্ষর করল। করল না কেবল জুনাগড়, কাশ্মীর আর হায়দারাবাদ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেই নীতিগত ভাবে মহাভারতের শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় নি; কারণ তখনও পর্যন্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য এক সূত্রে গাঁথা হয় নি। সেইটুকুর জন্যে, শোনা যায়, ব্যাসদেবকে অশ্বমেধ পর্ব লিখতে হয়েছিল।

ভারতের স্বাধীনতাপর্বও উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের পনেরই অগস্টে শেষ হয় নি। বাকি ছিল জুনাগড়, কাশ্মীর আর হায়দারাবাদ। ওই তিনটি নিয়ে স্বাধীন ভারতের উত্তরপর্ব শুরু।

স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলার সময় নেই ভারত সরকারের। তখনও সমস্ত দেশীয় রাজ্য অন্তর্ভুক্তির দলিল সই করে নি। তবে করবে। না করে উপায় নেই তাদের। হঠাৎ খবর এল জুনাগড়ের নবাব স্যার মহব্বৎ খাঁ রসুলখাঞ্জি পাকিস্তানের সঙ্গে মহব্বৎ পাকা করে ফেলেছেন।

এই সব রাজা-মহারাজাদের পিঁড়িলাফে ভারত সরকারের নিশীথ নিদ্রা টুটে গিয়েছে। সব ওই পাঁকাল মাছের জাত। একটু আলগা পেরেছে কি সুড়ুৎ করে পাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আবার ঝাঁপি বসাও, কানকি ঝাপটে ধর।

তাতেও কি নিস্তার রয়েছে? রাজ্যের কাদা ছিটিয়ে জল ঘোলা করে তবে তিনি ধরা দেবেন। কিন্তু পশ্চিম ভারতের একটি ক্ষুদে ষ্টেটের নবাব বাহাদুর আরও এক কাঠি সরেস। তিনি ধরা দিলেন না, ঝাঁপি কেটে বেরিয়ে গেলেন, পেছনে ফেলে গেলেন ধড়টা।

জুনাগড়ের শাহানশাহ্ স্যার মহব্বৎ খাঁ রসুলখাঞ্জি।

১৪৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত এটি রাজপুত রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাণা ছিলেন চৌদসামা বংশের। তারপরে আমেদাবাদের সুলতান মহম্মদ বেদগা রাজ্যটি অধিকার করেন। সম্রাট আকবরের সময়ে আমেদাবাদ সুবার অধীনে এটি দিল্লীশ্বরের শাসনাধীনে ছিল। ১৭৩৫ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সময় শের খাঁ বাবি নামে আমেদাবাদের একজন সেনানী মুঘল গভর্নরকে তাড়িয়ে দিয়ে জুনাগড় রাজ্য অধিকার করেন। এই রাজ্যের শেষ নবাব স্যার মহব্বৎ খাঁ রসুলখাঞ্জি।

চরিত্রের দিক থেকে নবাব বাহাদুর একেবারে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার—সোঁদর বনের বাঘ। ক্ষেপে গেলে আলোয়ারের মহারাজার মত অবশ্য তিনি রেসের ঘোড়াদের পুড়িয়ে মারতেন না, কিন্তু তাই বলে তাঁর খামখেয়ালিরও অভাব ছিল না। এদের মধ্যে অনেকগুলিই তাঁর বংশগত সম্পত্তি, অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। শোনা যায় এঁর পিতৃদেবের একটা খেলা হল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের

জবাই করা। যে সব পরিষদ তাঁর বিরাগভাজন হ'ত তাদেরও তিনি একটি নূতন পদ্ধতিতে সাফ করে দিতেন। দুর্গের ভেতর থেকে সরু তক্তার ওপর দিয়ে খাড়াই উঁচু পাহাড়ের শিখর পর্যন্ত তাদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত, সেখান থেকে অতলগর্ভী অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হ'ত তাদের। এই বংশের শেষ নবাব স্যার মহব্বৎ খাঁ রসুলখাঞ্জি।

এঁর প্রধান শখ ছিল দুটি—কুকুর আর শিকার।

কুকুর পুষতে ভালবাসতেন তিনি। নানান জাতের প্রায় দেড়শো কুকুর ছিল তাঁর। এদের অবাধ মেলামেশার ফলে কত নূতন-নূতন সারমেয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা যায় তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করতেন তিনি। সারমেয়-প্রীতি তাঁর এতই প্রবল ছিল যে এই দেড়শো কুকুরের পরিচর্যার জন্যে তিনি যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাঁর প্রাসাদের চারপাশে ছিল এদের থাকার জায়গা, প্রত্যেকটির জন্যে বরাদ্দ ছিল একটি করে ঘর। কেবল তা-ই নয়। এদের প্রত্যেকের ছিল একটি করে টয়লেট, ডাইনিং টেবিল, খাট-বিছানা, একটি করে পরিচারক। প্রতিটি ঘরে ছিল একটি করে টেলিফোন। প্রাসাদের একজন অফিসার এবং একজন ইংরাজ ডাক্তার এই দেড়শোটি পরিচারকের ওপরে তদারকি করতেন। কেউ কর্তব্যে অবহেলা করেছে শুনলে তার গর্দান যেত।

মাঝে-মাঝে নবাব বাহাদুরের ইচ্ছে হত তাঁর প্রিয় কুকুরগুলিকে দেখার। তখন তাদের বেশ ভাল করে সাজিয়ে-গুছিয়ে পোষাক পরিয়ে এক একটি পালকিতে চড়িয়ে বাহকরা রাজ-দরবারে নিয়ে আসত। শোনা যায় একবার দুটি প্রিয় কুকুরের বিয়েতে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে স্টেট ব্যাঙ্কোয়েটের ব্যবস্থা করেছিলেন আর সেই বিশেষ দিনটিকে সরকারী ছুটির দিন বলে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ হেন সারমেয়প্রীতি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

শিকার করার জন্যে নবাব বাহাদুরের অনেকগুলি দুর্ধর্ষ কুকুর ছিল। এদের সঙ্গে নিয়ে তিনি শিকারে বেরোতেন। শোনা যায়

শিকারে যাওয়ার আগে দু-একদিন এদের তিনি অভুক্ত রাখতেন। শিকার করতে গিয়ে কোনদিনই তিনি পশুদের গুলি করে হত্যা করতেন না, কিছুটা জখম করে তাদের ওপর সেই ক্ষুধার্ত ভয়ঙ্কর কুকুরগুলিকে ছেড়ে দিতেন। কুকুরগুলি দল বেঁধে আহত পশুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দেহটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলত। সেই দৃশ্য তিনি রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করতেন।

কিন্তু বুদ্ধিতেও তিনি কারও চেয়ে কম যান না। তাঁর মস্তিষ্ক যে কত উর্বর তা তাঁর শেষ খেলাতেই বোঝা গেল।

১৯৪৭ সালের প্রথম ক'টি মাস রাজা-মহারাজা-নবাবজাদাদের আর্তনাদে ভারতের আকাশ-বাতাস আর্ত হয়ে উঠেছিল। তখন তাঁরা আগুন-লাগা আস্তাবলের মধ্যে পোড়া ঘোড়ার মত ছোটাছুটি করছিলেন। নিজেদের মধ্যে জোট পাকিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিলেন। কাথিয়াড় রাজ্যগুলিও এদিক থেকে তখন পিছিয়ে ছিল না, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর কাথিয়াড় রাজ্যগোষ্ঠীর পরিকল্পনা নিয়েছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানে কথিয়াড় রাজ্যগুলি কী ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করবে সেদিক থেকে জুনাগড়ের নবাবের কিছু ক্রিয়াকলাপের ওপরে গুজরাটি কাগজে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ায়, নবাব বাহাদুর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেন। তারিখটা হল সাতচল্লিশ সালের এগারোই এপ্রিল। সেই বিজ্ঞপ্তির মূল কথা হল ঃ একটি বৃহত্তর কাথিয়াড় গোষ্ঠী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা যে রয়েছে সে-বিষয়ে জুনাগড় অত্যন্ত সচেতন। জুনাগড় চায় কাথিয়াড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন এবং সার্বভৌম মর্যাদা লাভ করে। তারপরে সেই স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি বোঝাপড়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সুযোগ এবং সুবিধাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করবে।

What Junagadh stands for is the solidarity of Kathiawar and would welcome the formation of a self-contained group of Kathia-

war States. Such a group while providing for the autonomy and entity of individual States and their subjects would be a suitable basis for co-operation in matters of common concern generally and co-ordination where necessary.

কিন্তু ওই পর্যন্ত।

জুনাগড়ের একটি সংবাদপত্র জানাল যে নবাব বাহাদুর তলে-তলে পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করছেন। পাছে বিরুদ্ধ পক্ষের চাপ আসে এই ভয়ে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বেলুচী আর হুরদের ঢোকানো হচ্ছে; আর স্থানীয় বহুদ্দীন কলেজটিকে সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছে।

সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুনাগড়ের দেওয়ান খান বাহাদুর কাদির মহম্মদ হুসেন সাহেব সাংবাদিকদের ডেকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন: সব ঝুটা বাৎ, বিলকুল ঝুটা আছে। তিনটির একটি পরিকল্পনাও নবাব বাহাদুরের নেই।

তাহলে, নবাব বাহাদুরের পরিকল্পনাটা কী?

ধৈর্য ধরুন। সবুরে মেওয়া ফলবে।

তারিখটা হল বাইশে এপ্রিল ১৯৪৭ সাল।

সবুর করতে-করতে পঁচিশে জুলাই এসে গেল। লর্ড মাউণ্টব্যাটনের দিল্লীর দরবারে রাজন্যবর্গের ঐতিহাসিক সম্মেলন বসেছে। সেই সম্মেলনে জুনাগড়ের নবাবের সাংবিধানিক উপদেষ্টা দেওয়ানজির ভাই নবী বক্স উপস্থিত হলেন; কিন্তু নবাব অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করেন নি। বা, তাঁর হয়ে কোন চরম কথা বলারও অধিকার দেননি তাঁর প্রতিনিধিকে। সম্মেলনের শেষে অবশ্য নবী বক্স লর্ড মাউণ্টব্যাটন আর সর্দার প্যাটেলকে গোপনে আভাষ দিয়েছিলেন যে ভারতীয় যুনিয়নের সঙ্গে যোগ দিতে তিনি নবাবকে উপদেশ দেবেন। নবনগরের জামসাহেবকেও ওই একই কথা বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল নবাব তাঁর উপদেশ গ্রহণ করবেন।

কংগ্রেসের ধারণাও তাই। উপদেশ গ্রহণ না করে উপায় নেই নবাবের।

কাথিওয়াড় স্টেটগুলির মধ্যে প্রাচীন স্টেট এই জুনাগড়। বোম্বাইয়ের উত্তরে কাথিওয়াড় প্রণালীর দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে ছোট্ট এই রাজ্য জুনাগড়, যার আয়তন সর্বসাকুল্যে চার হাজার বর্গ মাইলের মত। দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর বাদ দিলে এর প্রায় চারপাশেই ভারতীয় স্টেট ছড়িয়ে ছিল। স্থলপথে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখার জন্যে এর সরাসরি কোন সড়ক ছিল না। জলপথেও করাচী থেকে এর প্রধান বন্দরের দূরত্ব সাড়ে তিনশো মাইলের কম নয়।

তারপর ধরুন জনসংখ্যা। ১৯৪১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে এর লোকসংখ্যা ছিল ছ'লক্ষ সত্তর হাজার সাতশো উনিশ। এদের শতকরা আশীভাগই আবার হিন্দু।

কেবল কি তাই? এই স্টেটের কিছু-কিছু টুকরো গণ্ডোল, ভবনগর আর নবনগরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল; আবার পাশাপাশি কিছু রাজ্য যারা ভারতীয় যুনিয়নে যোগ দিয়েছে, তাদেরও কিছু অংশ জুনাগড়ের মধ্যে ছিল ছিটিয়ে। এর রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগ; এমন কি পুলিসও নিয়ন্ত্রিত করত ভারত সরকার।

জুনাগড় কোন্ পথে পাকিস্তানে ঢুকবে?

তাছাড়া, ভারতের বোধ হয় সবচেয়ে স্থূলবপু এবং মিষ্টভাষী নবনগরের জামসাহেব ছিলেন কাথিওয়াড় স্টেটগুলির প্রতিনিধিস্বরূপ। তিনি নিজেও ভারত সরকারকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে জুনাগড় ভারতের সঙ্গেই যোগ দেবে।

কিন্তু জুনাগড়ের নবাব গভীর জলের মাছ। তিনি কংগ্রেসকেও মিষ্টি-মিষ্টি বুলি দিলেন; আবার তলে-তলে পাকিস্তানের সঙ্গেও গোপন শলা-পরামর্শ শুরু করলেন।

কিন্তু জিন্নাহ্ সাহেবও কি জুনাগড়ের দিকে সত্যি সত্যিই হাত

কাছে পৌঁছনো তাঁর পক্ষে যে কষ্টকর তা তিনি জানতেন। তাঁর নিজের ঘরেই তখন সমস্যার পাহাড় জমে গিয়েছে। তাতেই তিনি নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। তার ওপরে আর একখানা বোঝা ঘাড়ে নেওয়ার মত শক্তি তাঁর কোথায়?

সবই সত্যি; তবু রাজনীতিতে সবই সম্ভব; বিশেষ করে কংগ্রেসকে টাইট দেওয়ার জন্যে পাকিস্তান তখন করতে পারে না কী?

ভয়টা একেবারে অমূলক ছিল না। জুনাগড়ও ভেতরে-ভেতরে পাঁয়তারা কষছিল। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে করাচীতে মুসলীম লীগের একজন ওমরাহ শ্রেণীর ছিলেন স্যার শাহ্‌নওয়াজ ভুট্টো। দেওয়ান আবদুল কাদির সাহেব মন্ত্রী-পরিষদের সভ্য হওয়ার জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। এর পেছনের নবাবের সুদূরপ্রসারী কী পরিকল্পনা ছিল ভগবান জানেন; কিন্তু ওই বছরেই মে মাসে কাদির সাহেব দেওয়ানের পদে ইস্তফা দিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধার করার জন্যে ভারতের বাইরে চলে গেলেন। ভুট্টো সাহেব দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত হলেন।

দ্বিতীয় পরিবর্তন হল সাংবিধানিক উপদেষ্টার পদে। পদটি থেকে অপসারিত হলেন নবী বক্স।

এরপরেই মুসলীম লীগের মুঠোর মধ্যে এসে পড়লেন নবাব।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই পাশাপাশি স্টেটের রাজারা মেননকে জানালেন জুনাগড়ের গতিবিধি ভাল নয়।

অন্তর্ভুক্তির দলিলপত্র যথারীতি নবাবের কাছে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১২ই আগস্ট পর্যন্ত কোন উত্তর এল না দেখে ভি-পি-মেনন টেলিগ্রাম করলেন: সময় আর নেই। চুক্তিপত্র সই করার শেষ দিন হচ্ছে ১৪ই আগস্ট।

১৩ই আগস্ট জুনাগড়ের দেওয়ান স্যার শাহ্‌নওয়াজের কাছ থেকে

পালটা টেলিগ্রাম এল : অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটা এখনও নবাব বাহাদুর আর তাঁর মন্ত্রী-পরিষদের বিচারাধীন রয়েছে।

ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে সেইদিনই নবাব জুনাগড়ের তথাকথিত কিছু দায়িত্বশীল নাগরিকদের একটি সম্মেলন ডাকলেন। সেই সম্মেলনে কী ধরনের আলোচনা হয়েছিল জানি নে; তবে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দু অধিবাসীদের যে তা স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয় নি, সেকথা অনুমান করা শক্ত নয়। কারণ, ওই দিনই হিন্দুরা সম্মিলিত ভাবে নবাবের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছিল। নবাব যদি পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তিনি যে কী ধরনের বিপদে পড়বেন তাই নিয়ে স্মারকলিপিতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। জুনাগড়ের ভৌগলিক অবস্থান আর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধিবাসীদের কথা ছেড়ে দিলেও, রাজস্বের দিক থেকেও ক্ষতির সীমা থাকবে না তাঁর।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? জনসাধারণের (!) সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়েছে এই ধরনের একটা ওপরচাল চেলে, জুনাগড় সরকার ১৫ই আগস্ট একটি প্রেস নোট বার করে পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির কথা ঘোষণা করল।

ভারত, অথবা পাকিস্তান—এ দুটি রাষ্ট্রের কোন্‌টির সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করা উচিত—এই বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই জুনাগড় সরকারকে বিশেষ কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সমস্যাগুলি নিঃসংশয়ে জটিল এবং বহুমুখী; সুতরাং সরকারকে বেশ ভাল ভাবেই চিন্তা করতে হয়েছে। সেই চিন্তার ফলে জুনাগড় স্টেট পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যাঁরা দেশের সত্যিকারের মঙ্গলকামী এবং দেশকে সমৃদ্ধিশালী দেখতে চান, নবাব বাহাদুর আশা করেন তাঁরা সকলেই এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবেন।

The Govt. of Junagadh has during the past few weeks

been faced with the problem of making its choice between accession to the Dominion of India and accession to the Dominion of Pakistan. It has had to take into very careful consideration every aspect of the problem. ...After anxious consideration and the careful balancing of the factors, Govt. of the State has decided to accede to Pakistan and hereby announces its decision to that effect. The State is confident that its decisions will be welcomed by all loyal subjects of the State who have its real welfare and prosperity at heart.

কিন্তু ভারত সরকারকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়নি। ১৭ই আগস্ট ভি, পি, মেনন এই সংবাদ প্রথম শুনলেন; তাও খবরের কাগজ থেকে। জুনাগড়ের দেওয়ান পালটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলেন যে ঘটনাটা সত্যি। জুনাগড় পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

মাথায় হাত দিয়ে বসল ভারত সরকার।

এই অন্তর্ভুক্তির ফল সুদূরপ্রসারী।

নীতির দিক থেকেও বটে, রাজনীতির দিক থেকেও বটে।

প্রথমত, হিন্দুদের সংখ্যা ওখানে শতকরা আশী ভাগেরও বেশী।

দ্বিতীয়ত, জুনাগড় ভারতের প্রকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এর প্রাচীরবেষ্টিত শহরের ওপরে চার হাজার ফুট উঁচু দুটি বিশাল পাহাড় রয়েছে। এই পাহাড়ের গুহায় রয়েছে অজস্র হিন্দু আর জৈনদের মন্দির। সারা ভারত থেকে হিন্দু আর জৈন ভক্তেরা এইখানে আসেন উপাসনার জন্যে। তাছাড়া, এখানে রয়েছে গীর অরণ্য, সমস্ত এশিয়ার মধ্যে যে স্থানটি সিংহের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

তৃতীয়ত, কাথিওয়াড় ষ্টেটগুলির মধ্যে জুনাগড়ই হল সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী।

চতুর্থত, নবাবের এই সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধিবাসীরা মেনে নেবেন না। ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

[Integration of the Princely States : V. P. Menon].

এতদিন পর্যন্ত একমাত্র দেশীয় রাজ্যগুলিতেই কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি। এবারে তা নতুন করে দেখা দেবে!

তাছাড়া, আর একটি বিষবৃক্ষ রয়েছে—ওই হায়দারাবাদের নিজাম বাহাদুর। দুজনের সমস্যা একই। নিজাম তো এমনিতেই হুমকি দিয়েছেন ১৫ই আগস্টের পর তিনি স্বাধীন হয়ে যাবেন। জুনাগড় যদি এত সহজে পার পেয়ে যায় তাহলে নিজামকে ঠেকাবে কে?

ভারতে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাই-কমিশনারকে একটা চিঠি দিলেন ভি, পি, মেনন। জুনাগড়ের সম্বন্ধে পাকিস্তান সরকারের অভিমত কী জানতে চাইলেন। বিষয়টি নিয়ে জুনাগড়ের জনমত নির্ধারণ করার বিষয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে পাকিস্তান সরকার ঘরোয়া আলোচনায় বসতে রাজী রয়েছেন কি না চিঠিটিতে তাও জানতে চাওয়া হল।

কিন্তু পাকিস্তান সরকার এর কোন জবাব দিল না।

নষ্ট করার মত সময় হাতে নেই বুঝতে পেরে ১২ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তান প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁর কাছে একটি জরুরী তার পাঠানো হল। পাছে তার-টি খোয়া যায় এই ভয়ে সেটি দেওয়া হল লর্ড ইসমের হাতে। লর্ড ইসমে তখন প্রেসিডেণ্ট জিন্নাহ্‌র সঙ্গে আলোচনার জন্যে করাচীতে যাচ্ছিলেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও সমস্ত ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখতে পারেন নি। তাঁর মতে পাকিস্তান যদি জুনাগড়ের অন্তর্ভুক্তি মেনে নেয়, তাহলে নবগঠিত দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হবে; আর যে কোন নিরপেক্ষ দর্শকের কাছেও পাকিস্তানের এই কাজ সমর্থন করা কষ্টকর হয়ে উঠবে।

এবারেও পাকিস্তান নীরব।

১৩ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারকে জানালেন যে জুনাগড়ের অন্তর্ভুক্তি পাকিস্তান গ্রহণ করেছে।

গভীর জলের মাছ এই জুনাগড়ের নবাব। কংগ্রেসকে মিষ্টি-

মিষ্টি কথা বলে তলে-তলে তিনি মুসলীম লীগের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন ১৬ই জুলাই তারিখে দেওয়ান ভুট্টোসাহেব মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র সঙ্গে গোপনে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তখন মিঃ জিন্নাহ্‌ নবাবকে চুপ করে বসে থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

কোন রকমে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত কাটিয়ে দিন।

কিন্তু তারপর? জুনাগড়ের চারপাশে হিন্দুরাজা। ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে যাবে যে।

ভয় কী? আমরা সব মালপত্তর পাঠাব। করাচী থেকে 'ভেরাভেল' বন্দর [জুনাগড়ে] সমুদ্রপথে আর কত দূর! সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাতেও ভুট্টোসাহেব ভরসা পেলেন না; বললেন: কিন্তু হিন্দুরা ছেড়ে দেবে কেন? বারানসীর পরেই জুনাগড় ওদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। ওখানে নাকি ওদের শ্রীকৃষ্ণ নরদেহ পরিত্যাগ করেছিলেন। তা ছাড়া, ওই সোমনাথের মন্দির, সে-ও যে জুনাগড়ে।

কিন্তু মুসলমানদের কথা না ভাবলে চলবে কেন? মেনে নিচ্ছি, জুনাগড়ে মুসলমানদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা কুড়ি ভাগ; কিন্তু সমস্ত কাথিওয়াড়ে ওদের সংখ্যা হচ্ছে সাত লাখের কাছাকাছি। এরা বেঁচে রয়েছে একমাত্র আপনাদের মুখ চেয়ে। তাদের অবস্থাটা দাঁড়াবে কী?

তা বটে।

তাছাড়া আরও একটা কথা রয়েছে। নবাব যদি হিন্দুস্থানে যোগ দেন তাহলে কংগ্রেস সরকার তাঁর অত সাধের কুকুরগুলিকে জবাই করে ফেলবে, তাঁর নিষ্ঠুর শিকারের নেশাকে প্রশমিত করবে, তাঁর ভাতা কমিয়ে দেবে, এবং গীরে যে সব সিংহ রয়েছে তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেবে ভারতীয় চিড়িয়াখানায়। কিন্তু পাকিস্তান? নবাব যাতে তাঁর মুক্ত জীবন স্বাভাবিক ভাবেই যাপন্‌ করতে পারেন তার

জন্যে তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে। আর দেশের মধ্যে বিদ্রোহের কথা যদি বলেন তো পাকিস্তান সেই বিদ্রোহ দমন করার জন্যে তার সশস্ত্র পুলিস পাঠাবে। এর পরে কোন দিকে তাঁর যাওয়া উচিত নবাব তা সহজেই বুঝতে পারবেন।

২৪শে আগস্ট তারিখে নবাব মিঃ জিন্নাহ্‌কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: সংবাদপত্রে নিশ্চয় আপনি পড়েছেন চারপাশ থেকেই জুনাগড়ের কাজের বিরুদ্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এদিক থেকে আমাদের মনোভাব অনমনীয়। আমরা আশা করি, জুনাগড়ের অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে পাকিস্তান তাড়াতাড়ি তার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে। আমি আমার রাজস্বমন্ত্রী মিঃ এ, কে ওয়াই আব্রাহনীকে স্থিতি-অবস্থার শর্তগুলি নিয়ে আলোচনা করার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি।

The reports in the Press must have given you an idea that Junaganh is showered with criticism all over. Thanks to Almighty, we are firm We expect an early announcement of the Pakistan Govt. regarding Junagadh's accession to it. I am sending Mr. A. K. Y. Abrahani, Revenue Member of my State Council, to settle the terms of the Standstill Agreement on behalf of my State Govt.

নবনগরের জামসাহেব, এবং পাশাপাশি অন্যান্য স্টেটের রাজারা তো ক্ষেপেই লাল। নবাবের বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেল নাকি! যোগ তো দিলে পাকিস্তানে; সংযোগটা রাখবে কোথা দিয়ে? তা ছাড়া তোমার হিন্দু প্রজারাই বা তা মেনে নেবে কেন? একটি মহারাজা তো তাঁকে ব্যক্তিগত একটা চিঠিই লিখে ফেললেন।

জামসাহেব দিল্লীতে এসে হাজির হলেন। ভারত সরকারকে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে জুনাগড়ে হিন্দুদের ওপরে নির্যাতন চলছে। ভারত সরকার যদি এর একটা বিহিত না করেন তাহলে

[Integrationof Princely States—P. 129].

কাথিওয়াড়ের হিন্দুদের কিছুতেই সংযত করে রাখা যাবে না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে ভারত সরকার কাথিওয়াড় স্টেটগুলিকে রক্ষা করার জন্যে যদি এগিয়ে না আসেন তাহলে অন্তর্ভুক্তির সময় ভারত সরকার তাঁদের যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তার ওপরে আস্থা রাখা আর সম্ভব হবে না।

কিন্তু কাথিওয়াড় স্টেটগুলিকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন?

শোনা যাচ্ছে পাকিস্তান জুনাগড়ের বন্দরগুলিকে ঢেলে সাজানোর জন্যে প্রচুর অর্থসাহায্য করছে। তাছাড়া জোর গুজব, পাকিস্তান জুনাগড়ে সৈন্যবাহিনীও পাঠাচ্ছে।

লর্ড ইসমে সদ্য করাচী থেকে ফিরে এসেছেন। এসব কাহিনী শুনে তিনি হেসে বললেন: দূর, দূর! তাও আবার হয়? জুনাগড়ে পাঠানোর মত বাড়তি সৈন্য পাকিস্তানের রয়েছে নাকি? তাছাড়া জুনাগড় তো পাকিস্তানের একটা বোঝা।

তাহলে জুনাগড় এত লম্ফ-ঝম্প করছে কেন?

ওটা হ'ল পাকিস্তানেরই একটা চাল, ভারত সরকারকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা মাত্র।

অর্থাৎ?

ভারত সরকার যদি এই ফাঁদে পা দেয় তখনই পাকিস্তান হৈ-চৈ করে উঠবে। বিশ্ববাসীকে ডেকে বলবে: দেখ, দেখ, হিন্দুস্তান আমাদের সঙ্গে কী রকম দুর্ব্যবহার করছে। বাইরে বিক্ষুব্ধ দেখালেও, ভেতরে-ভেতরে পাকিস্তান বেশ খুশিই হয়েছে। কংগ্রেস যে মুখে ন্যায়, নীতি আর সাম্যবাদের বড়-বড় বুলি আওড়ায় তা যে বিলকুল ফাঁকা আওয়াজ তা এবারে সব বুঝুক।

পাকিস্তানের আসল লক্ষ্য ছিল ওই কাশ্মীরের ওপর। হিন্দু অধ্যুসিত স্টেটের মুসলমান নবাব পাকিস্তানে যোগ দিলে যদি

হিন্দুস্তানের আপত্তি থাকে, তাহলে মুসলমান অধ্যুসিত কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজা হিন্দুস্তানে যোগ দিলে পাকিস্তানই বা তা মেনে নেবে কেন ?

মোদ্দা কথাটা হল এই।

কিন্তু তাতে নবাবের সুরাহা হল না কিছু।

জুনাগড়ের হিন্দু প্রজারা হৈ-চৈ করতে লাগল। ম্যাংগ্রোল স্টেটের হিন্দু অধিবাসীরা ভারত সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাল। নবাবের সৈন্যেরা তাদের ওপরে নির্যাতন শুরু করেছে।

ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী কদম-কদম এগিয়ে গেল। জুনাগড়ের সীমানার কাছে এসে ছাউনি পাতল, বিচ্ছিন্ন করে দিল জুনাগড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্টেটের মধ্যে অভাব দেখা দিল খাদ্যদ্রব্যের। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী খাবার নিয়ে এগিয়ে গেল। বিপুল অভ্যর্থনা পেল দেশের লোকের কাছ থেকে।

ইতিমধ্যে জুনাগড়ে কংগ্রেস আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠল। রাস্তায়-রাস্তায় মিছিল বেরোল, নবাব-বিরোধী ধ্বনিতে চারপাশ মুখরিত হয়ে উঠল।

বেগতিক দেখে দেওয়ানের ওপরে সব ভার চাপিয়ে দিয়ে নবাব বিমানে চেপে করাচীতে পালিয়ে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন অজস্র ধনরত্ন, চারটি স্ত্রী এবং প্রিয় কুকুরগুলিকে। বিমান-ঘাটিতে গিয়ে হঠাৎ একটি মহিষীর খেয়াল হল তাড়াতাড়িতে তিনি তাঁর শিশুপুত্রটিকে ফেলে এসেছেন। নবাবকে একটু অপেক্ষা করতে বলে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে। শোনা যায়, তিনি অদৃশ্য হওয়ামাত্র, নবাব তাঁর জায়গায় আর দুটি প্রিয় কুকুরকে বিমানে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

বিপদে পড়লেন বেচারা দেওয়ানজি। কংগ্রেসকর্মীদের হুমকি আর দাপাদাপিতে নাজেহাল হয়ে তিনি ভারত সরকারের হাতে

স্টেটের দায়িত্ব তুলে দিলেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল রইল। তারপরে হল 'প্লেবিসাইট'। জনমত কী হবে তা আগে থেকেই জানা ছিল। দেশীয় রাজ্যের তালিকা থেকে জুনাগড়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল। জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে বার্ষিক ভাতা পেলেন। সেই ভাতা পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো সম্প্রতি বাতিল করে দিয়েছেন।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।

বাঁকাই বটে ; তবে তার চেয়েও বাঁকা কাশ্মীরের মহারাজা লেঃ কর্নেল হরি সিং।

কাশ্মীরের মত পাকা আপেলটির দিকে পাকিস্তান যে তাক করে বসেছিল সে-কথা বুঝতে পেরেও সোজা পথে তিনি হাঁটেন নি। প্যারামাউণ্টসির জং ধরা অসিটিকে রঙ করে ভেবেছিলেন তাই দিয়ে তিনি বাজিমাত করবেন।

কিন্তু তার চেয়েও ধারাল রাজনীতির দাঁত।

তাতেই তিনি শেষ পর্যন্ত কাত হয়ে পড়লেন।

পাকিস্তানের মহম্মদ আলি জিন্নাহ্!

জুনাগড় ষ্টেট ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে, মুখে হম্বি-তম্বি করলেও, মনে বেশ খুশীই হয়েছিলেন তিনি। নবাবকে তিনি যত আশ্বাসই দিয়ে থাকুন না কেন, জুনাগড় যে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের ঘাড়ে বোঝা হয়ে চাপবে তা তিনি জানতেন। তাই সেটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ফলে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

তাহলে জুনাগড় নিয়ে তিনি অতটা হই-চই করেছিলেন কেন?

করেছিলেন কংগ্রেসকে টাইট দেওয়ার জন্যে! কোন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ স্টেটের মুসলমান নবাবের যদি পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার অধিকার না থাকে তাহলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন ষ্টেটের হিন্দুরাজারও হিন্দুস্থানে যোগ দেওয়ার অধিকার থাকবে না। এইটাই যদি কংগ্রেসের নীতি হয় তাহলে কাশ্মীর কোন্ দলে যাবে? নাকের বদলে নরুণ নিয়ে হিন্দুস্থান যদি খুশী হয় তো বহুৎ আচ্ছা; অন্যথায় কিল খেয়ে কিল হজম করতে হবে কংগ্রেসকে।

গান্ধী-প্যাটেল-জওহরলালের দৌড় কতটা এবারে তো বোঝা যাবে।

আসলে বোঝার ব্যাপারটা ছিল কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং-এর। তিনি কী বুঝলেন ভগবান জানেন; কিন্তু তিনি চুপচাপ

বসে রইলেন ; হাঁ-ও করলেন না, না-ও করলেন না ; যেন কোথাও কিছু হয় নি, হবে না, হতে পারে না এই রকম একটা মেজাজ নিয়ে একটি অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে বসলেন।

করবেন না-ই বা কেন ? কাশ্মীরের গুরুত্ব কি কম ? তিন-তিনটে দেশের সীমারেখা কাশ্মীরের সীমান্ত বরাবর চলে গিয়েছে। এর পূর্বদিকে রয়েছে তিব্বত ; উত্তর-পূর্বে চীনের সিংকিয়াঙ ; উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান। মেনটাকা গিরিবর্ত্ম দিয়ে গিলগিট থেকে কাসগড় যাওয়ার যে প্রধান সড়কটি রয়েছে তারই পশ্চিমে আফগানিস্তানের শেষ সীমানা ওয়াখান। এরই কিছুটা দূরে রাশিয়ান টার্কিস্তান। ভারত আর পাকিস্তানের নিরাপত্তার দিক থেকে কাশ্মীরের গুরুত্ব কম নয়। হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলেই ওখানে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মেলা বসবে। তখন ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়তে হবে ভারত আর পাকিস্তান তুটি দেশকেই।

কিন্তু গুরুত্ব কমই হোক আর বেশীই হোক; তা নিয়ে মহারাজা হরি সিং বিশেষ ব্যস্ত নন। মরতে যদি হয় তা রামের হাতে মরলেও যা হবে, রাবণের হাতে মরলেও তাই হবে। সিংহ আর বাঘের মধ্যে কোন ফারাক নেই। সুতরাং তাড়াতাড়ি তাদের মুখে মাথাটা গলিয়ে দিয়ে লাভ কী ? যদি তুজনকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেঁচে-বর্তে থাকা যায় তো মন্দ কী !

মহারাজা হরি সিং সেই চেষ্টাই করছিলেন। একটু মগজ খাটাতে পারলে কাশ্মীর যদি স্বাধীন হয়ে যায় তো ভালই।

কিন্তু কাশ্মীর কি কোন জন্মে স্বাধীন ছিল ?

হ্যাঁ, তা ছিল বইকি ! তবে সে প্রায় ছশো বছর আগে। ওখানে তখন বৌদ্ধ আর হিন্দু রাজারা রাজত্ব করতেন। সেসময়কার শেষ হিন্দুরাজা ছিলেন উদয়দেব। আমীর শা ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। আমীর শা রাজাকে হত্যা করে শামসুদ্দিন নাম নিয়ে কাশ্মীরের

সিংহাসনে বসলেন। সময়টা হচ্ছে তেরশো আটতিরিশ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি।

পনেরোশো সাতাশী খৃষ্টাব্দে আকবর বাদশাহ ছিনিয়ে নিলেন কাশ্মীর। বলতে গেলে এই সময় থেকেই কাশ্মীর তার স্বাধীনতা হারায়, প্রায় দুশো বছর ধরে কাশ্মীর ছিল মুঘল সম্রাটদের গ্রীষ্মাবাস। মুঘল সম্রাটদের অনেক স্মৃতিচিহ্ন এখানে ছড়ানো রয়েছে। হরিপর্বত দুর্গ, গালিমার, আকাবল, ভেরিনাগ—সব ক'টিই এই আমলের, তা ছাড়া রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ চিনার বৃক্ষ।

এল সতেরশো বাহান্ন, মুঘল সাম্রাজ্যের তখন অন্তিম অবস্থা। তারই পূর্ণ সুযোগ নিলেন আফগানিস্থানের আহ্‌মেদ শা আবদালি। কাশ্মীর অধিকার করলেন তিনি। আঠারশো উনিশ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে শিখ নেতা মহারাজা রণজিৎ সিংহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করল কাশ্মীর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন এক সময় পর্যন্ত জম্মু শাসন করতেন রাজপুত বংশের ডোগরা সর্দার রণজিৎ দেও। তাঁর মৃত্যুর পরেই সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বংশধরদের মধ্যে যথারীতি বিবাদ শুরু হয়ে গেল। দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। সেই সুযোগে শিখেরা জম্মু আর তার আশেপাশের পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করে বসল।

স্বতন্ত্র কাশ্মীর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গুলাব সিং ছিলেন রণজিৎ দেও-র ভাইয়ের প্রপৌত্র। কেবল গুলাব সিং নয়, তাঁর ভাই ধ্যান সিং এবং সুচেত সিং-ও মহারাজা রণজিৎ সিংহের অধীনে চাকরি করতেন। তাঁদের দক্ষতা আর প্রভু সেবায় তুষ্ট হয়ে মহারাজা তাঁদের পুরস্কৃত করেছিলেন। তিনি গুলাব সিংকে দিয়েছিলেন জম্মু, ভিমবার, আর চিবল। পুন্‌চ দিয়েছিলেন ধ্যান সিংকে, আর সুচেত সিংকে দিয়েছিলেন রাজনগর।

মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয় আঠারোশো উনচল্লিশ সালে।

তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শিখ রাজত্ব ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আঠারোশো ছেচল্লিশ সালে প্রথম শিখ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শিখ আর ইংরাজদের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাতে আপস মীমাংসা করার জন্যে গুলাব সিং এগিয়ে এলেন উভয় পক্ষের মধ্যে।

একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত হল যুদ্ধের খেসারত হিসাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এক কোটি টাকা দিতে হবে ; আর সেই সঙ্গে দিতে হবে বৃহৎ পাঞ্জাবের কিছু অংশ। শিখ মহারাজার পক্ষে অত কাঁচা টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি বিয়াস নদী থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত পার্বত্য রাজ্যগুলি ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। কিন্তু তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ এত টুকরো-টুকরো জায়গা নিতে চাইলেন না। কারণ তাতে কেবল কোম্পানীর সীমান্তই বাড়বে না, উপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যে সমরবিভাগটিকেও বাড়াতে হবে। তা ছাড়া, আরও একটা অসুবিধে ছিল এক কাশ্মীর উপত্যকা ছাড়া অধিকাংশ স্টেটই ছিল পার্বত্য অঞ্চলে; তাদের উৎপাদন শক্তি ছিল সীমিত ; এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঞ্চলগুলি নদীনালায় দুর্গম, এবং অনুর্বর। সেগুলির ওপরে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। লাভের গুড় পিঁপড়েতে চেটে শেষ করে দেবে। এই সব স্টেটগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগদখল করার জন্যে মহারাজা রণজিৎ সিং গুলাব সিংকে দান করেছিলেন। সেই গুলাব সিং এগিয়ে এলেন কোম্পানীর চাহিদা মেটানোর জন্যে। টাকা তিনি দেবেন ; তবে একটি শর্তে। তাঁকে জম্মু আর কাশ্মীরের স্বাধীন নরপতি বলে স্বীকার করতে হবে।

তাতেই রাজী হয়ে গেল কোম্পানী। আঠারোশো ছেচল্লিশ সালের ষোলই মার্চ অমৃতসরে গুলাব সিং-এর সঙ্গে কোম্পানীর একটি পৃথক চুক্তি হল। গুলাব সিং ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেন। ঠিক হল প্রতি বৎসর ব্রিটিশ সরকারকে একটি

ঘোড়া, বারোটি ভাল পশমী লোমওয়ালা ছাগল এবং তিন জোড়া কাশ্মীরী শাল তিনি নজরাণা হিসাবে দেবেন। পরে অবশ্য সেই চুক্তি পরিবর্তিত হয়েছিল ; সেই পরিবর্তনের ফলে কাশ্মীর সরকারকে প্রতি বৎসর দিতে হ'ত তুটি কাশ্মীরী ছাগল, আর তিনটি রুমাল।

অমৃতসর চুক্তি থেকেই স্বতন্ত্র জম্মু আর কাশ্মীরের ইতিহাস শুরু। এরই ফলে কাশ্মীর, জম্মু, লাদাক, গিলগিট নিয়ে সিন্ধু আর রভির মধ্যবর্তী সমগ্র পাহাড়ী জনপদের মালিকানা পেলেন মহারাজ গুলাব সিং। তিনি পেলেন না কেবল লাহোল, কুলু, আর ছাম্বের কয়েকটি অঞ্চল। প্রতিরক্ষার দিক থেকে অঞ্চলগুলির গুরুত্ব ছিল বলেই কোম্পানী সেগুলি হাতছাড়া করতে চায় নি। অবশ্য অধর্ম করেনি কোম্পানী। এই অঞ্চলগুলি হাতে রাখার জন্যে পঁচিশ লক্ষ টাকা মকুব করা হয়েছিল মহারাজার।

গোলমাল বাঁধালেন কাশ্মীর উপত্যকায় যে শিখ প্রশাসক ছিলেন তিনি। কাশ্মীর উপত্যকা ছেড়ে দিতে তিনি রাজী ছিলেন না। ব্রিটিশ সরকারের শরণাপন্ন হলেন গুলাব সিং ; এবং, শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাহায্যে তিনি কাশ্মীরে প্রবেশ করলেন।

আঠারোশো উনপঞ্চাশ খৃষ্টাব্দের আগে জম্মু আর কাশ্মীরের সঙ্গে কোম্পানীর কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। স্থাপিত হওয়ার পরেও কাশ্মীরে সরাসরি কোন রাজপ্রতিনিধি পাঠায়নি কোম্পানী। পাঞ্জাব সরকার আর লাহোরে অবস্থিত মহারাজার প্রতিনিধির মাধ্যমেই কোম্পানির কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করা হ'ত। আঠারোশো বাহান্ন সালেই এই স্টেটটির জন্যে প্রথম একজন ব্রিটিশ অফিসার নিযুক্ত হলেন। তাঁকে বলা হত 'অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি'। এক গ্রীষ্মকাল ছাড়া কাশ্মীর উপত্যকায় স্থায়ী-ভাবে তিনি বসবাস করেন নি।

গুলাব সিং মারা যান আঠারোশো সাতান্ন সালে। তাঁর মৃত্যুর পরে মহারাজা হলেন তাঁর পুত্র রণবীর সিং। আঠারোশো পঁচাশি

সালে তাঁর মৃত্যু হলে সিংহাসনে বসেন মহারাজা প্রতাপ সিং। এঁরই সময়ে কাশ্মীরে প্রথম ব্রিটিশ 'রেসিডেন্ট' নিযুক্ত হয়। তিনি পাকা-পাকিভাবে কাশ্মীরেই বসবাস করতেন।

উনিশশো পঁচিশ খৃষ্টাব্দের তেইশে সেপ্টেম্বর লেঃ জেনারেল মহারাজা হরি সিং জম্মু ও কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

স্টেটটিকে চারটি স্বাভাবিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। দক্ষিণে জম্মু; কেন্দ্রে কাশ্মীরের 'হ্যাপি ভ্যালি'; এইখানেই কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর। উত্তরে গিলগিট। কাশ্মীর উপত্যকা আর তিব্বতের মধ্যে যে অঞ্চলটি রয়েছে তাকে বলা হয় লাদাক।

জম্মু আর কাশ্মীরে মুসলমানদের সংখ্যা চিরকালই বেশি। কিন্তু ভারত বিভাগের পরে কাশ্মীর আর পাকিস্তান থেকে মুসলমান আর হিন্দুদের যাওয়া-আসার ফলে জনসংখ্যার কিছুটা হেরফের হয়েছে, লাদাকে প্রাধান্য রয়েছে বৌদ্ধদের।

হরি সিং ছিলেন হাড়ে-মজ্জায় রাজা; এবং অন্যান্য অনেক দেশীয় রাজাদের মতই পয়লা নম্বরের শোষক আর বিলাসী। তাঁর রাজত্বে প্রজাদের দুর্দশার আর শেষ ছিল না। প্রজারা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র; করের বোঝার ভারে মাটিতে শুয়ে পড়েছিল তারা। আর সেকি একটা আধটা কর? ঘরের জানালার ওপরে কর বসে এমন কথা কোথাও শুনেছেন? কাশ্মীরে তা ছিল। ফলে, কাশ্মীরে অনেক অধিবাসীদের ঘরে কোন জানালাই ছিল না। তাছাড়া ছিল উনুনের ওপরে কর; ছিল গরু-ভেড়া-ছাগল হাঁস-মুরগীর ওপরে কর; আর ছিল বিবাহিতা স্ত্রীর ওপরে কর। এক কথায়, করের পাহাড় চাপানো ছিল কাশ্মীরের জনগণের ওপরে। আর সেই বিরাট টাকা খরচ হত মহারাজা এবং তাঁর অনুগ্রহপুষ্ট উচ্চপদস্থ কিছু হিন্দু কর্মচারীদের জন্যে।

জম্মু আর কাশ্মীরের জনসংখ্যার দিক থেকে মুসলমানদের বিরাট সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও সরকারী আমলাতন্ত্র আর সমর বিভাগের প্রায় সমস্ত দায়িত্বশীল পদগুলিই ছিল হিন্দুদের জন্যে সংরক্ষিত। এর

জন্যে মুসলমানদের কাছ থেকে অভিযোগ কম আসেনি ; কিন্তু সে সব শোনার মত সময় আর মানসিক প্রস্তুতি কিছুই ছিল না তাঁর। মহারাজা হরিসিং-এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন শেখ আবদুল্লা। উনিশশো বত্রিশ সালে তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল 'সর্ব জম্মু ও কাশ্মীর কনফারেন্স'। এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির একমাত্র কাজ ছিল মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা ; আর সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত স্বৈরাচারি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নামা। কিন্তু কয়েকটি বছরের মধ্যেই এই সংগঠনটি তার সাম্প্রদায়িক রং পরিবর্তন করে নতুন নামে প্রতিষ্ঠিত হল ঃ জাতীয় সভা—National Conference. হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান নির্বিশেষে ষ্টেটের সমস্ত জনসাধারণের জীবনের মান উন্নত করার আদর্শেই এই জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানটি আত্মনিয়োগ করল। পরবর্তী কালে এটি নিখিল ভারতীয় 'ষ্টেট পিউপিলস কনফারেন্সে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এই জাতীয় সংগঠনটি রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বারবার আন্দোলন চালিয়েছে। সেই অন্দোলনগুলিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন শেখ আবদুল্লা। ফলে বারবারই তাঁকে কারা রুদ্ধ হতে হয়েছে।

মহারাজার ধারণা সীমান্তের ওপার থেকে ভারতীয় কংগ্রেসই শেখ আবদুল্লাকে উস্কানি দিচ্ছে। তাই জম্মু আর কাশ্মীর ষ্টেটে কংগ্রেসী আন্দোলনকে তিনি বেআইনী বলে ঘোষণা করলেন। এইখানেই থামলেন না তিনি ; নির্দেশনামা জারি করলেন যে যদি কোন কংগ্রেসী নেতা জম্মু এবং কাশ্মীর ষ্টেটে প্রবেশ করেন তাহলে তাঁকে বিনা বিচারে আটক করা হবে।

হরি সিং নতুন কিছু করেননি। দেশীয় রাজাদের নীতিই তিনিও মেনে নিয়েছিলেন। স্বাধীন হওয়ার স্বপ্নে সব রাজারাই তখন মসগুল। পাছে সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এই ভয়ে তাঁরা কংগ্রেসী

নেতাদের যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন। হরিসিং-ই বা অরাজকীয় কাজ করবেন কেন ?

কিন্তু সে-সুখ তাঁর কপালে সইল না। শেখ আবদুল্লাই তাঁকে ঘায়েল করে দিলেন। উনিশশো ছেচল্লিশ সালে মহারাজার বিরুদ্ধে তিনি একটি নতুন আন্দোলন শুরু করলেন ; এই আন্দোলনের নাম 'কাশ্মীর ছাড়'। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনটি অবশ্য মোটেই নতুন নয়। চার বছর আগে ভারতীয় কংগ্রেসও ইংরাজদের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসী নেতাদের সেদিন ছেড়ে দেয়নি ; হরি সিংও ছাড়লেন না, শেখ আবদুল্লাকে দীর্ঘদিনের জন্যে কারারুদ্ধ করলেন।

উনিশশো সাতচল্লিশ সালে জম্মু আর কাশ্মীরের এই হল মোটামুটি পরিস্থিতি। কাশ্মীরে চারপাশেই তখন শুকনো কাঠ স্তূপীকৃত হয়ে জমেছিল। একটি স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা মাত্র।

ভারতকে দু'টো ভাগে ভাগ ক'রে লর্ড মাউন্টব্যাটন তখন দিল্লীতে দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে তাই নিয়ে রাজপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত রামচন্দ্র কাক দিল্লীতে এসে হাজির হলেন। সেই আলোচনাতে যোগ দেওয়ার জন্যে পাতিয়ালার মহারাজা তাঁকে অনুরোধ জানালেন।

এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা রাখতে পারেন নি ; রাখা নাকি সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। পরে অবশ্য তিনি সর্দার প্যাটেল আর লর্ড মাউন্টব্যাটনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ; জিন্নাহ্ সাহেবকেও অসন্তুষ্ট করেন নি। তবে তাঁর উদ্দেশ্যটা কী ছিল সে-কথা কেউ জানে না।

মহারাজা কোন্ ডোমিনিয়নের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ? প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁকে।

এখনও কিছু ঠিক হয় নি—উত্তর দিয়েছিলেন পণ্ডিত কাক।

কিন্তু একটি ডোমিনিয়নের সঙ্গে তো যোগ দিতেই হবে ?

অনিশ্চিতভাবে ঘাড় নেড়েছিলেন পণ্ডিত রামচন্দ্র কাক : দেখা যাক কী হয়।

দিন এগিয়ে আসছে, ফুটো পাত্রে জলের মত শেষ হয়ে আসছে সময়। এখনও 'দেখা যাক' ? দেখার আর রয়েছে কী ?

দেখার কী ছিল ভগবান জানেন। কিন্তু হরি সিং দেখেই চললেন।

আর কংগ্রেস ? সেও কি চোখ বন্ধ করে বসে ছিল ? ব্যাপারটি নিঃসংশয়ে বিস্ময়কর। কংগ্রেস নেতাদের এই রকম ঢুলু-ঢুলু ভাব আর কখনও দেখা যায় নি।

তাহলে কি হরি সিং-এর প্রেমে পড়েছিল কংগ্রেস ?

মোটেই না, আসল কথাটা হচ্ছে দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে কংগ্রেস নিজেই তখন হিমসিম খাচ্ছেন। কাশ্মীরের দিকে নজর দেওয়ার সময় ছিল না তার।

তা ছাড়া, নজর দেওয়ারও অসুবিধে ছিল বেশ। কাশ্মীর হচ্ছে মুসলমান-প্রধান দেশ। যদিও ধর্মভিত্তিক কোন রাষ্ট্রের ওপরে কংগ্রেসের আস্থা ছিল না, তবু যে কোন কারণেই হোক, ওই ধর্মের ভিত্তিতেই ভারত দু-ভাগে বিভক্ত হয়েছে। সুতরাং কাশ্মীরের জনসাধারণ যদি কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্র অর্থাৎ পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে চায় তাহলে তার বিরুদ্ধে কিছু বলাটা কংগ্রেসের বহুঘোষিত নীতিরই পরিপন্থী হবে। ফলে শক্ত হবে জিন্নাহ্ সাহেবের হাত। তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভাল। হরি সিং হিন্দু। দেখাই যাক না তিনি কী করেন।

এ ছাড়া, চুপ করে বসে থাকার অন্য কোন কারণ ছিল না কংগ্রেসের। যে স্বৈরাচারী রাজা দেশের যাবতীয় গণ-আন্দোলনের টুঁটি টিপে ধরেছেন, দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কারারুদ্ধ করেছেন, কংগ্রেসকর্মীদের ওপরে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছেন, এবং জম্মু অথবা কাশ্মীর এলাকাতে পা দেওয়া মাত্র

গ্রেপ্তার করা হবে বলে পণ্ডিত নেহেরুকে হুমকি দিয়েছেন, তাঁকে ভালবাসার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাই ভালবাসার কথা নয়। রাজনীতিতে ও-বস্তুটি মেকী টাকার মত অচল। ছলে-বলে-কৌশলে আদায় করতে হবে কাজ। সেই কৌশলের আশ্রয় নিল কংগ্রেস।

কংগ্রেস নেতারাও চাচ্ছিলেন না মহারাজা তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে ফেলুন। সেইজন্যে গোপনে তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছিল। স্বয়ং গান্ধীজিও চুপচাপ বসে থাকার অনুরোধ জানিয়ে মহারাজ হরি সিং-এর কাছে একটি গোপন চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

এতেও ভরসা পেলেন না জহরলাল ; ঠিক করলেন তিনি নিজেই কাশ্মীরে যাবেন।

গান্ধীজি দেখলেন বিপদ। উনিশশো ছেচল্লিশ সালের সেই সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্তে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনি এমন একটি উক্তি করে বসেছিলেন যার ফলে কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনাটি যে কেবল বানচাল হয়ে গেল তা-ই নয়, ভারত বিভাগের দুর্গম পথটি হঠাৎ সুগম হয়ে গেল। আবার কাশ্মীরেও যদি সেই ঘটনা ঘটে! তাই তিনি বললেন : কাশ্মীরে ঢোকার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তোমার ওপরে। আগে আমি যাই। তোমার যাওয়ার পথ প্রশস্ত করে আসি।

লর্ড মাউণ্টব্যাটন দেখলেন কাশ্মীরে গেলেই গান্ধীজি পরিস্থিতিটিকে আরও জটিল করে তুলবেন। সেই জট ছাড়াতে কালঘাম ছুটে যাবে তাঁর। তাই তিনি বললেন : অত ঝামেলার দরকার নেই। আমি নিজেই যাব। মহারাজ আমার পুরনো বন্ধু। উনিশো একুশ সালে প্রিন্স-অফ-ওয়েলস যখন ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন আমরা দু'জনেই তাঁর স্টাফ অফিসার ছিলাম। কাশ্মীর যাওয়ার জন্যে তিনি আমাকে আগেই আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন। এই সুযোগে সেই আমন্ত্রণটি রক্ষা করে আসি।

উনিশশো সাতচল্লিশ সালের একুশে জুন জর্জ অ্যাবেলকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয়দর্শী এবং প্রিয়বাদী লর্ড মাউন্টব্যাটন পুরনো বন্ধু মহারাজ হরি সিং-এর প্রাসদ শ্রীনগরে হাজির হলেন। উষ্ণ আবেগে মহারাজা তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন; ব্যক্তিগত কুশল সংবাদ আদান-প্রদান করা হল, পুরনো দিনের কাহিনী আলোচিত হল. ভারতবর্ষ কেমন লাগছে তাঁর সে প্রশ্নও করলেন মহারাজা, কাশ্মীরের আবহাওয়া আর প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে অনেক কথা বললেন তিনি। কিন্তু আসল কথাটা একবারও বললেন না মহারাজ।

শেষ পর্যন্ত মাউন্টব্যাটনকেই তুলতে হল কথাটা। নাচতে নেমে ঘোমটা দিয়ে লাভ নেই।

কী করছেন আপনি?

ভাবছি।

কী ভাবছেন?

কী করব।

ব্যস। ঠোঁট দুটি বন্ধ হয়ে গেল মহারাজা হরি সিং-এর।

লর্ড মাউন্টব্যাটন বললেনঃ যাই করুন, ভগবানের দোহাই স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন না।

ভ্রূ কোঁচকালেন মহারাজা। অর্থাৎ কেনঃ

মাউন্টব্যাটন বললেনঃ আপনার স্টেটের ভৌগলিক অবস্থান যা তাতে পনেরোই অগস্টের পরে স্বাধীন থাকাটা আপনার পক্ষে বিপজ্জনক হবে। সুতরাং যা করবেন, চোদ্দই অগস্টের মধ্যেই তা ঠিক করে ফেলুন। আপনি দুটি ডোমিনিয়নের যে-কোন একটির সঙ্গে যোগ দিন; কোন্ ডোমিনিয়নে যোগ দেওয়া উচিত সে-বিষয়ে আপনার স্টেটের জনসাধারণের সঙ্গে প্রয়োজন হলে আলোচনা করুন! একথাও আপনাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি আপনি যদি পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে চান, ভারত কিছুতেই মনে করবে না যে আপনি ভারতবিদ্বেষী কোন কাজ করেছেন।

এ সম্বন্ধে ক্যাম্পবেল জনসন বলেছেন : When he got there he found the Maharaja politically very elusive, and the only conver-sations which took place were during their various car drives together, Mountbatten on these occassions urged him and his Prime Minister Pandit Kak, not to make any declaration of Independence, but to find in one way and another the will of the people of Kashmir as soon as possible and to announce by August 14 their intention to send representatives accordingly to one Constituent Assembly or the other.

লর্ড মাউন্টব্যাটন মহারাজাকে বললেন : আপনার সঙ্গে আমার কিছু গোপন কথা রয়েছে।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ ভাইসরয় হিসাবে আপনাকে আমি কিছু গোপন পরামর্শ দিতে চাই।

বেশ তো ; আপনি যেদিন যাবেন সেই দিনই হবে।

সায় দিলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটন।

বিদায় নেওয়ার দিন মহারাজাকে দেখা গেল না। দেখা গেল কর্মচারীর হাতে একখানি চিঠি। মহারাজা লিখছেন : শূলবেদনায় শয্যাগত। সেই জন্যে আপনার সঙ্গে গোপন আলোচনায় বসতে পারলাম না।

জানা গেল এই রকম মিথ্যা শূলবেদনায় মাঝে মাঝে তিনি কাবু হন। কোন কঠিন সমস্যাকে এড়ানোর জন্যে এই রকম অজুহাতের আশ্রয় নিতে হয় তাঁকে। কিন্তু মহারাজার সেই দিনের ব্যবহারে লর্ড মাউন্টব্যাটন বেশ হতাশ হয়েছিলেন। কিছুতেই মহারাজাকে বাগ মানানো যাচ্ছে না। কেবলই তিনি পিছলে-পিছলে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন মাউন্টব্যাটনের মত ঝানু ডিপ্লো-ম্যাটের তা না বোঝার কথা নয়। মহারাজ হরি সিং ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে স্বাধীন স্বর্গরাজ্য বানাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এরকম স্বপ্ন অথবা দুঃস্বপ্ন অনেক রাজা-মহারাজাই দেখেছিলেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটন তাঁদের কাউকেই প্রশ্রয় দেন নি। কাউকে মিষ্টি কথা বলে, কাউকে ভয় দেখিয়ে তিনি কাজ হাসিল করেছেন।

একমাত্র কাশ্মীরের ক্ষেত্রেই তিনি কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়লেন। অথচ, অন্যান্য দেশীয় রাজ্য থেকে কাশ্মীরের সমস্যা পৃথক, তার ভৌগলিক অবস্থান বেশী জটিল। এর একদিকে হিন্দুস্থান, আর একদিকে পাকিস্তান। এর উত্তরে তিনটি বৈদেশিক রাজ্যের সীমানা। ওইসব অঞ্চলের যে কোন একটি দিক থেকে বৈদেশিক আক্রমণ শুরু হতে পারে। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের নিরাপত্তার দিক থেকেও কাশ্মীরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনের দিক থেকে যে-কোন একটি ডোমিনিয়নের সঙ্গে তাকে যোগ দিতে হবে। কাশ্মীর সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হলে হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হবে।

এত সব জেনেও মাউন্টব্যাটন হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন।

পনেরোই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের পালা শেষ হল। মহারাজা হরি সিং তখনও চুপচাপ। একবার শেষ চেষ্টা করার জন্য লর্ড ইসমে গেলেন শ্রীনগরে। লর্ড মাউন্টব্যাটন বলে দিলেন : মহারাজার সঙ্গে দেখা করে এস। নিয়ে এস তাঁর পাকা কথা। ফিরে এলেন ইসমে। পাকা কথা দূরে থাক, কাঁচা কথাও পেলেন না তাঁর। অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে মহারাজা তখনও কিছু স্থির করতে পারেন নি।

যে যাই বলুক, একটা কিছু সিদ্ধান্তে আসা মহারাজার পক্ষেও কষ্টকর ছিল। যদি তিনি পাকিস্তানে যোগ দেন তাহলে জম্মু আর লাদাকের অ-মুসলমান সম্প্রদায় আর সেই সঙ্গে ন্যাশন্যাল কনফারেন্স এর অনুগত অসংখ্য মুসলমান তা মেনে নেবে না। যদি তিনি

ভারতের সঙ্গে হাত মেলান তাহলে গিলগিট আর পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী মুসলমানেরা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করবে। পাকিস্তানকে চটাতে তিনিও বেশ ভয় পাচ্ছিলেন। তখন কাশ্মীর থেকে বাইরের জগতে আসার প্রধান সড়কটিই ছিল পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে। কাশ্মীরের প্রধান আয় হত তার বনজ সম্পদ, বিশেষ করে কাঠ, থেকে। সেই কাঠ চালান যেত নদীপথে, এবং সেই নদীগুলির সব ক'টিই পাকিস্তানের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে করলে পাকিস্তান কাশ্মীরকে শুকিয়ে মারতে পারে।

সত্যি বড় বিপদে পড়েছিলেন মহারাজা হরি সিং।

কিন্তু তবু কোন পথই যে তাঁর খোলা ছিল না সেকথা সত্যি নয়। তিনি যদি তাঁর বিবর থেকে বেরিয়ে এসে খোলা জম্মু আর কাশ্মীরের জন-প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনায় বসতে পারতেন, সেই পরিস্থিতিতে তাঁর কী করা উচিত সে-বিষয়ে যদি তাঁদের উপদেশ নিতেন, তাহলে এই সঙ্কট সম্মানজনক ভাবে কাটিয়ে ওঠা হয়তো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত না।

কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না; শুনলেন না কারও কথা। কিছু না করেই তিনি আশা করতে লাগলেন কোন এক জাদুমন্ত্রবলে সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যাবে। অর্থাৎ, সাপও মরবে, তাঁর রাজ-দণ্ডটিও মচকাবে না।

ক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক পরেই মহারাজা হরি সিং পণ্ডিত রামচন্দ্র কাককে সরিয়ে তাঁর জায়গায় নতুন প্রধানমন্ত্রী করলেন মেজর জেনারেল জনক সিংকে। তারপর জম্মু ও কাশ্মীর সরকার ভারত আর পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টায় স্থিতি অবস্থা ঘোষণা করল।

সেই চুক্তি সই করল পাকিস্তান।

কিন্তু ভারত করল না। চুক্তিটি পরীক্ষা করার জন্যে সময় নিতে লাগল।

আসল কথা, সময় নিচ্ছিল কংগ্রেস। তখনও কংগ্রেস নেতাদের কেমন যেন ধারণা ছিল যে অনতিবিলম্বেই মহারাজা শেখ আবতুল্লাকে ছেড়ে দেবেন। জেল থেকে বেরিয়েই আবতুল্লা সাহেব তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা আর সংগঠন নিয়ে মহারাজাকে ভারতে যোগ দেওয়ার জন্যে চাপ দেবেন।

কিন্তু সে-সময় আর ছিল না। গোলমাল শুরু হয়ে গেল কাশ্মীর উপত্যকায়। পুন্‌চ-এর মুসলমান অধিবাসীরা চিরকালই তুর্ধর্ষ। পুরনো ব্রিটিশ সৈন্যদলে এদের অনেকেই কাজ করত। ভারত বিভাগের পরে, পুন্‌চ-এর সেই সব জঙ্গী সৈন্যরা আন্দোলন করে মহারাজকে জানিয়ে দিল: 'কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।'

মুসলমানরা যখন মিছিল করে তাদের দাবি জানাচ্ছিল সেই সময় মহারাজার হিন্দু সেনানীরা তাদের উপরে গুলি ছুঁড়ল। এতে উত্তেজিত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল; এবং মহারাজা হিন্দু পলটনদের সাময়িক ভাবে তাড়িয়ে দিল। ধীরে ধীরে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে লাগল মুসলমানদের মধ্যে; এতদিন যে-ধ্বনি তুলতে কেউ সাহস করে নি সেই ধ্বনি উঠতে লাগল কাশ্মীর উপত্যকার বিশেষ বিশেষ এলাকায়—পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

বোঝা গেল এই অবস্থা আর কিছুদিন চললে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানই কিস্তিমাৎ করবে।

মহারাজা হরি সিং কিন্তু তখনও চুপচাপ।

মহারাজাকে নির্বাক অবস্থায় বসে থাকতে দেখে পাকিস্তানও বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত তীরে এসে তরী ডুবলে আপসোসের আর শেষ থাকবে না। তাই পাকে প্রকারে তাঁকে টাইট দেওয়ার চেষ্টা করল। স্থিতি অবস্থার চুক্তিটি ধুয়ে ধুয়ে কতদিন আর জল খাওয়া যায়!

এই টাইট দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হল কাশ্মীরকে শুকিয়ে মারার

চেষ্টা! যে প্রধান সড়ক দিয়ে খাবার, রসদ, পেট্রল, আর অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কাশ্মীরে ঢুকত সেটিকে বন্ধ করে দিল পাকিস্তান। দুটি দেশের মধ্যে এতদিন বিনা বাধায় লোক চলাচল করছিল; সে সুবিধেটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। কাশ্মীরে একটা কিছু গোলমাল বাধানোর চেষ্টায় ছিল পাকিস্তান। হঠাৎ সে-রকম একটা মওকাও মিলে গেল। পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত হয়ে যে সব হিন্দুরা জম্মুতে আস্তানা নিয়েছিল তারা পাঞ্জাব হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে জম্মুর সংখ্যালঘু মুসলমানদের মারধোর করল, জ্বালিয়ে দিল তাদের ঘরবাড়ি। তারপরেই শুরু হল বদলা নেওয়ার পালা।

এক কথায় জম্মু আর কাশ্মীরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উত্তেজনায় থম-থম করতে লাগল সারা দেশ। অথচ তেলের অভাবে দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে যথাসময়ে সৈন্য পাঠানোও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

বিপদ সঙ্কেত গেল ভারত সরকারের কাছেঃ পাকিস্তান তেল দিচ্ছে না। পাঁচ হাজার গ্যালন পেট্রল পাঠাও। যানবাহন সব অকেজো হয়ে গিয়েছে।

মহারাজার বিপদের কথা শুনে পাঁচশো গ্যালন পেট্রল পাঠিয়ে দিল ভারত সরকার।

মনস্কামনা পূর্ণ হল পাকিস্তানের। শুরু হল নতুন পরিকল্পনা। কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো থেকে হামলাদারেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। আসাম সীমান্তে কিছুদিন আগে পাকিস্তান যে কৌশল গ্রহণ করেছিল এখানেও তা খাটাতে চেষ্টা করল। হামলাদারেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকে আসে, বেছে বেছে অ-মুসলমানদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়, গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী নিয়ে কেটে পড়ে, লুঠ করে, হত্যা করে, নারীদের ধরে নিয়ে যায়। পুলিসের তাড়া খেয়ে গভীর অরণ্যে পালিয়ে যায়; আবার ঢুকে আসে অন্য পথ দিয়ে।

ব্যাপার দেখে সত্যিকারের দুশ্চিন্তায় পড়লেন হরি সিং। পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরের সীমান্ত হচ্ছে প্রায় সাড়ে চারশো মাইলের কাছাকাছি। এই দীর্ঘ সীমান্তে হামলাদারদের প্রতিরোধ করার জন্যে যে বিরাট বাহিনীর প্রয়োজন, মহারাজার তা ছিল না। যেটুকু ছিল সেইটুকুকেই ছড়িয়ে দিতে হল। এর পরে যদি সত্যিকার আক্রমণ শুরু হয় তাহলে তাকে ঠেকাবে কে?

অক্টোবরের গোড়ার দিকে কাশ্মীরের মন্ত্রীপরিষদে আবার কিছু রদবদল হল। মেজর জেনারেল জনক সিং-এর জায়গায় এলেন মেহেরচাঁদ মহাজন।

প্রধান মন্ত্রী হয়েই মেহেরচাঁদ মহাজন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত ভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন: পাকিস্তানের সঙ্গে যে স্থিতি অবস্থার চুক্তি হয়েছিল পাকিস্তান তা একক ভাবেই ভঙ্গ করেছে। দেশের জন্যে যে-সব নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের প্রয়োজন সেগুলি তো সরবরাহ করছেই না, বরং, কোথাও কোথাও সেই সরবরাহে পরিকল্পনার সঙ্গে বাধার সৃষ্টি করছে। শিয়ালকোট থেকে জম্মু পর্যন্ত যে সব রেলগাড়ি চলাচল করছিল কোন কারণ না দেখিয়েই সেগুলিকে সে বন্ধ করে দিয়েছে। গুরুদাস-পুর থেকে গিলগিট পর্যন্ত স্টেটের সীমান্ত এলাকার ওপরে পাকিস্থানী হামলাদারেরা বেপরোয়া আক্রমণ চালানোর হুমকি দিচ্ছে; এবং পুন্চ এলাকাতে সত্যি সত্যিই হামলা শুরু করেছে।

সুতরাং পাকিস্তানের ওপরে আপনি চাপ দিন সে যেন ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর একটি রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুভাবে বসবাস করে।

কাকস্য পরিবেদনা। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এর কোন উত্তর এল না।

অভিমানে ভেঙে পড়লেন কাশ্মীরের মহারাজা। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারও তাঁকে ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে?

কিন্তু অভিমানে নষ্ট করার মত সময় তখন ছিল না। তাই আঠারোই অক্টোবর পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁর কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হল : 'স্থিতি অবস্থা'র চুক্তিটি আপনারা ভঙ্গ করেছেন। সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানী হামলাদারদের সংযত করুন।

বিশে অক্টোবর জিন্নাহ্ সাহেবের উত্তর এল। বোঝা গেল, কাশ্মীর সরকার যে ভাষায় টেলিগ্রাম করেছে তাতে তিনি অপমানিত বোধ করেছেন।

কিন্তু অভিযোগগুলি কি তিনি অস্বীকার করেন ?

আলবৎ।

তাহলে খাবার-দাবার আসছে না কেন ?

তার জন্যে দায়ী ভারতের হিন্দু সরকার।

যথা ?

পূর্ব-পাঞ্জাবে হিন্দু জহ্লাদেরা প্রচণ্ড দাঙ্গা শুরু করেছে ; নৃশংস-ভাবে হত্যা করছে নিরপরাধ মুসলমানদের। যানবাহন থেকে শুরু করে প্রশাসনিক যন্ত্র সবই অচল হয়ে গিয়েছে। খাবার আসবে কেমন করে ?

কয়লা ?

বাড়ন্ত।

পেট্রল ?

দেওয়ার মত আমাদের নেই।

আর পাকিস্তানী হামলাদার ?

ওরা হামলাদার হতে পারে ; কিন্তু পাকিস্তানী নয়। ওরা হচ্ছে মহারাজার পোষা গুণ্ডাবাহিনী। পাকিস্তানকে জগতের চোখে বেইজ্জং করার জন্যে হিন্দু মহারাজার এটা একটা চাল।

সাফ কথা বলে দিলেন জিন্নাহ্ সাহেব।

এর পরে কী করা উচিত তাই হয়তো ভাবছিলেন মহারাজা।

কিন্তু ভাববার সময় পেলেন না। এক নতুন সমস্যা দেখা দিল কাশ্মীর উপত্যকায়।

তারিখটা হচ্ছে বাইশে অক্টোবর। কাশ্মীর সীমান্তে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। মুসলমান ধর্ম আজ বিপন্ন; মুসলমান জাতি আজ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। কাফেরদের আমরা ক্ষমা করব না। হিন্দুরাজাকে কোতল কর।

এই বলে চিৎকার করতে করতে প্রায় দুশো থেকে তিনশো লরী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এবটাবাদ থেকে ঝিলম নদীর উপত্যকা ধরে বোঁ-বোঁ করে কাশ্মীরের দিকে এগিয়ে এল। এই সব লরীতে ছিল প্রায় পাঁচ থেকে ছ' হাজার সীমান্ত এলাকার সশস্ত্র মানুষ। এদের মধ্যে ছিল আফ্রিদি, ওয়াজির, মাসুদ, সোয়াথি; তাদের সঙ্গ দিয়েছিল (!) উপভোগরত পাকিস্তানবাহিনীর সৈন্য। তাদের অগ্রগতির রীতি আর শৃঙ্খলার নীতি দেখে বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হল না যে জম্মু আর কাশ্মীরের ছক তাদের নখদর্পণে।

এদের লক্ষ্য ছিল তিনটি জিনিয়ের ওপরে; হিন্দু নারী, লুণ্ঠন, এবং নরহত্যা। তৈমুরলঙ আর নাদিরশাহের মত যে পথ দিয়ে তারা আসছিল সে-পথের দুপাশে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ক্ষেত-খামার নষ্ট করে গ্রামকে গ্রাম তারা উজাড় করে দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে ছিল হাজার-হাজার গ্যালন পেট্রল, মেশিনগ্যান, মর্টার হালকা ধরনের কামান, বন্দুক আর সেই সঙ্গে অসংখ্য যানবাহন। সীমান্তবর্তী এলাকার দরিদ্র জনসাধারণ এই বিরাট রণসম্ভার কোথা থেকে সংগ্রহ করল সে-সম্বন্ধে পাকিস্তান আজও নীরব।

বিদ্যুতের বেগে, এবং বিনা বাধায় তারা গর্থি (Garthi) আর দোমেল (Domel) অধিকার করল; তারপর হাজির হল মুজাফ-ফারাবাদের ফটকের কাছে। মুজাফফারাবাদে একটি স্টেট গ্যারিসন ছিল। এর অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল নারায়ণ সিং। তাঁর বাহিনীতে ডোগরাও ছিল, মুসলমানও ছিল। হানাদারদের দেখেই

ব্যাটালিয়নের মুসলমান সেনানীরা গ্যারিসন পরিত্যাগ করল; অধিনায়ক এবং তাঁর নিম্নপদস্থ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করল; মিশে গেল হানাদারদের দলে। তারপরে পথপ্রদর্শক বাহিনী হিসাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল তাদের।

হানাদাররা তারপর কাশ্মীরের রাস্তা ধরে বারমুলার দিকে এগিয়ে চলল। তাদের লক্ষ্য ছিল উরি। যতই তারা কাশ্মীরের পথে এগোতে লাগল ততই তাদের দল ভারি হতে লাগল। মহারাজার ব্যারাকে যত মুসলমান সৈন্য ছিল সব ব্যারাক ছেড়ে পালিয়ে গেল; তাদের মধ্যে অনেকেই হানাদারদের দলে গেল ভিড়ে।

কাশ্মীর স্টেটের চিফ-অফ-ষ্টাফ তখন ছিলেন ব্রিগেডিয়ার রাজিন্দর সিং। মুসলমান সেনানীরা যে ব্যারাক ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে সে-সংবাদ তাঁর কানে গেল। হানাদাররা যে উরির দিকে এগিয়ে আসছে সে-সংবাদও তিনি পেলেন। উরিতে ঢুকতে দিলে যে কাশ্মীরের নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হয়ে উঠবে তা বুঝতে পেরে তিনি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। একশো পঞ্চাশ জনের মত সৈন্য নিয়ে তিনি হানাদারদের বাধা দিতে এগিয়ে গেলেন। দুটি দিন ধরে আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত বিপুল হানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন তিনি। সেই যুদ্ধে তিনি এবং তাঁর সহচরেরা সবাই নিহত হলেন; কিন্তু তার আগেই উরির সেতুটিকে তাঁরা উড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন।

হানাদাররা অন্য পথ ধরে এগিয়ে চলল। চব্বিশে অক্টোবর তারা 'মথুরা পাওয়ার হাউস'টিকে দখল করে নিল; এখান থেকেই শ্রীনগরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত। এই কেন্দ্রটি দখলের ফলে শ্রীনগর অন্ধকার হয়ে গেল।

হানাদাররা ঘোষণা করল ছাব্বিশে অক্টোবর তারা শ্রীনগরে উপস্থিত হয়ে শ্রীনগর মসজিদে ঈদ উৎসব উদযাপন করবে।

চব্বিশে অক্টোবর সন্ধ্যার দিকেই কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে

জরুরী সাহায্যের একটি আবেদন এল ভারত সরকারের কাছে। সৈন্য পাঠাও, রসদ পাঠাও, খাবার পাঠাও।

পরের দিন সকালে লর্ড মাউন্টব্যাটনের সভাপতিত্বে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের আলোচনা শুরু হল।

সর্দার প্যাটেল বললেন: মহারাজ হরি সিংকে এখনি আমাদের সব রকম সাহায্য করা উচিত।

পণ্ডিত নেহেরুও নিমরাজী হয়ে বললেন: তা তো বটেই।

বাদ সাধলের স্বয়ং মাউন্টব্যাটনজি; বললেন: তা কি করে হয়? কাশ্মীরের অবস্থা কতটা শোচনীয় হয়ে পড়েছে তা না জেনেই তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ করাটা উচিত হবে না। করলে, আন্তর্জাতিক সমালোচনার চাপে পড়তে হবে।

সবাই কথাটাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলেন। ঠিক হল একজনকে শ্রীনগরে পাঠানো হোক। তাঁর মুখ থেকে সব শোনার পরে যা হয় একটা কিছু করা যাবে।

ছুটলেন ভি-পি-মেনন। একটি বি-ও-এ-সির প্লেনে চেপে হাজির হলেন শ্রীনগরে।

সঙ্গে নিলেন স্থল আর বিমানবাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে।

শ্রীনগর বিমানঘাঁটিতে নেমেই তিনি দেখলেন সব চুপচাপ; লোকজন নেই; চারপাশে শ্মশানক্ষেত্রের নীরবতা। বোঝা গেল শ্রীনগরের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। ভয়ে সবাই প্রায় দরজা বন্ধ করে বসে রয়েছে।

বিমানবন্দর থেকেই তাঁরা সোজা ছুটলেন প্রধানমন্ত্রী মহাজনের বাড়িতে। এই সারা পথটিই জনশূন্য। কোথাও পুলিসের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মাঝে-মাঝে দু'চারজন করে ন্যাশনাল কনফারেনস-এর স্বেচ্ছাসেবক লাঠি নিয়ে আগন্তুকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে তাঁরা মহারাজার রাজপ্রাসাদে হজির হলেন।

ভয়, অবসাদ আর নিষ্ফল উত্তেজনায় মহারাজ তখন প্রায়

কাঁপছিলেন। না আছে প্রতিরক্ষা বাহিনী, না আছে পুলিসবাহিনী। না আছে অস্ত্র, না আছে শস্ত্র। হানাদারদের তিনি রুখবেন কেমন করে? মরার ওপরে খাঁড়ার ঘা। আলো নেই, টেলিফোন নেই, সাধারণ মানুষের মনে আস্থা নেই! যে-গতিতে হানাদাররা এগিয়ে আসছে, শ্রীনগরে হাজির হতে তাদের বড় জোর দুটো দিন লাগবে। তারপরে কী হবে?

ভি পি-মেনন সব দেখলেন, শুনলেন, চেষ্টা করলেন বোঝার। হানাদারদের সুশৃঙ্খল পরিকল্পনাকে তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। এখন তাঁর প্রথম কাজ হচ্ছে মহারাজাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে জম্মুতে চলে যাওয়ার উপদেশ দেওয়া।

মহারাজা সে-উপদেশ গ্রহণ করলেন। রাজপ্রাসদের ভেতর এবং বাইরের যত যানবাহন ছিল সবগুলিতে তাঁর মূল্যবান জিনিসপত্র বোঝাই করে সেই রাত্রিতেই জম্বুর পথে নিঃশব্দে রওনা হয়ে গেলেন ভি-পি-মেনন যে বিমান-বন্দরে যাবেন সে-জন্যেও একখানা গাড়ি রেখে গেলেন না।

সকালের দিকে প্রধানমন্ত্রী মেহেরচাঁদ মহাজনকে নিয়ে মেনন বিমানবন্দরে হাজির হলেন। বাপরে বাপ, হাজার-হাজার লাখ-লাখ মানুষ ভিড় করেছে বিমানবন্দরে। কয়েক ঘণ্টা আগেও যে জায়গাটিকে তিনি শ্মশানক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, সেখানে তখন লাখ লাখ মানুষের আর্তনাদ আকাশ বিদীর্ণ করে তুলেছে। সবার মুখেই এক কথা—হানাদাররা শ্রীনগরে ঢুকে পড়েছে। এবারে আর নিস্তার নেই কারও। সুতরাং পালাও। যে যেদিকে পার পালাও।

ছাব্বিশের প্রত্যুষে দিল্লীতে পৌছেই প্রতিরক্ষা দপ্তরে ছুটলেন মেনন। সমস্ত সংবাদ পরিবেশন করার পরে তিনি বললেন যে এখনই সৈন্য আর রসদ না পাঠালে জম্বু আর কাশ্মীর অচিরাৎ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

আবার ব্যাগড়া দিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটন ; কাশ্মীর এখন স্বাধীন রাষ্ট্র। সেখানে আমরা সৈন্য পাঠাব কেমন করে ?

যা বাব্বা ! তাহলে সৈন্য পাঠানো যাবে না ?

মাউন্টব্যাটন বললেন : যাবে। তবে তার আগে কাশ্মীর সরকারকে লিখিত ভাবে ভারত সরকারের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করতে হবে।

মেহেরচাঁদ মহাজন বললেন : মহারাজা তাতে রাজী হবেন।

মাউন্টব্যাটন বললেন : শুধু রাজী হলেই হবে না। কাশ্মীর স্টেটে মুসলমান জনসংখ্যাই বেশী। তাই এই অন্তর্ভুক্তিটি সাময়িক। হানাদাররা দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করতে হবে কাশ্মীর ভারতেই থাকবে, না, পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে।

তথাস্তু।

আবার ছুটলেন ভি-পি-মেনন জম্মুতে। সঙ্গে মেহেরচাঁদ মহাজন। গিয়ে শুনলেন মহারাজা নিদ্রিত। শ্রীনগর থেকে তিনি যে পর্বতপ্রমাণ মূল্যবান লটবহর নিয়ে এসেছেন সেগুলি তখনও ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে। গোছানোর সময় পান নি। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ঘুম থেকে জাগানো হল তাঁকে এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরে কী আলোচনা হয়েছে সেগুলি সব শোনানো হল।

মহারাজা কালবিলম্ব না করেই অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করে দিলেন ; সেই সঙ্গে জানালেন যে শেখ আবদুল্লাকে তিনি মুক্তি দেবেন; এবং মেহেরচাঁদ মহাজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রেখে এই জরুরী অবস্থায় রাজ্য পরিচালনা করার দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে তিনি তাঁকে আমন্ত্রণ জানাবেন।

দিল্লীতে ফিরে এলেন মেনন। বিমানবন্দরে সর্দার প্যাটেল তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। মেননকে নিয়ে তিনি প্রতিরক্ষা

দপ্তরে হাজির হলেন। সগুমুক্ত শেখ আবদুল্লাও তখন হাজির হয়েছেন সেখানে।

দীর্ঘ আলোচনার পরে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি গৃহীত হল।

তাহলে এবারে সৈন্য পাঠাতে হয়।

লর্ড মাউন্টব্যাটন তখনও গাঁইগুঁই করছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাল দিচ্ছিলেন ভারতীয় স্থল, জল, আর বিমানবাহিনীর ব্রিটিশ অধিনায়করা।

কিন্তু জওহরলাল নেহেরু এবিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প: সৈন্য পাঠাতেই হবে। না পাঠালে জম্মু আর কাশ্মীর মুসলমান হানাদারদের হাতে পড়বে। ফলে ওখানে আবার হিন্দু-ধ্বংস-যজ্ঞ শুরু হবে। তার বদলা নেবে ভারতের হিন্দুরা। তাছাড়া, শ্রীনগরে যে সব ব্রিটিশ নাগরিক রয়েছেন তাঁদেরও হানাদাররা ছেড়ে দেবে না। কচুকাটা করবে।

ঠিক, ঠিক। ব্রিটিশ নাগরিকদের কথায় ব্রিটিশ অফিসাররা লাফিয়ে উঠলেন। আর কোন বাতচিত নয়; এবারে সব কাশ্মীর চল।

বিদ্যুতের বেগে সুরু হয়ে গেল কাজ। ছাব্বিশে অক্টোবর থেকেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের ব্রিটিশ এবং ভারতীয় অফিসাররা ঘড়ির কাঁটার মত বিরতি না নিয়েই কাজ করে গেল। এর জন্যে কোন প্রস্তুতি ছিল না; ছিল না কোন পরিকল্পনা। শত্রুপক্ষের সৈন্যবল কত তা জানারও উপায় ছিল না বিশেষ। তবু সাতাশে অক্টোবর প্রত্যুষ থেকেই প্রায় শতাধিক সামরিক আর অসামরিক বিমান সৈন্য আর রসদ নিয়ে শ্রীনগরের দিকে পাড়ি জমালো। একবার নয়, বার বার তারা যাতায়াত করতে লাগল। বিমান চালকেরা বিশ্রাম নিলেন না, বিমানঘাঁটির কর্মচারীরা ছুটি নেওয়ার কথা ভুলে গেলেন।

প্রথমেই হাতের কাছে পাওয়া গেল লেঃ কর্নেল দেওয়ান রণজিত রাইকে। তিনি ছিলেন গুরগাঁও জিলার শিখ বাহিনীর অধ্যক্ষ। তাঁর

পরে শ্রীনগরের বিমানঘাঁটি রক্ষণাবেক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হল। কাশ্মীর সরকার যাতে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে সেদিক থেকেও তাঁকে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছিল। সেই সঙ্গে রইল আর একটি দায়িত্ব। সেটি হল যদি কোন হানাদারকে শ্রীনগরে দেখতে পাওয়া যায় তাহলে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

লেঃ কর্নেল রাই শ্রীনগরের বিমানবন্দরের ওপরে কিছুক্ষণ উড়ে নেমে এলেন। বেলা সাড়ে দশটার সময় দিল্লী তাঁর প্রথম বেতারবার্তা পেল ঃ শ্রীনগর বিমানঘাঁটি আমাদের দখলে এসেছে।

আশ্বস্ত হল সবাই। তাহলে আর বিশেষ ভয় নেই।

লেঃ কর্নেল রাই বারমুলাতে হানাদারদের বাধা দেওয়ার জন্যে এগিয়ে চললেন।

হানাদারদের মুখোমুখী এসে বুঝতে পারলেন যে তারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত; এবং সংখ্যায় অনেক। তাঁর হাতে যে সৈন্য রয়েছে তাদের নিয়ে সেই বিরাট বাহিণীকে বাধা দেওয়া যাবে না। আরও সৈন্য আসার অপেক্ষায় তাই তিনি কিছুটা পিছু হটে এলেন। এই সময় শত্রুর গুলিতে তিনি মারা গেলেন।

তারপরে আরও কয়েক ব্যাটালিয়ন সৈন্য হাজির হল শ্রীনগরে। শত্রুদের অগ্রগতি ব্যাহত হল।

পাঁচই নভেম্বর মেজর জেনারেল কালওয়াত সিং শ্রীনগরে গেলেন। তাঁর ওপরে নির্দেশ ছিল যে কোন উপায়ে বারমুলা অধিকার করতে হবে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের অভিমত বারমুলা থেকে শত্রুদের তাড়িয়ে দিতে পারলেই কাশ্মীর উপত্যকা নিরাপদ হবে।

আটই নভেম্বর ভারতীয় সৈন্য বারমুলা অধিকার করল। পালিয়ে যাওয়ার আগে হানাদাররা বারমুলার সমস্ত ঐশ্বর্য আর নারীদের অপহরণ করেছে। হত্যা করেছে অসংখ্য নরনারী। বারমুলা শ্মশান হয়ে গিয়েছে।

হানাদারদের তাড়াতে-তাড়াতে ভারতীয় বাহিনী এগারই নভেম্বর

উরিতে গিয়ে পৌঁছলো। তাড়া খেয়ে হানাদাররা কোন দিকে না তাকিয়েই পাঁই পাঁই করে ছুটতে সুরু করল।

তারপরে আর তারা কাশ্মীরের পথে এগিয়ে আসে নি।

পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কাশ্মীর হাতে মুঠোর মধ্যে এসে ফসকে গেল।

হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।

লাহোরে জম্মু আর কাশ্মীরের ম্যাপটির দিকে তাকিয়ে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ব্যাপারটা কী? খুরশিদ আমাদও শ্রীনগরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? সেও তো ফিরল না।

গভর্নর জেনারেলের ব্যক্তিগত সচীব খুরশিদ আমাদ শ্রীনগরে গিয়েছিলেন সম্ভবত প্রভুর অভ্যর্থনার আয়োজন করতে। কিন্তু কিছু না ক'রেই তিনি ফিরে এসেছেন; অর্থাৎ, বাধ্য হয়েছেন ফিরে আসতে। শ্রীনগরে দেখতে পেয়ে ভারতীয় বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ভগ্নদূতের কাছে সমস্ত সংবাদ পেয়েই জিন্নাহ্ সাহেব চটে লাল! ভারতীয় বাহিনী শ্রীনগরে হাজির হয়েছে, দখল করেছে শ্রীনগরের বিমানঘাঁটি, বারমূলার উপকণ্ঠে রুদ্ধ করেছে হানাদারদের অগ্রগতি!

সাজাও রণচমূ, বাজাও দামামা। পাকিস্তানবাহিনীকে এর মোকাবিলা করতে হবে। জেনারেল গ্রেসীকে বোলাও।

জেনারেল গ্রেসী তখন পাকিস্তানবাহিনীর কার্যকারী সর্বাধিনায়ক।

তলব পেয়ে হাজির হলেন জেনারেল গ্রেসী।

হুকুম দিলেন জিন্নাহ্ সাহেব: মার্চ অন।

জেনারেল গ্রেসী মাথা নেড়ে বললেন : সরি স্যার। সুপ্রিম কমাণ্ডারের নির্দেশ ছাড়া পাদমেকং ন গচ্ছামি।

পাকিস্তান আর ভারতের সামরিকবাহিনীর সুপ্রিম কমাণ্ডার তখন ছিলেন ফিলড মার্শাল অচিনলেক।

কটমট করে তাকিয়ে রইলেন জিন্নাহ্ সাহেব।

অর্থাৎ, লোকটা বলে কী! আমি হলাম পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল—হর্তা-কর্তা-বিধাতা ; আর ও বলে কিনা...

জেনারেল গ্রেসী ঠিক কথাই বলেছেন। অচিনলেকই ছিলেন তখনও পর্যন্ত ভারতীয় আর পাকিস্তানী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তাঁর নির্দেশ ছাড়া ব্রিটিশ সেনাপতি ইন্দো-পাকিস্তানী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

তাহলে বোলাও অচিনলেককো।

আঠাশে অকটোবর সকালে ফিলড মার্শাল অচিনলেক লাহোরে উপস্থিত হলেন ; বললেন : শ্রীনগরে পাকিস্তানী বাহিনী যেতে পারে না।

কেন?

কাশ্মীর এখন ভারতীয় ডোমিনিয়নের অংশ।

ক্ষেপে উঠলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ : কে বলে কাশ্মীর ভারতের অংশ?

আইন। কাশ্মীরের মহারাজা ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করেছেন ; এবং, সেই অন্তর্ভুক্তি গৃহীত হয়েছে।

ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করার কোন ক্ষমতা নেই মহারাজার। কাশ্মীরের জনগণ তা চায় না।

কিন্তু আইনে সেই কথাই বলে।

মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-ও তাই জানতেন। না জানলে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও, জুনাগড়ের নবাবের সই করা দলিলটি

তিনি গ্রহণ করেছিলেন কেন? জয়পুর আর যোধপুরের মহারাজাদেরই বা তিনি ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন কেন?

কিন্তু সে সব জিনিস ভাবার মত সময় ছিল না তাঁর। তিনি বললেন: জাহান্নামে যাক আইন। ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে। মার্চ অন।

দাঁড়িয়ে উঠলেন অচিনলেক; বললেন: যথা অভিরুচি; তবে পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে কোন ব্রিটিশ অফিসার কাশ্মীরে যাবেন না। তাঁরা এখনই পদত্যাগ করবেন।

কয়েক সেকেণ্ড তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন জিন্নাহ্ সাহেব। কী ভাবলেন জানি নে; কিন্তু "মার্চিং অর্ডারটি" তিনি প্রত্যাহার করে নিলেন। তার পরিবর্তে আমন্ত্রণ জানালেন লর্ড মাউণ্টব্যাটন আর পণ্ডিত নেহেরুকে লাহোরে আসার জন্যে। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা চাই।

অচিনলেকের হাতেই চিঠিটি পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

আমন্ত্রণলিপি পেয়ে পণ্ডিত নেহেরু আর লর্ড মাউণ্টব্যাটন দুজনেই লাহোর যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

ব্যাগড়া দিলেন সর্দার প্যাটেল আর ভি-পি-মেনন।

এ যে দেখছি চুরিও করবে, আবার চোখও রাঙাবে। ওসব রঙবাজি চলবে না। বর্তমান ক্ষেত্রে পাকিস্তানই হচ্ছে সত্যিকারের আক্রমণ-কারী। সুতরাং এ বিষয়ে কোন আলোচনায় বসতে গেলে তাদেরই আসতে হবে এদেশে। আমরা সে দেশে যাব না।

নেহেরুজি বললেন: তাতে আর হয়েছে কী? সত্যি সত্যিই তো আমরা কাশ্মীরে রাজ্যবিস্তার করতে যাই নি। মান-অভিমান না ক'রে পাকিস্তানের সঙ্গে রেষারেষি মিটিয়ে ফেলাই ভাল।

তবু রাজি নন সর্দারজি; রাজি নন মেননজি। অনাবশ্যক তোয়াজ ভাল নয়।

বেশ, তাহলে গান্ধীজির কাছে যাওয়া যাক।

দুজনের মধ্যে যখনই কোন মতের অনৈক্য ঘটেছে গান্ধীজি তখনই তা মিটিয়ে দিয়েছেন।

বিড়লা প্রাসাদে গান্ধীজির সামনে জোরদার আলোচনা চলল। দু'পক্ষই সমান জেদী : কেউ কমতি নয়। হঠাৎ ধরা পড়ল পণ্ডিত নেহেরুর গলার স্বর কাঁপছে, চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল জ্বরে তাঁর গা পুড়ে যাচ্ছে। ব্যস। আলোচনা বন্ধ হল। ডাক্তারের নির্দেশ শরীরের এ-অবস্থায় তাঁর কোথাও যাওয়া চলবে না।

গান্ধীজি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন; একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেলেন তিনি। দুজনের কাউকেই ক্ষুণ্ণ করা হল না।

শেষ পর্যন্ত লর্ড মাউন্টব্যাটনই লাহোর যাওয়ার জন্যে তৈরি হলেন। সঙ্গে নিলেন লর্ড ইসমেকে।

তারিখটা হ'ল তিরিশে অকটোবর।

ঠিক ওই দিনই কাশ্মীর সমস্যার ওপরে পাকিস্তান সরকারের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি বেরোল : কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির পেছনে বিরাট একটা প্রতারণা রয়েছে; রয়েছে জালিয়াতি আর বর্বরতা। কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজার সঙ্গে ভারতের হিন্দু সরকারের একটি অশুভ গোপন আঁতাত চলছে। এই অন্তর্ভুক্তি আমরা স্বীকার করে নিতে বাধ্য নই।

তা না হয় নেই নিলে; কিন্তু ভারতের "হিন্দু" সরকারকে তোমরা বর্বর বলছ কোন্ যুক্তিতে? বারমুলা, উরি থেকে সুরু করে ঝিলম নদীর ধারে ধারে যে অসংখ্য বর্বরতার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলি কি ভারতের হিন্দু সরকারের, না, তোমাদের সুসভ্য হানাদারদের?

এদিক থেকেও পাকিস্তান সরকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তি নীরব নয়; বরং স্পষ্ট। পাকিস্তান সরকার নির্ভরযোগ্য (!) সূত্রে জানতে

পেরেছে যে মহারাজার মাইনে-করা সেপাইরা মুসলমানদের ওপরে অত্যাচার করে; আর পাকিস্তান সীমান্তের মুসলমান গাঁগুলিকে শ্মশান ক'রে দেয়। তারই ফলে উত্তেজিত হয়ে পাকিস্তান সীমান্তের অত্যাচারে প্রপীড়িত জনসাধারণ বদলা নেওয়ার জন্যে মরীয়া হয়ে ওঠে। এর সমস্ত দায়িত্ব কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজার।

যাক গে, নিছক একটা সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তির জন্যে তো আর আলোচনা আটকায় না।

পয়লা নভেম্বর লাহোরে জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটন; সঙ্গে লর্ড ইসমে।

দীর্ঘ আলোচনা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ছাড়া আপনার আর কিছু বক্তব্য রয়েছে? জিজ্ঞাসা করলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটন।

না। ওই আমাদের একমাত্র বক্তব্য। এ-সম্বন্ধে আপনাদের কী বলার রয়েছে জানতে পারলে খুসী হব। বললেন জিন্নাহ্ সাহেব।

মাউণ্টব্যাটন বললেন: মিথ্যা সংবাদের ভিত্তিতে আপনার বিজ্ঞপ্তিটি রচিত হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা অত্যাচার করেছে হানাদাররা। তবে এখন আর ভয় নেই। ভারতীয় সেনারা এখন কিছুদিন কাশ্মীরে থাকবে।

মাউণ্টব্যাটনের খোঁচা খেয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলেন জিন্নাহ্ সাহেব; তারপরে বললেন: যা হওয়ার তা হয়েছে। এখন আমরা দু'দলেই এক সঙ্গে সরে আসি। ওদের সমস্যা ওরাই মিটিয়ে নিক।

সে কী করে সম্ভব? হানাদাররা আপনার কথা শুনবে কেন?

সে-ব্যবস্থা আমি করছি। আপনার কাজ আপনি করুন।

মাউণ্টব্যাটন বললেন: কাশ্মীর থেকে ভারতীয় সেনারা সরে আসবে কি না, এলে কবে আসবে তা নিয়ে আলোচনা করতে আমি

এখানে আসি নি। আমি কেবল বলতে এসেছি যে কাশ্মীরের ভারত-অন্তর্ভুক্তি চরম নয়। যদিও এ বিষয়ে রাজাদের হাতেই চরম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তবু ভারত মনে করে কাশ্মীর কোন্ ডোমিনিয়নে যোগ দেবে তা ঠিক করবে কাশ্মীরেরই জনগণ মুক্ত এবং স্বাধীন গন-ভোটের মাধ্যমে। সেই গণভোট হবে কাশ্মীর থেকে শেষ হানাদারটি চলে যাওয়ার পরে, তার আগে নয়।

জিন্নাহ্ সাহেব তাতে রাজি নন। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে যতদিন ভারতীয় বাহিনী ওখানে থাকবে, আর শেখ আবদুল্লার হাতে থাকবে শাসনভার, ততদিন সুস্থ আর মুক্ত গণভোট গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। অতএব···ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুধু কথার যুদ্ধ. হানাদারদের অস্ত্রের চেয়েও তা ধারালো।

শূন্য হাতে ফিরে এলেন লর্ড মাউন্টব্যাটন।

দোসরা নভেম্বর জওহরলাল নেহেরু বেতার ভাষণ দিলেন: কাশ্মীর সম্বন্ধে আমরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি সেটি হঠাৎ কোন ভাবাবেশের ফলে নয়, বরং গভীর চিন্তার ফল। ওই ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বন্ধুত্বের অপমান না হোত; মনুষ্যত্বের দিক থেকে আমরা বিশ্বের দরবারে অপরাধী হতাম।

Not to have taken these steps would have been a betrayal of a trust and cowardly submission to the law of the sword with its accompaniment of arson, rape and slaughter.

তবে এ ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী নয়। অবস্থা শান্ত হয়ে এলে, রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরে এলে কাশ্মীরের জনগণই ঠিক করবেন তাঁদের দেশ পাকিস্তানে থাকবে, না, হিন্দুস্তানে থাকবে। এবং প্রয়োজন হলে এবিষয়ে রাষ্ট্রসংঘেরও সাহায্য নেওয়া হবে।

চৌঠো নভেম্বর লাহোর থেকে লিয়াকৎ আলি খাঁ পালটা বেতার ভাষণ দিলেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথাটা হচ্ছে কুখ্যাত অমৃতসর

চুক্তির বলেই মহারাজা হরি সিং কাশ্মীরের ওপরে বেআইনীভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করেছেন। নীতির দিক থেকে তাঁকে সমর্থন করা চলে না। তাঁর মতে কিছু বিদেশীর পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীরের বর্তমান অভ্যুত্থানকে চিরবঞ্চিত কাশ্মীরী জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত বিদ্রোহ না ব'লে বিদেশী হানাদারদের আক্রমণ ব'লে বিদেশের কাছে চিহ্নিত করলে কাশ্মীরের মিথ্যা ইতিহাস রচনা করা হবে। তিনি একথাও বলতে দ্বিধা করলেন না যে ভারত সরকার এবং তার অনুচরেরা কাশ্মীরকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে না ; করছে কাশ্মীরের স্বৈরাচারী রাজার রাজতন্ত্রকে কায়েমী করতে। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি তাই কাশ্মীরী জনগণের ওপরে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

He laid stress on "the immoral and illegal ownership" of Kashmir resulting from the "infomous" Amritsar Treaty of 1846. He contended that it was a dishonest rewriting of history to present the rebellion of the enslaved people of Kashmir to the world as an invasion from outside just because some outsiders have shown active sympathy with it. He contended that it was not Kashmir that the India Govt. and their camp followers were trying to save and that the accession of kashmir to India was a fraud perpetrated on its people by its cowardly ruler with the aggressive help of the Govt. of India.

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জয়েণ্ট ডিফেন্স কাউন্সিলের একটি বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্যে লিয়াকৎ আলি খাঁ দিল্লিতে এলেন।

Integration of the Princely States—V. P. Menon.

সেই বৈঠকে অনেক তর্কাতর্কির পরে ছুটি দেশের প্রধান মন্ত্রী একটি সমঝোতায় আসার চেষ্টা করলেন। ঠিক হল পাকিস্তান সরকার আজাদ কাশ্মীরকে যুদ্ধ বন্ধ করার এবং হানাদারদের অনতিবিলম্বে কাশ্মীর উপত্যকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেবে।

আর ভারত কী করবে? ভারতও তার অধিকাংশ সেনাবাহিনী সরিয়ে নেবে, তবে তা যুদ্ধ একেবারে বন্ধ হওয়ার পরে। সীমান্তের কিছু কিছু জায়গায় অবশ্য ভারতীয় সৈন্য থাকবে, তাও কাশ্মীরের নিরাপত্তার জন্যে।

আর গণভোট?

গণভোট হবে; তবে রাজ্যে শান্তি আর শৃঙ্খলা ফিরে আসার পরে। যাতে এই গণভোট গ্রহণ করার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্যে ছুটি দেশই যুক্তভাবে রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন জানাবে। হাঙ্গামায় পড়ে যারা সাময়িকভাবে দেশত্যাগ করেছে তাদের আবার ডেকে আনতে হবে। যারা বাইরে থেকে এসেছে তাদের ভোট দিতে দেওয়া হবে না। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

আচ্ছি বাত হ্যায়।

পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে করমর্দন ক'রে, শর্তগুলি কার্যকরী করার সদিচ্ছা প্রকাশ ক'রে করাচী রওনা হলেন লিয়াকাৎ আলি খাঁ।

করাচী বিমানবন্দরে নেমেই তিনি একটি উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ দিলেন: পাকিস্তান কোন দিনই কাশ্মীর ছেড়ে দেবে না। বন্ধুগণ, আপনারা আরও বেশী সংখ্যায় কাশ্মীর উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ুন, ঘরে-ঘরে অবরোধ গড়ে তুলুন। কাশ্মীরের জন-জীবন বানচাল করে দিন।

সব সংবাদই দিল্লিতে এল। সংবাদ এল পাকিস্তান সীমান্তে হানাদাররা অমুসলমানদের বেপরোয়া হত্যা করছে; প্রকাশ্য রাস্তায় ধর্ষণ করছে হিন্দুনারীদের; নিলামে চড়াচ্ছে কাশ্মীরী যুবতীদের।

ক্ষেপে উঠলেন পণ্ডিত নেহেরু। একেই কি বলে ভদ্রলোকের কথা? তাহলে আর বিশ্বাস কী তোমাদের?

পরবর্তী ডিফেন্স কাউন্সিলের বৈঠক বসল লাহোরে। লিয়াকাৎ আলি জওহরলাল নেহেরুকে লাহোরে আসার জন্যে অভ্যর্থনা জানালেন। নেহেরু সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

আবার সেই আলোচনা, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির পালা। এ-দল বলে, তোমরা আক্রমনকারী; ও-দল বলে, তোমরা।

নেহেরু বললেন: হানাদারদের সরে আসতে বলুন।

লিয়াকাৎ বললেন: তারা আমাদের কথা শুনবে না।

নির্দেশ তো দিন।

তাতে লাভ হবে না; বরং আমাদের নির্দেশ যদি হানাদাররা না শুনে তাহলে উভয় দেশের মধ্যে তিক্ততা বাড়বে। তখন আপনারাই বলবেন পাকিস্তান সরকার বাইরে সাধু সাজলেও ভেতরে ভেতরে হানাদারদের মদৎ যোগাচ্ছে।

সুতরাং হানাদারদের সরে আসার জন্যে কোন নির্দেশ পাকিস্তান সরকার দেবে না।

আর দেবেই বা কোন্ সাহসে? পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী এত বিরাট নয় যে প্রয়োজন হলে, তাই দিয়ে হানাদারদের ঠেকানো যেতে পারে। তা ছাড়া, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যে হানাদারদের ওপরে যতটা সহানুভূতি থাকা দরকার পাকিস্তান সরকারের তা নেই। এইভাবে চলতে থাকলে বর্তমান সরকারে পতন অনিবার্য; তারপরে হয়ত কোন জঙ্গী সামরিক চক্র পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করবে। তখন ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কটি আরও অবনতির পথে এগিয়ে যাবে।

অর্থাৎ এক কথায় ভারতের স্বার্থেই পাকিস্তান সরকার হানাদারদের নিরস্ত করবে না।

তাহলে উপায় কী? ভেবে পড়লেন জওহরলাল নেহেরু।

'উপায়'টি লিয়াকাৎ আলির মুখস্ত ছিল : ভারত সরকার কাশ্মীর থেকে সমস্ত সৈন্য তুলে নিক। শেখ আবদুল্লাকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় বসানো হোক কোন নিরপেক্ষ শাসককে। তারপরে সুরু হোক গণভোট।

আর তারই ভেতরে হানাদানদের বেশ ধরে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী জম্মু আর কাশ্মীর দখল ক'রে বসুক!

জওহরলাল নেহেরু ওকাজে নেই। তিনি স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দিলেন : কাশ্মীর উপত্যকায় যতদিন একটিও হানাদার থাকবে ততদিন ভারত তার সৈন্য সরানোর কথা চিন্তাও করবে না।

আর শেখ আবদুল্লার সম্বন্ধেও ওই একই কথা। তাঁর মত দেশ-প্রেমিক ক'জন রয়েছে? কাশ্মীরের জন্যে জনসাধারণের তিনি করেন নি কী? নিঃসন্দেহে তিনি প্রথম শ্রেণীর জনপ্রতিনিধি। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, কারারুদ্ধ হয়েছিলেন বারবার।

সুতরাং তাঁকে অপসারিত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাহলে হবে কী?

কিছু না, এক পর্বতের মূষিক প্রসব করা ছাড়া।

কংগ্রেস নেতারা ঠিক করলেন আর আলোচনার দরকার নেই। ও যেমন চলছে চলুক। ভারতীয় সৈন্যরা যখন একটার পর একটা ঘাঁটি থেকে হানাদারদের তাড়িয়ে দিতে-দিতে এগিয়ে চলেছে তখন আর বৃথা আলোচনার দরকারটা কী?

কিন্তু মাউন্টব্যাটনের মনে সুখ নেই। যে-মানুষটির চেষ্টায় এই বিরাট দেশটি তিন মাসে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল, অত বড় বড় জাঁদরেল রাজা মহারাজাদের যিনি হাসতে-হাসতে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলেন, সেই তিনি কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে এতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন কেন তা একমাত্র ভগবান জানেন। তিনি জওহরলালকে বোঝালেন যে কাশ্মীর সমস্যার যদি আশু সমাধান না হয় তাহলে ভারত আর

পাকিস্তানের মধ্যে বোঝাপড়া কোন দিনই হবে না; তা ছাড়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিক থেকেও বিষয়টি জটিল হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং পকিস্তানের ওপরে ভরসা না করে সোজাসুজি রাষ্ট্রসংঘের দরবারে আপীল করাই ভাল।

আপীল! কীসের জন্য?

কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে অনেকেই মাউন্টব্যাটনের প্রস্তাবটিকে সরাসরি নাকচ করে দিলেন। নিজের শক্তি থাকা সত্বেও দস্যুদের বিতাড়িত করার জন্যে অপরের দ্বারস্থ হ'তে হবে এর চেয়ে হাস্যকর প্রস্তাব আর কী হ'তে পারে? সুতরাং রাষ্ট্রসংঘে যদি যেতেই হয় পাকিস্তান যাক। আমরা যাব কোন্ কম্মে?

জওহরলাল সহকর্মীদের সঙ্গে একমত হ'তে পারলেন না। ভারতীয় সৈন্যেরা কাশ্মীরের অপহৃত অংশগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্যে যখন বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে ঠিক সেই সময়ে ভারত যে আক্রমণকারী নয় তা-ই প্রমাণ করার জন্যে জওহরলাল রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন করবেন বলে মনস্থ করলেন।

একেই বলে খাল কেটে কুমীরকে ডেকে আনা।

কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের দরবারে যেতে হলে বিরোধী পক্ষের কাছে লিখিতভাবে কিছু অভিযোগ পেশ করা দরকার। বাইশে ডিসেম্বর লিয়াকাৎ আলি খাঁ যখন দিল্লিতে এলেন সেই সময় কয়েকটি লিখিত অভিযোগ জওহরলাল নেহেরু তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

অভিযোগগুলি কী?

সেরা অভিযোগ হচ্ছে হানাদাররা পাকিস্তানের অন্নপুষ্ঠ; এবং পাকিস্তানের সীমান্তে ঘাঁটি ক'রে কাশ্মীরে তারা বারবার হানা দিচ্ছে; প্রকাশ্যভাবেই পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে তারা যাওয়া আসা করছে। হানাদাররা বেসামরিক মানুষ। মর্টার, কামান, এবং 'মার্ক ভি মাইনস' প্রভৃতি যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রগুলি তারা ব্যবহার করেছে সেগুলি তাদের কাছে থাকার কথা নয়। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে আধুনিক

যুদ্ধ সরঞ্জামগুলি পাকিস্তান থেকেই তাদের সরবরাহ করা হচ্ছে। যে বিরাট পরিমাণ গাড়ী আর পেট্রল হানাদাররা ব্যবহার করেছে তা পাকিস্তান ছাড়া আর কে সরবরাহ করবে? খাবার আর অন্যান্য রসদও পাকিস্তানই তাদের যোগাচ্ছে; এবং আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি যে পাকিস্তানের সামরিক খাদ্য পরিবেশন কেন্দ্র থেকে হানাদারদের নিয়মিত ভাবে খাবার দেওয়া হচ্ছে।

The modern military equipments could only have been obtained from Pakistan sources; artillery, and Mark V mines are not normally the kind of armament which tribesmen possess. Motor transport, which the raiders have been using, and the petrol required for it, could also be obtained in Pakistan only. Food and other supplies are also secured from Pakistan; indeed, we have reliable reports that the raiders get their raions from military messes in Pakistan.

চিঠিটি লিয়াকৎ আলি পড়লেন; পড়ে ব্রিফ কেসে রেখে দিলেন; মুখে বললেনঃ দেশে ফিরে গিয়ে এর উত্তর তিনি পাঠিয়ে দেবেন।

তিরিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত লিয়াকৎ আলির কোন উত্তর এল না। একত্রিশে ডিসেম্বর ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘের কাছে অভিযোগ পেশ করল। আর ঠিক সেই দিনই, অভিযোগ পেশ করার পরে, খাঁ সাহেবের উত্তর এল।

অভিযোগ আর অভিযোগে ভরাট সে-চিঠি। ভারতের সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ ক'রে, পাকিস্তান দ্বিগুণ অভিযোগ করেছে ভারতের বিরুদ্ধে। সেই চিঠিতে বারবার একটা কথাই বলা হয়েছেঃ ভারতবর্ষ পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্যে বদ্ধপরিকর।

উনিশশ আটচল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘ থেকে পর্যবেক্ষক দল এসে হাজির হল ভারতে; জম্মু আর কাশ্মীর পরিদর্শন করল; তারপরে আলোচনা করতে বসলো শান্তি ফিরে

আসার পরে ওখানে কী ভাবে গণভোট গ্রহণ করা হবে তাই নিয়ে।

কিন্তু এ ব্যাপারটির সমাধান অত সহজ নয়। এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরেরও তার কোন সমাধান হয় নি। তবু তখন নির্দলীয় পর্যবেক্ষকগণের আলোচনার পরে ঠিক হল যে অনর্থক যুদ্ধ করে আর লাভ নেই—তখনই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হল। উনিশশ উনপঞ্চাশ সালের পয়লা জানুয়ারির মধ্যরাত্রি থেকে দুটি দেশই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল।

এই সব হানাদারদের আসল নেতাটি কে? এঁর নাম হচ্ছে জেনারেল তারিক (General Tariq)।

কিন্তু কে এই তারিক সাহেব?

পাকিস্তান বাহিনীতে এ-নামের কোন জেনারেল ছিল না, ছিল চেহারার। সেই মানুষটির আসল নাম হচ্ছে মেজর জেনারেল আকবর খাঁ। এই সমস্ত পরিকল্পনা যাকে আমরা 'মাস্টার প্ল্যান' বলি তৈরি করেছিলেন তিনিই। তারপরে এসেছিলেন পাকিস্তান বাহিনীর মেজর জেনারেল শের খাঁ; তাঁকে সাহায্য করেছিলেন মহম্মদ জামান কিয়ানি, এবং অন্যান্য কুশলী সৈনাধ্যক্ষেরা। এঁদের অনেকেই ছিলেন সুভাষচন্দ্রের অধীনে যে ইনডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মি তৈরি হয়েছিল সেই বাহিনীর দক্ষ অফিসার। এঁদের ওপরে নির্ভর করেই সুভাষচন্দ্র অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

এই দক্ষ সেনাপতিদের নিয়ন্ত্রাধীনে হানাদাররা একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা, আর তড়িত-গতিতে তারা অগ্রসর হয়েছিল তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কাশ্মীর আক্রমনের যে সময়টি তারা বেছে নিয়েছিল তার মত উপযুক্ত সময় আর ছিল না। কাশ্মীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যখন দুর্বলতম, বিলাসী, ভূরিভোজনে তৃপ্ত মহারাজা অন্তর্ভুক্তির সমস্যা নিয়ে যখন দোদুল্যমান, জনপ্রিয় নেতা শেখ আবদুল্লা যখন অন্ধ কারাগারে বসে দিন গণছেন,

এবং কাশ্মীরের সমস্ত সরবরাহ যখন বন্ধ সেই সময় হানাদাররা কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল। তাদের প্রথম থেকেই লক্ষ্য ছিল কাশ্মীরের জণগণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করা। দিল্লিতে নাদীর শাহ্ যে অনাবশ্যক হত্যাকাণ্ডে পথে-প্রান্তরে রক্তের বন্যা বহিয়ে দিয়েছিলেন, হানাদাররা ঠিক সেই পথটিই বেছে নিয়ে'ছিল।

তাহলে তারা শ্রীনগর জয় করতে পারল না কেন?

তার কারণ তারা বারমুলায় এসে লুঠপাঠ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। শ্রীনগর যে তাদের হাতের মুঠোয় সে বিষয়ে তাদের মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। বারমুলা থেকে শ্রীনগর মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। সে-পথটুকু তারা যে কোন সময়ে বিনা বাধায় অতিক্রম করতে পারবে বলেই তারা মনে করত। তাই তারা শ্রীনগরের পথে যাত্রা করার আগে বারমুলায় বসে বিপুল আনন্দে হিন্দুনারী আর হিন্দু সম্পত্তি লুঠ করছিল, হত্যার রক্তে ভাসিয়ে দিচ্ছিল রাজপথ।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ভারতীয় বাহিনী যে অতটা দ্রুতবেগে শ্রীনগর বিমানঘাঁটি দখল ক'রে বারমুলার দিকে এগিয়ে আসবে সেকথা তারা ভাবতেও পারে নি। তারা যখন তা ভাবতে পারলো তখন পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের কাছে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না।

একেই বলে বিধাতার পরিহাস।

কেবল আয়তনের দিক থেকেই এটি ভারতীয় রাজ্যদের মধ্যে বিরাটতম ছিল না, এই রাজ্যের যিনি শেষ নবাব, এবং যাঁকে কেন্দ্র করে আমাদের এই কাহিনীটি গড়ে উঠেছে তাঁর খেতাবটিও পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় দীর্ঘতম: লেফটন্যানট জেনারেল হিজ একস-জালটেড হাইনেশ আসফ ঝা মুজাফ্ফর-উল-মুল্ক নিজাম-উল-মুল্ক নিজাম-উদ-দৌলা স্যার মীর উসমান আলি খান বাহাদুর, ফতেহ্ জঙ্ সি-সি-এস আই, সি-বি-আই। কেবল এইখানেই শেষ নয়। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর স্বহস্তে লিখিত একখানি চিঠিতে তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বস্ত বন্ধু (Faithful Ally) বলে সম্মানিত করে-ছিলেন। এত বড় সৌভাগ্য অন্য কোন ভারতীয় রাজার কপালে জোটে নি।

এত বড় বিরাট খেতাবধারী নিজাম ১৯১১ সালের আগস্ট মাসে সিংহাসনে আরোহন করেন।

কিন্তু হায়দারাবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তারও প্রায় দু'শ বছর আগে। প্রতিষ্ঠাতা হলেন মীর কামরুদ্দীন চীন কিলিচ খাঁ।

আওরংজেবের মৃত্যুর পরে, সম্রাট ফারুকশিয়ার মীর কামরুদ্দীনকে নিজাম-উল-মুলক ফিরোজ যঙ উপাধি দিয়ে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা করে পাঠান। সময়টা হল ১৭১৩ সাল। ১৭২৪ সালের মধ্যেই তিনি কার্যত প্রায় স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন। তবে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত তাঁর বংশধরেরা প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষনা করেন নি।

১৭৪৮ সালে কামরুদ্দীনের মৃত্যু হল। তারপর থেকে হায়দারা-বাদের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো সিংহাসনে বসবেন কে তাই নিয়ে কামরুদ্দীনের পুত্রেরা আস্তিন গোটাতে লাগলেন। গৃহযুদ্ধের গন্ধ পেয়ে দৌড়িয়ে এল ইষ্ট ইনডিয়া কোম্পানী আর ফরাসী বণিকের দল। তিনটি বছর ধরে মারামারি

কাটাকাটি চলল। তারপরে কামরুদ্দীনের তৃতীয় পুত্র সালাবাত যঙ্ ফরাসীদের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করলেন।

কিন্তু রাখতে পারলেন না। ১৭৬১ সালে তাঁর হাত থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নিলেন নিজাম আলি খাঁ। সিংহাসনে বসেই তিনি কর্ণাটক আক্রমণের আদেশ দিলেন। সুরু হল যুদ্ধ। ব্রিটিশ সেনা-বাহিনীর হাতে পরাজিত হলেন নিজাম। সন্ধি হল ১৭৬৬ সালে। স্বাধীনতা হারালেন নিজাম আলি খাঁ। কোম্পানী তাঁর রক্ষণা-বেক্ষনের ভার নিল।

পরের বছরেই সন্ধি ভাঙলেন নিজাম। কোম্পানীর সঙ্গে তখন হায়দার আলির যুদ্ধ চলেছে। হায়দার আলির সঙ্গে যোগ দিলেন তিনি। দু'দলের সম্মিলিত শক্তি কোম্পানীর কাছে পরাজিত হল। ১৭৬৮ সালে মছলিপট্টমে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। নিজামের ওপরে কোম্পানী আবার তার সামরিক নিয়ন্ত্রণ জারি করল। দশ বছর পরে, সেই চুক্তি অনুসারে হায়দারাবাদে একটি ব্রিটিশ রেসিডেনট নিযুক্ত হলেন ; তাঁর সঙ্গে রইল একদল ব্রিটিশ সৈন্য।

কিন্তু চুপচাপ বসে থাকার পাত্র তিনি ছিলেন না। ১৭৯৫ সালে আবার তিনি আস্তিন গোটালেন। এবার যুদ্ধ মারাঠাদের সঙ্গে। যথারীতি হেরে একটি সম্মানহানিকর চুক্তি করতে বাধ্য হলেন। সেই চুক্তি অনুসারে বেরারের অনেকখানি অংশ সমেত রাজ্যের মোটা একটি অংশ ছেড়ে দিতে হল। তাতেও রেহাই পেলেন না নিজাম। চৌথ আদায় করে ছাড়লো মারাঠারা।

খাল কেটে ঘরে কুমীর ঢুকালেন নিজাম। সেই কুমীর মারার জন্যে আবার তিনি ফরাসীদের দারস্থ হলেন। ফরাসীদের খপ্পরে গিয়ে পড়ছেন দেখে প্রমাদ করল কোম্পানী। মার্কুয়েস-অফ-ওয়েলেসলি ভড়কি-ভাড়কি দিয়ে অনেক কষ্টে নিজামকে ফিরিয়ে আনলেন। অভয় দিয়ে বললেন : আমরা থাকতে আপনার ভয় কি ? আমাদের ওপরে নির্ভর করুন। মারাঠাদের সাধ্য কি আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করে ?

ভেবে দেখলেন নিজাম ; কোম্পানী মন্দ কথা বলে নি। ফরাসীদের চেয়ে ইংরাজদের শক্তি আর সংগঠন অনেক বেশী জোরালো। শেষ পর্যন্ত নিজাম আলি খাঁ ইংরাজদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন। সে-গাঁটছড়া আর খোলা হয় নি।

টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলো ইংরেজদের। চুপচাপ বসে রইলেন নিজাম। যুদ্ধে পরাজিত হলেন টিপু। পুরস্কার হিসাবে টিপুর রাজ্যের কিছু অংশ পেলেন তিনি।

পেলেন বটে ; কিন্তু কপালে সহ্য হল না তাঁর। হায়দারাবাদে কোম্পানীর যে সব পলটন ছিল তাদের মাইনে দেওয়ার কথা ছিল নিজামের। রাজকোষ শূন্য হওয়ার ফলে সেই মাইনে মাসের পর মাস বাকি পড়ে গেল। বকেয়া মাইনে শোধ করতে হল কোম্পানীকে। তার পরিবর্তে সাম্রাজ্যের কিছু অংশ কোম্পানীর হাতে তুলে দিতে হল নিজামকে।

নিজাম আলি খাঁর মৃত্যু হল ১৮০৩ সালের ৭ই আগস্ট। হায়দারাবাদের সিংহাসনে বসলেন তাঁর ছেলে শিকান্দার ঝা। তখন সবে দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ সুরু হয়েছে। শিকান্দার ঝা ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলালেন। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল মারাঠা শক্তি। আঙুল ফুলে কলাগাছ হল নিজামের। পার্বত্য দুর্গগুলি বাদ দিয়ে ওয়ার্ধার পশ্চিমে সমস্ত বেরার প্রদেশ নিজামের রাজ্য ভুক্ত হল। সেই সঙ্গে পেলেন অজন্তা পাহাড়ের দক্ষিণে যে সমস্ত জায়গা রয়েছে সেইগুলি। তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের পরেই চৌথ দেওয়ার হাত থেকে রেহাই পেলেন তিনি।

শিকান্দার ঝা'র পরে সিংহাসনে বসলেন তাঁর পুত্র নাসীর-উদ-দোলা। আবার মাসের পর মাস মাইনে বাকি পড়লো ইংরাজ পলটনদের। সেই দেনা শোধ করার জন্যে নিজাম বেরার প্রদেশটি ছেড়ে দিলেন। সেই সঙ্গে দিতে হল দোয়াব আর হায়দারাবাদের কিছু অংশ।

সিপাহী যুদ্ধ সুরু হল ভারতের মাটিতে। তখন নিজাম হচ্ছেন নাসীর-উদ-দৌলার পুত্র আফজল-উদ-দৌলা। এবারেও নিজাম চুপচাপ বসে রইলেন। অথচ হায়দারাবাদের মুসলমানেরা চুপ করে বসে থাকে নি। তারাও সেই যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। ব্রিটিশ রেসিডেনসীর ওপরে হামলা চালিয়েছিল দু'বার। নিজামের দরবার থেকে বেরুবার সময় ব্রিটিশ রেসিডেন্ট আক্রান্ত হয়েছিলেন। পুরো তিনটি মাস ধরে হায়দারাবাদের মুসলমানেরা উত্তেজিতভাবে ঘোরাফেরা করেছে। হায়দারাবাদ যদি এই যুদ্ধে যোগ দিত তাহলে ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মান্দ্রাজও এগিয়ে আসতো সেই যুদ্ধে যোগ দিতে। কিন্তু কিছুই হল না। নিজামশাহি সরকার সব ভেস্তে দিলেন।

সেই দেশদ্রোহীতার জন্যে পুরস্কারও নিজাম অনেক পেয়েছিলেন। এক বেরার বাদ দিয়ে সমস্ত জায়গা ফিরে পেলেন নিজাম। সেই সময় থেকে মুক্তি পেলেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ঋণ থেকে।

কেবল তাই নয়। ব্রিটিশ সরকারের বদান্যতায় পরবর্তী নিজামরা ভোগলালসায় ডুবে বিপুল আনন্দে সময় কাটাতে লাগলেন। করের উপর কর চাপিয়ে আমলারা দুস্থ-দরিদ্র প্রজাদের রক্ত শোষণ করতে লাগলো। সেই শোষণ আর অত্যাচার যে কী ভয়ঙ্কর তা স্যার জন ম্যালকমের উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে ঃ

The different quotas to be paid by each inhabitant had been fixed ; and every species of torture was then being inflicted to enforce them. Men and women, poor and reach, were suffering promiscuously. Some had heavy muskets fastened to their ears , some large stones upon their breats, while others had fingures pinched with hot pincers, Their Ories of

agony, and declaration of inability to pay appeared only to what the appetite of their tormentors. *

অর্থাৎ কাকে কত টাকা এবং কি কি বাবদ কর দিতে হবে তা ঠিক করা ছিল, সেই করের বোঝা তারা বইতে পারবে কি না সরকার সে সম্বন্ধে কিছু চিন্তাও করতো না ; এবং সেই কর আদায় করার জন্যে অত্যাচারের যত রকম হাতিয়ার রয়েছে তাদের সব কটিই ব্যবহার করা হোত। নর-নারী, এবং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে—সকলেই এই অত্যাচারে ভীষণভাবে জর্জরিত হোত। কারও—কারও কানের সঙ্গে ভারি গাদা বন্দুক ঝুলিয়ে দেওয়া হোত। কারও-কারও বুকের ওপরে চাপানো থাকতো ভারি পাষানের স্তূপ ; গরম চিমটে দিয়ে কারও-কারও আঙুলগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হোত। তাদের চিৎকার আর সেই সঙ্গে কর দিতে না পারার অক্ষমতা অত্যাচারী আমলাদের অত্যাচার করার স্পৃহা আরও বাড়িয়ে দিত।

এই বংশের শেষ নবাব মীর উসমান আলি খাঁ।

প্রায় দু'শ বছর ধরে এই বংশের নবাবরা যে বিপুল মণি-মুক্তা-হীরে-জহরত, সোনার ভারি-ভারি ইঁট আর পাতা সংগ্রহ ক'রে ব্যক্তি-গত তহবিল পূর্ণ করে রেখেছিলেন সেই সমস্ত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন উসমান আলি খাঁ। সেই অতুল ঐশ্চর্য নিজস্ব প্রাসাদ 'কিং কোঠি'র বিশেষ-বিশেষ প্রকোষ্ঠে তিনি চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখতেন। সেই চাবি কোন সময়েই তিনি হাত ছাড়া করতেন না। কাউকেই বিশ্বাস করতে শেখেন নি তিনি। সিংহাসনে আরোহন করার পর থেকে নতুন-নতুন সম্পদ সংগ্রহের দিকে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন ; আর সেজন্যে তাঁকে এতটুকু বেগ পেতে হয় নি। এমন উদার হৃদয়ে তিনি অপরের সম্পদ ছিনিয়ে আনতে পারতেন যে তা ভাবতে গেলেও শরীরে রোমাঞ্চ জাগে।

---

* K. M. Munshi The End of An Era. Page—XX

এই সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর কয়েকটি রীতি বা নীতি ছিল।

যেমন ধরুন, সরকারী খরচায় ভোজের আসর বসেছে। জমায়েত হয়েছেন স্টেটের আমির ওমরাহ এবং বিশেষ বিশেষ অতিথি। জোর খানাপিনা চলেছে। হঠাৎ মহামান্য নিজাম বাহাদুর চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন ; তারপরে, এক গ্লাস স্যাম্পেন নিয়ে কোন একটি বিশিষ্ট ওমরাহের টেবিলের কাছে দাঁড়ালেন। স্বয়ং নিজাম বাহাদুর স্যাম্পেনের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এই দেখে ওমরাহটির মন পুলকিত হয়ে উঠতো। তিনি বিনয়ে গদগদ হয়ে এত বড় সম্মান দেখানোর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে স্যাম্পেনের গ্লাসটি নিজামের হাত থেকে নিতেন।

এই দরবারের রীতি ছিল প্রকাশ্য সভায় কোন আমিরকে স্বয়ং নিজাম বাহাদুর অভিনন্দিত করলে পরের দিনই সেই আমিরকে কয়েক লক্ষ টাকার উপঢৌকণ পাঠাতে হোত। নিজাম সেগুলি বিনা-দ্বিধায় গ্রহণ করে সোজা নিজস্ব কোষাগারে পাঠিয়ে দিতেন।

প্রতিটি সরকারী ভোজেই নিজাম বাহাদুর এই ভাবে কয়েকজন ওমরাহকে সম্মানিত করতেন। ফলে লক্ষ-লক্ষ টাকার উপহার তাঁর ঘরে এসে জমায়েত হোত।

এক গ্লাস স্যাম্পেন! কতই বা তার দাম! তা-ও স্টেটের খরচায়। কিন্তু ওমরাহদের কাছে তার দাম কত বেশী।

মাঝে-মাঝে নিজাম বাহাদুর তাঁর ওমরাহদের কাছে কিছু প্রীতি উপহার পাঠাতেন। কিছু পেলেই কিছু দিতে হয়। ওমরাহরাও দিতেন—যা পেতেন তার বিশগুণ।

উজির-ওমরাহদের বাড়িতে কেউ মারা গেলেন। নিজাম বাহাদুর ছুটলেন তাঁদের বাড়ীতে সহানুভূতি জানাতে। রাজদর্শনী হিসাবে নিয়ে এলেন কিছু সোনার মোহর।

ওমরাহদের ছেলেমেয়ের বিয়ে হলে তো কথাই নেই। নিজাম বাহাদুর নবদম্পতিতে আশীর্বাদ করতে যাবেনই। নবদম্পতি কি কি

উপহার পেয়েছে সে-সব তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন, হাতে নিয়ে তারিফ করতেন। ফেরার সময় সব চেয়ে দামি উপহারগুলি তিনি নিয়ে আসতেন।

হায়দারাবাদের সীমানার ভেতরে কোন সুন্দর অথচ দামি মোটর গাড়ি কেউ কিনেছে জানতে পারলে তো কথাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পেয়াদা ছুটবে গাড়ীর মালিকের ঘরে; বিনীত ভাবে জানাবে যে নিজাম বাহাদুর তাঁর গাড়িটি দেখে যৎপরোনাস্তি প্রীত হয়েছেন; তিনি একবার তাঁর গাড়িটিতে চড়তে চান।

ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরেও, গাড়ির মালিক কৃতার্থ হয়েছেন এইভাব দেখিয়ে গাড়িটিকে পাঠিয়ে দিতেন। সে-গাড়ি আর ফিরে আসতো না। ফিরে না হয় নেই এল, কিন্তু নিজাম বাহাদুর কি সেই গাড়িতে চড়তেন? রাম কহ। নিজাম বাহাদুরের গাড়ির-হারেমে সেই যে সেটি ঢুকতো আর কোন দিন বেরিয়ে আসতো না। এই ভাবে তিনি প্রায় তিনশ থেকে চারশ গাড়ি সংগ্রহ করেছিলেন।

নিজামের অর্থলোভ যে কত বিরাট্ ছিল সে-সম্বন্ধে দেওয়ান জার্মানি দাশ তাঁর "মহারাজা" গ্রন্থে একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। দাতিয়ার মহারাজা ছিলেন নিজাম উসমান আলি খাঁর বন্ধু। নিজাম শুনেছিলেন দাতিয়ায় নাকি বেশ ভাল মাখন পাওয়া যায়। শোনামাত্র তিনি তাঁর বন্ধুকে কিছু মাখন পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। মহারাজা তাঁর প্রাসাদের নিজস্ব গুদোম থেকে সব চেয়ে ভাল বারো ডজন মাখনের টিন পাঠিয়ে দেন। মাখনের অত টিন দেখে নিজাম তো আনন্দে আত্মহারা।

কিন্তু অতগুলি সেরা মাখনের টিন নিয়ে তিনি করলেন কী? নিজে খেলেন? প্রাসাদের লোকজনকে খাওয়ালেন? না। তিনি নির্দেশ দিলেন তাঁর নিজস্ব প্রাসাদ গুদোমে সেগুলি রেখে আসার।

দুটি বছর ধরে মাখনের টিনগুলি সেই গুদোমে পড়ে রইল।

তারপরে একদিন প্রাসাদের রক্ষীদের নাকে উৎকট পচা গন্ধ ঢুকলো। অনুসন্ধান করে জানা গেল টিনের ভেতর থেকে পচা মাখনের গন্ধ বেরুচ্ছে। সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো। এতবড় দুঃসংবাদটা নিজাম বাহাদুরকে জানাবে কে? অনেক শলাপরামর্শের পরে শেষ পর্যন্ত দুঃসাহসী এবং প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বলে খ্যাত প্রধান মন্ত্রী নবাব সালার যঙ্ ব্যাপারটা নিজামকে জানালেন। এহেন সংবাদে ক্ষেপে উঠলেন নিজাম; ধমক দিয়ে বিদায় করে দিলেন প্রধান মন্ত্রীকে। প্রধান মন্ত্রী বিদায় হলে কয়েক মিনিট পথচারি করলেন; তারপরে ডেকে পাঠালেন হায়দারাবাদ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ রেড্ডীকে। মিঃ রেড্ডী হাজির হলে নিজাম নির্দেশ দিলেন ওই মাখনের টিনগুলি বাজারে বিক্রী করে দাও।

তোওবা, তোওবা! পচা মাখনের সংবাদ তিনি আগেই পেয়েছিলেন। নিজামের হুকুম শুনে তিনি মাথা চুলকোতে সুরু করলেন; তারপরে বললেন: ও মাখন যে মানুষের অব্যবহার্য। কিনবে কে? ওগুলো ফেলে দেওয়াই ভাল।

চটে উঠলেন নিজাম: ফেলে দেবে মানে?

কিন্তু ওগুলো যে মানুষের অব্যবহার্য!

নিজাম বললেন: কিন্তু হিন্দুদের অব্যবহার্য নয়। হিন্দুরা পূজোর জন্যে ওই রকম মাখন কেনে। তুমি একবার হিন্দুদের মন্দিরগুলো দেখে এস।

নিজামের মনের কথাটা বুঝতে পেরেই মিঃ রেড্ডী উঠে পড়ে বললেন: তাই হবে জাঁহাপনা।

বিলম্ব না করে পচা মাখনের টিনগুলি নিয়ে তিনি প্রাসাদের বাইরে চলে গেলেন; নগরের শেষ প্রান্তে একটি গভীর খাদের মধ্যে সেগুলি ফেলে দিয়ে ফিরে এলেন তিনি। যেন বিরাট একটা রাজ্য জয় করে এসেছেন এই রকম একটা মুখের অবস্থা করে তিনি বললেন: টিনগুলি

সব আমি বেচে দিয়ে এসেছি জাঁহাপনা। দাম পেয়েছি ২০১ টাকা।

নিজাম তো মহাখুসী। টাকাটা তাঁর নিজস্ব ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার নির্দেশ গেল তখনই।

আর মিঃ রেড্ডীর হল পদোন্নতি।

জেকব হীরা হচ্ছে পৃথিবীর একটি বিখ্যাত হীরা। ওটির ওজন হচ্ছে ২৮২ ক্যারেট। নিজাম ছিলেন ওই হীরার মালিক। শয়নে-স্বপনে ওটিকে তিনি কিছুতেই কাছছাড়া করতেন না। একটি সাবানের বাক্সের মধ্যে পুরে ওটিকে তিনি 'পেপার ওয়েট' হিসাবে ব্যবহার করতেন।

নিজামের মণি মুক্তায় বোঝাই করা বাক্সের সংখ্যা ছিল কয়েকশ'র মত। এছাড়া ছিল অসংখ্য সোনা আর রুপোর তাল, ইট আর পাত। "কিং কোঠি"র নজর-ই-বাগের সেফ, কাবার্ড, এমন কি টেবিল, চেয়ার আর মেঝের ওপরে সেগুলি সব বিছানো বা ছড়ানো থাকতো। সেই রত্নগুলির ওপরে রাজ্যের ধুলো জমতো, ঘুঘু আর পায়রারা বিনাবাধায় বিষ্ঠ ত্যাগ করত। ঝাড়ুদার দূরের কথা তাঁর সামনে ছাড়া সেই প্রকোষ্ঠে অন্য কারও ঢোকার অনুমতি ছিল না। মাঝে-মাঝে সেই প্রকোষ্ঠে তিনি ঢুকতেন, কল্কিতে চুমুক দিতে-দিতে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে সেগুলি তিনি দেখতেন। তখন তাঁর একমাত্র সঙ্গী থাকতো ছোট আর মাঝারি ধরনের কিছু ইঁদুর। তারা নিজাম বাহাদুরকে গ্রাহ্য না করেই সেই সব উজ্জ্বল কঠিন পদার্থগুলির ওপরে বিনাবাধায় দাঁত বসাতো। ঘোরা ফেরা করতো।

এত সম্পদ থাকা সত্বেও, নিজাম উসমান আলি খাঁর মত কৃপন মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। নিজের জন্যে তিনি প্রায় কিছুই খরচ করতেন না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই কার্পণ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর রক্তমজ্জায় মিশে গিয়েছিল। তাঁর পোষাক ছিল অতি সাধারণ। গায়ে থাকত অল্পদামি একটা সার্ট, পরনে থাকত একটি

ঢিলে পায়জামা। ঝুলের দিক থেকে সেটি আবার যথেষ্ট খাটো। সেই খাটো পায়জামাটিকেও তিনি এত উঁচু করে পরতেন যে তাঁর পায়ের গোড়ালি দুটি সব সময়েই বেরিয়ে থাকত। মোজা দুটিও ছিল সেই রকম। শোনা যায়, ৩৫টি বছর ধরে তিনি একটি ফেজ টুপি পরে এসেছেন।

পারতপক্ষে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে নিমন্ত্রণ করতেন না। নিমন্ত্রণ করলে তার আয়োজনও হোত সামান্য। এমন কি চায়ের টেবিলে কোন সম্মানিত অতিথি এলেও বরাদ্দ ছিল দুটি বিস্কুট। একটি বিরাট প্লেটে বিস্কুট সাজিয়ে অতিথির সামনে রাখা হোত। সেই দুটি বিস্কুটের মধ্যে একটি আবার খেতেন তিনি নিজে। অতিথির সংখ্যা বেশী হলে অবশ্য বিস্কুটের সংখ্যা বাড়তো, কিন্তু কোন সময়েই তা মাথা পিছু একটির বেশী নয়।

তবে স্টেটের খরচায় ভোজনের আয়োজন হলে তাঁর অন্য মূর্তি দেখা যেত। তখন কোন দিক থেকেই এতটুকু কার্পণ্য তিনি বরদাস্ত করতেন না। সেই ভোজে অতিথিদের য়েরোপীয় আর ভারতীয় খানা পরিবেশন করা হোত। সেই সঙ্গে সরবরাহ করা হোত দামি দামি মদের বোতল। যত পার খাও-দাও আর স্ফূর্তি কর—এই ছিল তাঁর নীতি, অথবা রাজনীতি।

নিজাম-উসমান আলি খাঁ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শোনা যায়। সেগুলির মধ্যে একটি বিশেষ কাহিনী হচ্ছে সিগারেটের। নিজাম বাহাদুর অতিমাত্রায় সিগারেট খেতেন। সেই সিগারেটের নাম হচ্ছে চারমিনার। তখনকার দিনে এর দাম ছিল পকেট পিছু বারো পয়সা। কোন অতিথি তাঁকে দামি অ্যামেরিকান বা টার্কিস সিগারেট খেতে দিলে তিনি আগন্তুকের কাছ থেকে কয়েকটি সিগারেট চেয়ে নিতেন ; কিন্তু চারমিনার নেবাতেন না। পরে অন্য কোন সম্মানিত অতিথি এলে তিনি সেই সিগারেট দিয়ে অতিথি সৎকার করতেন। ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে কথা বলার জন্যে ভি-পি-মেনন

একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। নিজাম তাঁকে একটি চারমিনার খেতে দেন। স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে মেনন সাহেব তা বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করে নিজের প্যাকেট থেকে একটি ভাল সিগারেট বার করে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে অনুরোধ করেন। নিজামের সিগারেটটি বেশ ভাল লাগে। মেনন সাহেবের কাছ থেকে কয়েকটি সিগারেট তিনি চেয়ে নেন। কয়েক দিন পরে আবার যখন মেনন সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন নিজাম চারমিনার না দিয়ে তাঁরই দেওয়া একটি সিগারেট খেতে দেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এত সম্পত্তি যাঁর, এবং পৃথিবীর মধ্যে যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে একজন প্রথম সারির ধনী বলে বিখ্যাত, সেই নিজামের অর্থের ওপরে এত লোভ ছিল কেন?

এ-প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি।

এ সম্বন্ধে দেওয়ান জার্মানি দাশ তাঁহার 'মহারাজা' গ্রন্থে বলছেন: শোনা যায়, উসমান আলি খাঁর বাবার অনেকগুলি রানী ছিলেন। গুজব, একটি মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর কুখ্যাত উপপত্নীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। সেই নারীর গর্ভে একটি ছেলের জন্ম হয়। তাকে দেখতে ঠিক মাড়োয়ারীর মত। এই রাজবংশের অন্যান্য অংশীদাররা অভিযোগ করেন যে সেই ছেলেটিকে প্রাসাদে নিয়ে এসে তাকে নিজামের পুত্র বলে ঘোষনা করার চেষ্টা চলছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সেই ছেলের আকৃতি আর প্রকৃতি মাড়োয়ারীর অনুরূপ হয়ে দেখা দেয়।

উসমান আলির চরিত্র সংশোধন করতে না পেরে নিজাম বাহাদুর ভারত সরকারের কাছে অভিযোগ জানালেন: ও আমার ছেলে নয়। আমার বিবাহিতা পত্নীদের গর্ভে দুটি ছেলে জন্মেছে। এক জনের নাম সালাবাত ঝা, অপরটির নাম বাসাবাত ঝা, ওরাই আমার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

সেই কিশোর বয়স থেকেই উসমান আলি খা অত্যন্ত ধুরন্ধর

ছিলেন। বাবার অভিসন্ধি বুঝতে পারলেন তিনি; বুঝতে পেরেই কেমন করে ভাগীদারদের হঠানো যায় সেই উদ্দেশ্যে প্রাসাদের মধ্যে নানান ধরনের ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলেন; আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন যাতে নিজাম বাহাদুরের তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয়।

আল্লা বোধ হয় তাঁর প্রার্থনা শুনে থাকবেন, কারণ, নিজাম বাহাদুর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং মারা যান। অসুস্থ নিজামকে দেখতে তিনি তো যান ই নি, এমন কি, নিজামের মৃত্যুশয্যার পাশেও তাঁকে দেখা যায় নি।

শেষ পর্যন্ত বিনা বাধায় উসমান আলিই সিংহাসনে বসলেন। সিংহাসনে বসেই তাঁর প্রথম কাজ হল রাজপ্রাসাদ থেকে রাজপরিবারের সকলকে উচ্ছেদ করা। সালাবাত খাঁ, আর বাসাবাত খাঁ ব্রিটিশ সরকারের কাছে আর্জি পেশ করলেন: আমরাই ভূতপূর্ব নিজামের আসল সন্তান; সুতরাং হায়দারাবাদের সিংহাসন আমাদেরই ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড বেঁচে থাকলে হয়ত, এই সমস্যার একটা সমাধান হোত, কিন্তু উসমান আলির কপাল ভাল যে সপ্তম এডওয়ার্ড ঠিক সেই সময়েই মারা গেলেন। স্বভাবতই ব্যাপারটিতে হাত দিতে ব্রিটিশ সরকারের কিছু দেরী হয়েছিল। সেই সুযোগে সোনার ইঁট আর হীরে জহরতের দৌলতে উসমান আলি ব্যাপারটাকে চিরকালের জন্যে পাথরচাপা দিয়ে দিলেন, এবং ব্রিটিশ সরকারের পাঞ্জা নিয়ে অংশীদারদের সমস্ত দাবী নস্যাৎ করে নিজেই হায়দারাবাদের আইন সঙ্গত নিজাম হয়ে বসলেন।

প্রথম মহড়ায় জিতে দ্বিতীয় মহড়ার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন উসমান আলি খাঁ। তিনি জানতেন শত্রুর শেষ রাখতে নেই। ভূতপূর্ব নিজাম সালাবাত খাঁকে বোম্বাই-এর যে প্রাসাদটি দিয়েছিলেন বর্তমান নিজাম সেই প্রাসাদটি দখল করে নিলেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছে অভিযোগ জানালেন সালাবাত খাঁ; ব্রিটিশ রেসিডেন্ট প্রাসাদটি

ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে নিজাম উসমান আলি খাঁ-কে নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু উসমান আলি খাঁ ছিলেন চতুর শিরোমণি। তিনি জানালেন—প্রাসাদটি তাঁর চাই ; তবে প্রাসাদের যা দাম হবে তা দিতে তিনি রাজি।

অনেক দর কষাকষির পরে সালাবাত খাঁ তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। তখন প্রাসাদটির দাম কত হওয়া উচিৎ তা ঠিক করার ভার দেওয়া হল কোয়াস্‌জি জেহাঙ্গীরের [Cowasji Jehangir] ওপরে।

উসমান আলি খাঁর গোপন দূত ছুটলো স্যার জেহাঙ্গীরের কাছে। সঙ্গে নিয়ে গেল প্রচুর উপঢৌকন, হীরে-মুক্ত-মানিক। উদ্দেশ্য প্রাসাদটির দাম অনেক কমিয়ে দিতে হবে। স্যার জেহাঙ্গীরকে তাতে টলানো গেল না। প্রাসাদটির মূল্য ধার্য হল সতের লক্ষ টাকা।

অন্য কোন উপায় নেই দেখে, টাকাটা দিয়েই তাড়াতাড়ি প্রাসাদটি দখল করলেন উসমান আলি খাঁ। তারপরেই তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সতের লক্ষ্য টাকা কমে গিয়েছে। কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন তিনি, তারপরেই মাথায় বুদ্ধি এসে গেল প্রাসাদটিকে সরকারী সম্পত্তি বলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোষনা করে দিলেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা সরকারী তহবিল থেকে তুলে এনে নিজের তহবিলে জমা দিলেন। সাপও মরলো, লাঠিটাও অটুট রইলো। একেই বলে ওস্তাদের খেল।

কিন্তু সালাবাত খাঁ বাঁচলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই রহস্যজনক অবস্থায় তিনি মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে নিজাম আলি খাঁ মৃতের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করলেন। তবে, বাসাবাত খাঁ-র জন্য ভারত সরকার যে মাসিক পাঁচ হাজার টাকার ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সেই টাকা তিনি হায়দারাবাদের কোষাগার থেকেই নিয়মিত ভাবে পেতেন।

ইনিই হচ্ছেন হায়দারাবাদের নিজাম লেফটন্যানট জেনারেল

হিজ একসজালটেড হাইনেস উসমান আলি খাঁন বাহাদুর, আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়ক, ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির সময়ে যাঁর ব্যক্তিগত তহবিলে কাঁচা টাকার পরিমান ছিল ছেচল্লিশ কোটি।

নিজাম উসমান আলি খাঁর স্বপ্ন তিনি স্বাধীন হবেন।

অর্থাৎ, পনেরই আগস্ট ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হায়দারাবাদের স্বাধীনতা ঘোষনা করবেন।

আজ বলে নয়; একটি মাত্র কামান না দেগেই, স্বাধীনতা অর্জন করার স্পৃহা উসমান আলি খাঁর সেই প্রথম থেকে, ১৯১১ সালে যেদিন তিনি হায়দারাবাদের সিংহাসনে কায়েমী হয়ে বসেছিলেন। ভেবেছিলেন যে-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে তিনি হায়দারাবাদের সিংহাসন নিষ্কটক করেছিলেন, এখানেও তারই আশ্রয় নেবেন।

কিন্তু সে-কলাচাতুর্য এখানে খাটে নি। বারবার তিনি ব্রিটিশ সরকারকে পত্রাঘাত করেছেন, বারবার রথীমহারথীদের দামি-দামি উপহার পাঠিয়েছেন; ব্রিটিশ সরকার তাঁর সব আর্জিকে ময়লা ফেলার বাক্সে ফেলে দিয়েছে।

বড় জাতের হ'লেই কি আরশোলাকে কেউ পাখি বলবে? নিজাম গদীতে বসার কয়েক মাস পরেই লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন এই বলে যে দুটি বছর তাঁকে শিক্ষণবীশী করতে হবে। তারপরেও প্রয়োজন হ'লে একটি "কাউন্সিল অফ এজেন্সী" নিয়োগ করার ক্ষমতা ভারত সরকারের থাকবে।

ধমকানি খেয়ে কিছুদিন চুপচাপ বসেছিলেন নিজাম উসমান আলি খাঁ। ভেতরে ভেতরে কিন্তু তিনি প্যাঁচ কষছিলেন। ১৯১৯ সালে আবার তাঁর ছটপটানি সুরু হল। স্বাধীনতাই হোক অথবা স্বায়ত্ব শাসনই হোক—একটা কিছু তাঁকে দিতেই হবে। এবারে লর্ড ক্লেমসফোর্ড তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, রাজ্যশাসন করাটা তাঁর ঘরোয়া ব্যাপার নয়। তার ওপর হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ স্বাধীনতা

ব্রিটিশ সরকারের রয়েছে ; এবং, প্রয়োজন হলে, সেই ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার তিনি করবেন।

কিন্তু উসমান আলি খাঁ এত সহজে ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। ১৯২৫ সালে ভাইসরয়কে তিনি একটি চিঠিতে লিখলেন বৈদেশিক আর রাজ্যশাসনের মূল নীতিগত ক্ষমতা বাদ দিয়ে ব্রিটিশ ভারতে ভারত-সরকার যে-সব সুযোগ-সুবিধে পায় তাঁকেও সেই সব সুযোগ-সুবিধে দিতে হবে।

ব্রিটিশ সরকারেরও সেই এক কথা। ওসব আশা বরবাদ কর। অন্যান্য দেশীয় রাজাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যে সম্পর্ক রয়েছে হায়দারাবাদের সঙ্গেও সেই সম্পর্ক বজায় থাকবে। এদিক থেকে সে বিশেষ কোন পৃথক সম্পর্কের দাবি করতে পারে না।

করবেই বা কেন? এই সাম্রাজ্য অর্জন করার জন্যে নিজামরা কী করেছে! নিছক ষড়যন্ত্র পাকিয়ে আর পরের ঘাড়ে বন্দুক চাপিয়ে এত বড় সাম্রাজ্য দু'শ বছর ধরে বজায় রেখেছে পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় নজির অন্য কোন রাজা-মহারাজার নেই। এই রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সব গৌরব আর কৃতিত্ব ব্রিটিশ সরকারের। এর জন্যে ব্রিটিশদের কাছে কি তাঁর কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ নয়?

এড্ওয়ার্ড থমসন সাহেব বললেন :

Hyderabad which to-day is recognised as in a class apart from the Indian states, its ruler styled His Enalted Highnees and Britain's Faithful Ally, attained this distinction entirely by the fact that it became very early a *tulchan* kingdom .. held upright by the Company. Unlike the Mahratlas, the State had neither racial nor religious Cohesion --when the final war with Tipu began...Hyderabad was not a large State. But when the war ended, its boundaries were extended,···but no State has ever combined such material importance with so undistinguished a career and so fictious an independence, until comparatively recently.

Edward thompson—Making of the Indian Princes.

আজ হায়দারাবাদ যে অন্যান্য দেশীয় রাজাদের কাছ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে দাবি করতে পারছে, এর নবাব যে হিজ একস্‌জালটেড হাইনেশ খেতাব পেয়েছে, এবং ব্রিটেনের "বিশ্বস্ত বন্ধু" বলে সম্মানিত হয়েছেন তার একমাত্র কারণ প্রায় প্রথম থেকেই এটি কোম্পানীর ছত্রছায়ায় আশ্রয় পেয়েছিল। কোম্পানীই এর শিরদাঁড়া সোজা করে রেখেছিল। মারাঠাদের মত হায়দারাবাদে কোন দিনই জাতীয় আর ধর্মের দিক থেকে কোন সংঘতি ছিল না। টিপুর সঙ্গে যখন শেষ যুদ্ধ সুরু হল তখন হায়দারাবাদের আয়তন বিশেষ একটা বড় ধরণের ছিল না। সেই যুদ্ধ যখন শেষ হল তখনই এর আয়তন বৃদ্ধি পেল কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন রাজ্যের নাম আমরা শুনিনি যে এত নগন্য কর্মদক্ষতা সত্বেও এত বিরাট পার্থিব লাভে সক্ষম হয়েছে।

এই রাজ্য আর তার নবাবদের সম্বন্ধে ওয়ারেন হেস্টিংস কী বলেছেন শুনুন। ১৭৮৪ সালে দেশে ফিরে যাওয়ার সময় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে হায়দারাবাদের নিজামদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব থাকবে না। হয় তাঁদের মারাঠাদের অধীনে থাকতে হবে, না হয়, থাকতে হবে কোম্পানীর তাঁবেদার হয়ে।

His dominions are of small extent and scanty revenue; his military Strength is represented to be most Contemptible; not was he at any period of his life distinguished for personal Courage or spirit of enterprise. On the Contrary, it seems to have been his constant and ruling maxim to forment the incentives of war among his neighbours, to profit by their weakness and embaraesments, but to avoid being a party himself in any of their contests, and to submit even to humiliating sacrifices rather than subject himself to the chances of war. *.

অর্থাৎ, নিজামের রাজত্বের আয়তন ক্ষুদ্র, রাজস্বের পরিমাণ

* Edward Thompson : Making of the Indian princes.

নগণ্য। এঁর সামরিক ক্ষমতা তুচ্ছাতিতুচ্ছ। জীবনে ইনি এমন একটি কাজও করেন নি যা থেকে এঁর ব্যক্তিগত সাহস বা দুঃসাহসিক উদ্যমের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর চিরন্তন নীতি [আর সেই নীতির ওপরে নির্ভর করেই তিনি রাজ্য পরিচালনা করতেন] ছিল পার্শ্ববর্তী রাজাদের মধ্যে পাকে প্রকারে বিবাদ লাগিয়ে দেওয়া ; আর তাদের দুর্বলতা এবং বিপদের সুযোগ নিয়ে নিজের সুবিধে আদায় করা। অথচ, নিজে তিনি ওদের বিবাদে কোন পক্ষের সঙ্গেই হাত মেলাননি ; গণ্ডগোল থেকে সব সময়েই নিজেকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতেন। যুদ্ধের কোন ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের কাছে মাথা নত করে যে-কোন সম্মানহানিকর চুক্তিতেই সই করতে এঁর রুচিতে বাধেনি কোন দিন।

সেদিন আজ আর নেই। বর্তমান নিজাম কেবল একটি দেশের রাজাই নন, তিনি আলা হজরত ; মুসলিম সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত গুরু। প্রায় বিরাশী হাজার বর্গমাইল জুড়ে তাঁর সাম্রাজ্য ; জনসংখ্যা যোল কোটির কাছাকাছি। রাজস্ব হচ্ছে বছরে ছাব্বিশ কোটি টাকা। এছাড়া, ছিল তাঁর নিজস্ব ট্যাকশাল, নোট ছাপানোর যন্ত্র এবং কারেন্সী, আর ছিল ষ্ট্যাম্পস।

ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকেও হায়দারাবাদের অবস্থা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এর উত্তরে মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমে বোম্বাই, পূর্ব ও দক্ষিণে মাদ্রাজ। এক কথায় এটিকে দাক্ষিণাত্যের প্রধান ফটক বলা যায়।

নিজাম উসমান আলি খাঁ কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না যে স্বাধীনতা অর্জনের পথে তাঁর বাধাটা কোথায়? রাজ্য শাসনে তিনি যে দক্ষ নন একথা কে বলবে? তাঁর মগজের মধ্যে যে কূটবুদ্ধি কাজ করে আসছিল তার কাছে বোমা-কামান-বন্দুক নস্যি। ষড়যন্ত্রের খেলায় এমন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় খুব কমই আমাদের চোখে পড়েছে।

রাজ্যশাসনের দক্ষ্যতা তাঁর ছিল অপূর্ব। রাজকোষের অর্থ দিয়ে একটি বিরোধী দলকে তিনি গোপনে পালন করতেন। তাঁর রাজ্যে মন্ত্রীর অভাব ছিল না; কিন্তু যা করার তিনি নিজেই সব করতেন। মন্ত্রীদের অগ্রাহ্য করতে তাঁর এতটুকু সময় যেত না। কোন মন্ত্রী তাঁর কাজের সামান্য মাত্র প্রতিবাদ করলে, তিনি ক্ষেপে উঠতেন। তাতেও নিরস্ত না হলে, মন্ত্রীদের চাকরি খতম হয়ে যেত।

তাছাড়া ছিল ষড়যন্ত্র। রাজসভা আর রাজপ্রাসাদ ঘিরে চক্রান্তকারীদের দল ঘুরে বেড়াতো। এই ষড়যন্ত্রের উৎস এবং উৎসাহদাতা ছিলেন স্বয়ং উসমান আলি খাঁ। বিভিন্ন রাজপুরুষদের গোপনে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করার চেষ্টা করে'ছলেন তিনি।

তাতে ব্যাগড়া দিল হিন্দুরা। কিন্তু এদেরও শায়েস্তা করার জন্যে তিনি কি কম চেষ্টা করেছেন? পেরেছেন কি? পারেন নি। আবার তাদের সঙ্গে জুটেছে প্রগতিবাদী কিছু মুসলমান। তবে মুসলমানদের নিয়ে তাঁকে কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না। হেঁপা পোয়াতে হবে ওই হিন্দুদের নিয়ে। এই ভয় তাঁর ছিল বলেই, হিন্দুদের এতদিন তিনি মুখ তুলে ঘাস খেতে দেননি। স্বৈরাচারী রাজার হাতে প্রজা নিপীড়নের যতগুলি হাতিয়ার ছিল তাদের কোনটিই অকেজো করে রাখেন নি তিনি।

হায়দারাবাদের মোট জনসংখ্যার পঁচাশী ভাগ ছিল হিন্দু। কিন্তু সরকারী চাকুরির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ছিল মুসলমানদের হাতে, পুলিশ আর প্রতিরক্ষা বাহিনীর শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ ছিল মুসলমানদের।

নবাবের জাতভাই হওয়ার ফলে বড়-বড় সহরেই মুসলমানরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করত; এবং এদের সুপারিশ ছাড়া সরকারী চাকুরির বন্ধ দরজা খোলা হোত না। গ্রাম্য জনসংখ্যার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ছিল হিন্দু। প্রায় দু'শ বছর পরাধীনতা আর অত্যাচারের ফলে

এই হিন্দুরাও চরিত্রহীন হয়ে পড়েছিল। শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেও ওই একই রকমের রীতি লক্ষ্য করা যেত। সেই কাজির যুগের মত নিজাম বা উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজকর্মচারীদের কাজের সমালোচনা করার সাহস ছিল না হিন্দুদের। তারাও রাজপুরুষদের কৃপালাভ করার জন্যে চাটুকারিতার আশ্রয় নিত। তারাও চাপে পড়ে প্রকাশ্যে বলে বেড়াত যে আলা হজরত বিজ্ঞ, সৎ-শাসক ; এবং হিন্দু আর মুসলমান তাঁর দুটি চোখ। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানে কোন পার্থক্য নেই।

এতেও নিজাম উসমান আলি খাঁ সন্তুষ্ট থাকেন নি। হায়দারাবাদে হিন্দুরা যে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এই তথ্যটিকে কিছুতেই তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তাই সে সংখ্যাকে কমনোর জন্য কী করা যায় সেই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন।

এল ১৯১৯! এই সময়ে ভারত শাসনতন্ত্রের যে খসড়াটি অনুমোদিত হয়েছিল, তারই ফলে ব্রিটিশ-ভারতের প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের কিছু কিছু দায়িত্ব আংশিকভাবে নির্বাচিত সদস্যদের ওপরে দেওয়া হয়েছিল। এই দায়িত্ব দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় রাজগুলির প্রজারাও নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে একটু একটু করে সজাগ হতে লাগলো। হায়দারাবাদও বাদ গেল না।

এতদিন আলা হজরতই ছিলেন দেশের সর্বময় কর্তা, দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র অধিকারী। তাঁর রাজ্যে নির্বাচন হোত না ; ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগ অনুমোদন করলেও, মন্ত্রীমণ্ডলীর ওপরে একছত্র অধিকার ছিল তাঁর। শাসনকার্যে প্রজাদের নাক গলানোর কোন এক্তিয়ার ছিল না। তাঁর সেই একছত্র অধিকারের অচলায়তন প্রথম নড়ে উঠল ১৯১৯ সালে।

১৯১৯ সাল এ কী মারাত্মক বিপদ ডেকে আনলো।

হায়দারাবাদের প্রধান মন্ত্রী তখন স্যার আলি ইমান। প্রগতিশীল বলে সে যুগে তাঁর কিছুটা সুনাম ছিল। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে

"একসজিকিউটিভ কাউন্সিল" গঠন করার অনুমোদন দিতে শেষ পর্যন্ত নিজামকে তিনি রাজি করাতে পেরেছিলেন। কিন্তু কাউন্সিলটি গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজাম সেটিকে একেবারে অকেজো করে দিলেন।

তারপরেই রাজ্যের সমস্ত প্রগতিশীল গণ-অভ্যুত্থান গুলিকেই তিনি দিলেন চেপে।

তখনও কিন্তু হায়দারাবাদ স্টেট কংগ্রেসের জন্ম হয়নি।

১৯২৬ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে নিজামের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় নূতন একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হল। দলটির নাম মজলিস-ই-ইত্তেহাদ-উল-মুসালমীণ [Majlis-i-Ittahad-ul-mussulmeen]—সংক্ষেপে ইত্তেহাদ। এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন মাহমুদ নওয়াজ খাঁ। এর উদ্দেশ্য ছিল মূলত দুটি : নিজামের সমর্থনে হায়দারাবাদের মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করা, আর বিরাট আকারে ধর্মান্তরিত করে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমিয়ে আনা। ভুলে গেলে চলবে না যে এ-দুটি কর্মপদ্ধতিই নিজামের আর্শীর্বাদ লাভে সক্ষম হয়েছিল।

পরে নিজামের অনুগ্রহে পুষ্ট হয়ে এই ইত্তেহাদ বাহাদুর ইয়র যঙের নেতৃত্বে দেশময় বিভীষিকার সৃষ্টি করে বসেছিল। তাদের সকল কাজের সেরা কাজ ছিল হিন্দু আর প্রগতিশীল মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টাকে ধ্বংস করা। তারা জোর করে হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে সুরু করল। ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে তারা ধর্মবীর বলে পরিচিত হল। তারা শ্লোগান দিতে লাগল : নিজাম দীর্ঘজীবি হোন, দাক্ষিণাত্যের জাতীয়তাবাদের রাজ প্রতীক দীর্ঘজীবি হোন।

কিন্তু ভারতীয় প্রদেশগুলিতে যখন স্বাধীনতার সংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠেছে তখন হায়দারাবাদের মানুষকে এভাবে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আর তা গেলও না। গেল না দেখে তাড়াতাড়ি কয়েকটি

জরুরী আইন তৈরী হয়ে গেল। সেই আইনের বলে সভাসমিতি নিষিদ্ধ হল ; অর্থাৎ হিন্দুরাই এই আইনের আওতার মধ্যে পড়ল ; ইত্তেহাদ নয়। সময়টা হল ১৯২৯ এর কাছাকাছি।

১৯৩৫ সালে হায়দারাবাদে এক অসাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে উঠলো—তার নাম "নিজামস সাবজেকটস লীগ" [নিজামের অধীনস্থ প্রজাদের সংগঠন]। এর উদ্দেশ্য ছিল সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে হায়দারাবাদে একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। উদ্দেশ্য ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজামের সরকার ক্ষেপে উঠলো! দায়িত্বশীল সরকার! আলা হজরত ছাড়া হায়দারাবাদ শাসন করার ক্ষমতা আর কারও নেই। সুতরাং সেই সংগঠনটিও জন্মের আগেই মৃত্যু বরণ করল।

কিন্তু তাতেও শান্তি ফিরে এল না। হিন্দুদের কিছুটা আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে নিজাম একটি Reforms Committee গঠন করলেন। তার উদ্দেশ্য হল স্টেটের বিভিন্ন স্বার্থের সঙ্গে সরকারের একটি যোগসূত্র স্থাপন করা।

সরকারের এই কৌশল বুঝতে পেরে হিন্দু আর মুসলমানদের একটি বেশ বড় অংশ মিলিত ভাবে একটি জোটে মিলিত হওয়ার জন্যে ডাক দিল। নিজাম সবই লক্ষ্য করছিলেন। সম্মেলন বসানোর যখন তোড়জোড় সুরু হয়েছে এমন সময় তীর ছুঁড়লেন নিজাম বাহাদুর। মুসলমানরা জানিয়ে দিল আমাদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রতিনিধিত্ব চাই। হিন্দুরা তো অবাক। যাদের মোট সংখ্যা হল শতকরা তের ভাগ তারা চায় পঞ্চাশ ভাগ আসন ?

গোলমাল সুরু হল এই নিয়ে। মুসলমান সদস্যেরা কোন ফয়শালায় এল না। সরে দাঁড়ালো। ভেঙে গেল সম্মেলন।

১৯৩৭ সালে হায়দারাবাদের প্রধান মন্ত্রী হয়ে এলেন স্যার আকবর হায়দারী। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁর এক ফ্যাসাদ দেখা দিল। মুসলমানরা ভাবতে লাগলো প্রধানমন্ত্রী কৌশলে হায়দারাবাদকে ফেডারেশনের

মধ্যে ঢুকোতে চাইছেন, আর ব্রিটিশ সরকার ভাবলো ওঁর জন্যেই হায়দারাবাদকে ফেডারেশনের মধ্যে টেনে আনা যাচ্ছে না। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে আকবর হায়দারী অনেক কসরৎ করেছিলেন; শেষ পর্যন্ত পরধর্ম ভয়াবহ চিন্তা করে মুসলমানদের সঙ্গেই হাত মিলালেন। তিনি উগ্রপন্থী মুসলমানদের খুসী করার জন্যে ইত্তেহাদ-দরদী খাজা মইন-উদ-দীন আনসারীকে তাঁর মন্ত্রীসভার সেক্রেটারী হিসাবে নিযুক্ত করলেন। ইনিই পরে নবাব মাইন নওয়াজ যঙ বলে পরিচিত হয়েছিলেন। আরও দশ বছর পরে ইনি অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই করেছিলেন।

১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে শ্রীরামাচার এবং শ্রী বি-রামকৃষ্ণ রাও —এই উভয়ের চেষ্টায় স্টেট কংগ্রেস স্থাপিত হল। এর চাহিদা ছিল সামান্য—আসফিয়া বংশের হিজ একসজালটেড হাইনেশ নিজামের অধীনে একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা।

কিন্তু নিজামকে অত সহজে ভোলানো যায় না। তিনি সজাগ হয়ে উঠলেন। ৪ঠা সেপটেম্বর (4. 9. 38) ডিফেন্স অফ হায়দারাবাদ আইনটি পাশ হল; এবং তারই চারদিন পরে স্টেট কংগ্রেসকে বেআইনী সংগঠন বলে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল।

এককথায় কোন রকম শাসন সংস্কারের পক্ষপাতী নিজাম ছিলেন না; কারণ তিনি জানতেন গণতান্ত্রিক উপায়ে যে কোন সংস্কারই তিনি করুন না কেন তাতে লাভবান হবে হিন্দুরা; এই সব কাফেরদের ওপরে তাঁর এবং তাঁর অনুগ্রহ পুষ্ট মুসলমান রাজপুরুষদের কোন রকম আস্থা ছিল না। সুতরাং সম্ভব হলে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত কর, দেশ থেকে হঠিয়ে দাও, শিক্ষায় বাধাসৃষ্টি কর; এক কথায় উত্যক্ত করে মার। এমন ভাবে উত্যক্ত কর যাতে বিরক্ত হয়ে হিন্দুরা ঝাঁকে-ঝাঁকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

নিজাম বাহাদুরের ইশারাতেই কাজ সুরু হয়ে গেল। নানা জায়গা থেকে মুসলমানরা আসতে লাগলো, মুসলমান এলাকায় হিন্দু

মন্দিরের সংস্কার নিষিদ্ধ হয়ে গেল, হিন্দু এলাকায় হিন্দু মন্দির কলুষিত হল। দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে যারা ধরা পড়ল তাদের কেউ শাস্তি পেল না। হিন্দু পুরোহিতদের ক্রিয়াকর্ম সীমাবদ্ধ হয়ে এল; অথচ, ইত্তেহাদের সদস্য মুসলমান মোল্লারা "হিন্দু তাড়াও" যজ্ঞে দেশ ছেয়ে ফেলল।

এই সময়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হল। হিন্দুদের ধর্ম আচরণের ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার দাবিতে আর্য সমাজ আর হিন্দু সিভিল লিবার্টিস য়ুনিয়ন এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনটি পরিচালনা করল। সেই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্যে ভারত থেকে বহু সত্যাগ্রহী সীমান্ত অতিক্রম করে হায়দারাবাদে উপস্থিত হল।

প্রায় আট হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করার পরেও যখন আন্দোলনের তীব্রতা কমলো না, বরং উত্তরোত্তর বাড়াত লাগলো তখনই প্রধান মন্ত্রী স্যার আকবর হায়দারীর প্রতিশ্রুতিতে আন্দোলনটিকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল হিন্দুদের ধর্মচর্চায় অতঃপর আর কোন বাধার সৃষ্টি করা হবে না। রাজনীতি বাদ দিয়ে হিন্দুরা বিনা বাধায় নিজেদের ধর্মচর্চা করতে পারবে।

কিন্তু রক্ষা করার জন্যে স্যার হায়দারী প্রতিশ্রুতি দেন নি। তিনি হায়দারাবাদের নূতন রাজপুরুষ নন; এর আগে তিনি নিজামের অর্থ-মন্ত্রী ছিলেন। সেই সময় থেকেই তিনি মনে-প্রাণে সাম্প্রদায়িক; ইত্তেহাদের মগজ বলা যায়। সুতরাং হিন্দুদের ধর্মের ওপরে অত্যাচার করা হবে না এতবড় প্রতিশ্রুতি ইত্তেহাদী মুসলমান হয়ে তাঁর পক্ষে রক্ষা করা সত্যিই বড় কঠিন ছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৩৮ সালে ইত্তেহাদের নূতন কার্যবিধি লিখিত হল। এতদিন সে ছিল "রাজার পার্টি"; এবারে হায়দারাবাদের একমাত্র সার্বভৌমিক ক্ষমতা হবে সে-ই—"we are the sovereign in the Deccan"—declared Bahadur.

Reforms Committe-র রায় বেরোল। ঠিক হল যৌথ নির্বাচন পদ্ধতিতে যে নির্বাচন হবে তাতে হিন্দু আর মুসলমানদের সদস্য সংখ্যা থাকবে আধা-আধি। সমতা বজায় রাখার জন্যে একজন পার্শী আর একজন ক্রীশ্চান সদস্য নির্বাচিত হবে।

তাতেও খুশী নয় ইত্তেহাদ। আধাআধি বখরার মধ্যে তারা নেই। ইত্তেহাদের নেতা বাহাদুর ইয়র যঙ প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন: হায়দারাবাদকে মুসলিম স্টেটে পরিণত করা হোক।

অর্থাৎ, সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যাগরিষ্ঠের দলকে শাসন করবে।

জিন্নাহ্ সাহেবও চুপ করে রইলেন না। হায়দারাবাদের এই সঙ্কটে তিনি এগিয়ে এসে বললেন: হায়দারাবাদের শতকরা সাতাশী ভাগ হিন্দুদের আইন করে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে নামিয়ে দেওয়া হোক।

নিজাম বাহাদুরের পক্ষেও মুসলমানদের ওপরে এতবড় অবিচার সহ্য করা কষ্টকর। তাই তিনি আশ্বাস দিলেন—তাই হবে। হিন্দুদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সদস্যদের মধ্যে আমার নির্বাচিত একজন পার্শী এবং একজন ক্রীশ্চান থাকবে।

এর চেয়ে বেশী নিরপেক্ষ নবাব আর কোথাও দেখেছেন?

শুধু হিন্দু নয়। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী মুসলমানদেরও ওই একই অবস্থা।

জয়-জয়াকার ইত্তেহাদের।

হায়দারাবাদ মুসলিম রাষ্ট্র জিন্দাবাদ।

আলা হজরৎ জিন্দাবাদ।

এই হলেন হায়দারাবাদের নিজাম বাহাদুর; আর হায়দারাবাদের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাস।

কেবিনেট মিশনের সদস্যেরা দিল্লীতে এলেন ভারতের জাতীয়

নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে। সেই সময় হায়দারাবাদের প্রধান মন্ত্রী ছাতারীর নবাব স্টেট কংগ্রেসের ওপর থেকে সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নিলেন।

ওই বছরেরই আগস্ট মাসে হায়দারাবাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন স্যার মির্জা ইসমাইল। এর আগে মহীশূর আর জয়পুরকে তিনি নতুন ভাবে গড়ে তুলে ছিলেন। তেমনি নতুন ছাঁচে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন হায়দারাবাদকেও। অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যে দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে তারই সঙ্গে হায়দারাবাদ যাতে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে সেই রকম সৎপ্রচেষ্টা তিনি করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু নিজাম উসমান আলি খাঁ তা চান নি।

তা হলে তিনি চেয়েছিলেন কী?

তিনি চেয়েছিলেন স্যার মির্জা ইসমাইলের সুনাম আর প্রবল ব্যক্তিত্বকে নিজের কাছে লাগাতো। তিনি চেয়েছিলেন একটা কোন যুৎসই মুখোসের আড়ালে হায়দারাবাদের শাসন-সংস্কারগুলিকে আপাতত ধামা চাপা দিয়ে রাখতে। চেয়েছিলেন, যে-বেরার প্রদেশটি তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে সেটি ফিরিয়ে আনতে। তিনি জানতেন কংগ্রেসের উঁচু মহলের ওপরে মির্জা ইসমাইলের যথেষ্ট প্রভাব আর প্রতিপত্তি রয়েছে।

স্যার মির্জা ইসমাইল জোর কদমে তাঁর শাসনসংস্কারের কাজে লাগলেন। নিজামী শাসন-সংস্কারের যে-খসড়াটির অংশবিশেষ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল সেটি পড়ে কংগ্রেসী মহলে বিশেষ কোন উৎসাহের সঞ্চার হয়নি। ওটি যে একটি ভূষিমাল তা বুঝতে পেরেই বোধ হয় গান্ধীজি একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে স্যার ইসমাইলকে লিখেছিলেন: এই সংস্কারগুলি যদি আপনি কার্যকরী করেন তাহলে হায়দারাবাদ একটুও এগোবে না। বরং পিছিয়ে যাবে। আপনার

এখন প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে বিষয়টি নিয়ে স্টেট কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনায় বসা।

গান্ধীজির মত অতটা নিরাশ না হলেও, মির্জা ইসমাইলও বুঝতে পেরেছিলেন যে ওই শাসন সংস্কারের মধ্যে হায়দারাবাদের এমন কিছু উপকার হবে না। তবু, আশার কথা হিজ একসজালটেড হাইনেশ এদিক থেকে অত্যন্ত দরাজ হৃদয়। হায়দারাবাদকে একটি স্বয়ংক্রিয় আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার আগ্রহ তাঁর যথেষ্ট বেশী।

যথারীতি নির্বাচন হল। নির্বাচনের অসারতা বুঝতে পেরে স্টেট কংগ্রেস এতে যোগ দিল না। কিছু হিন্দু নির্দলীয় হিসাবে নির্বাচিত হলেন বটে, কিন্তু তাঁরাও নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করলেন। রইলেন কেবল মুসলমানরা, তাঁদের সবাই ইত্তেহাদের সভ্য।

স্যার মির্জা ইসমাইল এর পরে আর টিকতে পারেন নি। ইত্তেহাদ তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে সুরু করল। তাদের ধারণা ভারতের নব গঠিত কনসটিটিউয়েনট অ্যাসেমবলিতে হায়দারাবাদকে জোর করে ঢোকানোর চেষ্টা করছেন তিনি। ইত্তেহাদী পত্রিকা জেহাদ ঘোষনা করে বলল : যে কনসটিটিউয়েনট অ্যাসেমবলিকে ভারতীয় মুসলমানেরা পরিত্যাগ করেছে, এবং যেটি এখন কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, মির্জা ইসমাইল সেইখানে হায়দারাবাদকে ঢোকানোর চেষ্টা করছেন ; এবং তিনি নিজে একজন মুসলমান এবং মুসলিম রাষ্ট্র হায়দারাবাদের প্রধান মন্ত্রী হয়েও কংগ্রেসী পাণ্ডাদের সঙ্গে দহরম-মহরমে মেতে রয়েছেন। দিল্লিতে অ্যাসেমবলির বারান্দায় কংগ্রেসী নেতাদের হিন্দুদের মত দুহাত তুলে নমস্কার করতে স্যার মির্জাকে দেখা গিয়েছে। এরকমও তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে যে সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়ার ফলে হিন্দুরাই একদিন হায়দারাবাদ শাসন করবে।

ছিঃ-ছিঃ! ঘরের শত্রু বিভীষন। মুসলমান হয়ে হিন্দুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব?

ইত্তেহাদী প্রচার যন্ত্র স্যার মির্জা ইসমাইলের বিরুদ্ধে কাজে নামলো।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে নূতন আন্দোলন স্বুরু হয়েছে। আসন্ন ভারত বিভাগের সম্ভাবনায় নূতন পরিস্থিতি দিয়েছে দেখা। এখন নিজামের অন্য কাজ; বাজে শাসন সংস্কার নিয়ে মাতলে চলবে না। স্যার মির্জা ইসমাইলকে আর তাঁর প্রয়োজন নেই। ইত্তেহাদী কাঁটা দিয়ে ইসমাইলী কাঁটাটা তিনি তুলে ফেললেন।

১৯৪৭ সালের ৫ই মে স্যার মির্জা ইসমাইল পদত্যাগ ককলেন

ব্রিটিশ সরকারের তেসরা জুনের [১৯৪৭] নীতি ঘোষিত হওয়ার পরেই নিজাম একটি ফারমান জারি করে বললেন যে পাকিস্তান বা ভারতবর্ষের নবগঠিত আইন সভাতে যোগ দেওয়ার জন্যে কোন প্রতিনিধি পাঠানোর ইচ্ছে তাঁর নেই; সেই সঙ্গে এই কথাটাও তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে :৫ই আগস্টেই তাঁর রাজ্যটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে। তাঁর মনের বাসনা হচ্ছে ওই তারিখেই ডোমিনয়ন স্ট্যাটস পেতে; তারপর থেকে তিনি ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ নেশনস - এর সদস্য হিসাবে গণ্য হতে চান।

উত্তম কথা।

কিন্তু ইনডিয়ান ইনডিপেনডেনস বিলের ৭নং ধারায় তো তেমন কোন অধিকার দেশীয় রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয় নি। সেই ধারা অনুযায়ী পাকিস্তান বা ভারতীয় যুনিয়ন যে কোন একটির সঙ্গে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এ ছাড়া তৃতীয় কোন পথ তাদের নেই।

ধারাটি পড়েই তো নিজামের চক্ষু চড়কগাছ। তিনি তৎক্ষনাৎ ব্রিটিশ সরকারের কাছে অভিযোগ জানালেন: আমরা আপনাদের

পুরানো এবং বিশ্বস্ত বন্ধু ; বিপদের সময় আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করবেম একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

ডুবন্ত মানুষ যেমন একটা খড়ের কুটো ধরে বাঁচতে চায়, নিজাম উসমান আলি খাঁও সেই রকম একটা কিছু আশ্রয়ের জন্যে চারপাশে তাকাতে লাগলেন। দেখতে পেলেন শক্ত একটি ঘাঁটি-ই তাঁর রয়েছে। সেই ঘাঁটিটি হল পলিটিক্যাল দপ্তরের স্যার কনরাড কোরফিলড। ভারতের এই বিজাতীয় শত্রুটি তখনও বহাল তবিয়তে রাজাদের মদৎ দিচ্ছিলেন। তিনিই তখন দেশীয় রাজাদের বন্ধু। তিনি সবাইকে গোপনে-গোপনে সাহস দিয়ে বলছিলেন—কোন রকমে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সাবধানে চলুন। কিছুতেই অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করবেন না। সময় নিন, জোট পাকান, আইনের কচকচি তুলুন। ১৫ই আগস্টে প্যারামাউন্টসি লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা সবাই স্বাধীন হয়ে যাবেন। কেউ আপনাদের রুখতে পারবে না।

ছোট ছোট রাজারা মাউন্টব্যাটনের ধাক্কা কতটা সামলিয়ে উঠতে পারবে তা বুঝতে না পেরে কনরাড সাহেব বড়-বড় রাজ্যগুলির দিকে নজর দিলেন। এই রকম একটি রাজ্য ছিল হায়দারাবাদ। রাজ্যটিও বিরাট, এর সৈন্য সংখ্যাও মোটামুটি ভাল, এবং প্রচুর অর্থ রয়েছে এর কোষাগারে। তাছাড়া স্বয়ং নিজাম কংগ্রেসের নাম শুনলেই ক্ষেপে যান।

কিন্তু একটা অসুবিধে ছিল।

তখনও পর্যন্ত হায়দারাবাদে প্রায় এক ডিভিসনের মত ভারতীয় সৈন্য ছিল। সেই সৈন্য বাহিনীকে হায়দারাবাদ থেকে সরিয়ে আনতে না পারলে নিজাম শেষ পর্যন্ত অসুবিধেয় পড়তে পারেন এই আশঙ্কাতে কনরাড সাহেব তাড়াতাড়ি দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তুলে নেওয়ার নির্দেশ জারি করলেন। অনেক জায়গাতে তাঁর নির্দেশ মত কাজ হল ; হ'ল না কেবল হায়দারাবাদে।

তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলদেও সিং-এর কাছে চিঠি গেল, অনুরোধ গেল। বলদেও সিং চুপচাপ। তিনি দেখেও দেখলেন না, শুনেও শুনলেন না।

শেষ পর্যন্ত ২২শে জুন নিজামের আইন উপদেষ্টা স্যার ওয়ালটার মন্‌কটনের একটি জরুরী চিঠি এল লর্ড ইসমের কাছে। তিনি যেন ভাইসরয়কে দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা ফয়শালা করিয়ে দেন।

The state (Hyderabad) has been pressing the Political department for removal the Indian Army troops from one Cantonments. There are 7 or 8000 Indian Army fighting troops in the state including armoured formations. The Nizam thinks it quite intolerable that they should remain here after the 15th of August. They would, in effect, be an occupation army……I spoke to the C-in-C (Auchinleck) about it and he said (privately) that we should have nothing to worry about while he was directing the Army. This is Cold Comfort.*

অর্থাৎ, এই স্টেটটি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে আমাদের ক্যানটনমেণ্ট থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পলিটিক্যাল দপ্তরকে বার বার চাপ দিচ্ছে। সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে হায়দারাবাদে এখনও পর্যন্ত সাত থেকে আট হাজার সক্ষম সেনা রয়েছে। ১৫ই আগস্টের পরেও এরা এখানে থাকবে এই কথা ভাবতেও নিজাম বাহাদুরের অসহ্য লাগছে। যদি থাকে তাহলে তাদিকে পরদেশ অবরোধকারী সৈন্যবাহিনী ছাড়া অন্য কিছুই বলা যাবে না। বিষয়টি নিয়ে আমি প্রধান সেনাপতি অচিনলেকের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেম। তিনি আমাকে গোপনে বলেছেন যতদিন তিনি সেনাপতি রয়েছেন ততদিন আমার দুর্ভাবনার কিছু নেই। এটা ঠাণ্ডা আশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

---

* Mosley: The Last days of the British Raj.

মনকটন সাহেব আরও জানালেন যে এখনও পর্যন্ত ক্রাউন রিপ্রেসেনটেটিভই সর্বময় কর্তা। সুতরাং ১৫ই আগস্টের মধ্যে হায়দারাবাদ থেকে সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব তাঁরই; অন্য কারও নয়।

ব্রিটিশ সরকার অতি শীঘ্র ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলেই আমরা জানতে চাই কী ভাবে এবং কতদিনের মধ্যে এই সৈন্য-বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া হবে।

লর্ড মাউন্টব্যাটন এর কোন জবাব দিয়েছিলেন কি না তা আমরা জানি নে; তবে এটুকু জানি যে ভারত-হায়দারাবাদ সংঘর্ষের সূত্রপাত এইখানেই।

নিজাম উসমান আলি খাঁর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাজ পাওয়ার যৌক্তিকতা ইংলণ্ডের লেবার সরকার বা ভাইসরয় কেউ স্বীকার করে নিতে পারে নি। তাঁরা বার বার তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে ভৌগলিক অবস্থান আর জাতীয় সংহতির দিক থেকে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি ছাড়া অন্য কোন পথ নিজামের কাছে খোলা নেই। তাঁকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাজ দিলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সত্যিকারের নীতি বিগর্হিত কাজ হবে। মাউন্টব্যাটনের ভাষায়—"It would be like Poland all over."

তাহলে নিজামের একমাত্র কাজ হচ্ছে অন্য সমস্ত দেশীয় রাজাদের মত ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দলিল সই করা; তারপরে বিশেষ সুবিধে পাওয়ার জন্যে নেহেরু, প্যাটেল আর মেননের সঙ্গে খোলা মন নিয়ে আলোচনায় বসা।

এইটিই ছিল সব চেয়ে ভাল উপদেশ। কিন্তু নিজামের চেলারা কিছুতেই এ-প্রস্তাবে রাজী নয়। তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে হায়দারাবাদকে স্বাধীন মুসলীম রাষ্ট্রে তারা পরিণত করবে; প্রয়োজন হলে, তার জন্যে যুদ্ধ করতেও তারা পিছপাও হবে না। এই উদ্দেশ্যে তারা সৈন্য-বাহিনী গড়ে তুলল, বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করতে সুরু করল;

উগ্রসাম্প্রদায়িক রাজাকাররা যুদ্ধের শ্লোগান দিয়ে প্রচার করতে লাগলো হায়দারাবাদ দিল্লি অধিকার করে লালকেল্লার ওপরে আসফ ঝাহি পতাকা উড়িয়ে নূতন পদক্ষেপ সুরু করবে।

সে কথায় পরে আসছি। বর্তমানে আমরা ১১ই জুলাই-এ ফিরে যাই। ওই তারিখে দিল্লিতে ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে ছাতারীর নবাবের নেতৃত্বে একটি দল পাঠালেন নিজাম। চার জন সদস্য নিয়ে এই দলটি গঠিত হয়েছিল ; নবাব আলি জবর যঙ্, স্যার ওয়ালটার মন্‌কটন, কে-সি আবদার রহিম, এবং পিংলে ভেনকাটারমন রেড্ডী। অন্যপক্ষে ছিলেন স্যার কনরার্ড কোরফিল্ড, গ্রীফিণ, এবং ভি-পি-মেনন।

আলোচনার বিষয় হল তিনটি ; বেরার, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাজ, এবং ভারতভুক্তি।

প্রথমেই আলোচনা সুরু হল বেরার নিয়ে। ওটি নিজামকে ফিরিয়ে দিতে হবে। "ইনডিয়ান ইন্ডিপেনডেনস বিল-এ ওটির ওপরে নিজামের স্বত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কথাটা ঠিক ; কিন্তু মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে বেরার এমন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে মিশে গিয়েছে যে ওখানকার অধিবাসীরা যদি স্বেচ্ছায় হায়দারাবাদের সঙ্গে মিলিত হ'তে না চায় তাহলে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন পথে ওদের সরিয়ে আনা যাবে না। তাছাড়া, ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ সরকার এই নীতি গ্রহণ করেছে যে ভারতীয় কোন স্টেটের চলতি অবস্থার মধ্যে কোন কিছু পরিবর্তন আনতে গেলে সেই স্টেটের অধিবাসীদের মত নিতে হবে আগে। মাউন্ট-ব্যাটন মনে করেন বেরারের অধিবাসীদের কাছে সেরকম কোন প্রস্তাব গেলে তারা কিছুতেই ওদের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন চাইবে না।

হায়দারাবাদকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাজ দেওয়া হবে কি না সেদিক থেকে ব্রিটিশ সরকার বা কংগ্রেসের মনোভাব স্পষ্ট ; অর্থাৎ হবে না। পাকিস্তান বা ভারতীয় য়ুনিয়ন—এ দুটির একটির সঙ্গে নিজামকে

যোগ দিতেই হবে ; এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ নেশনস-এর সদস্য হ'তে গেলে ও-ছুটির একটির মাধ্যমেই হ'তে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই।

তৃতীয় বিষয়টিই হল সবচেয়ে প্রধান—হায়দারাবাদ ভারতীয় য়ুনিয়নে যোগ দেবে কি না। লর্ড মাউণ্টব্যাটন এবং ভি-পি-মেনন ছু' জনেরই সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে ভারতীয় য়ুনিয়নে যোগ দেওয়াটাই উভয় দেশের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। কিন্তু এই পথটি বেছে নিতে হায়দারাবাদের আপত্তি রয়েছে ; তাতে নিজামের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হবে। আলোচনাকারীরা একথাটাই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে এবিষয়ে বেশী পীড়াপীড়ি করলে নিজাম হয়ত পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফেলবেন।

মাউনটব্যাটন বললেন : আইনের দিক থেকে সে-অধিকার তাঁর রয়েছে। কিন্তু বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে ওপথ বেছে নেওয়াটা তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক হবে।

কী বিপদ ?

শুকিয়ে মরার বিপদ। প্রয়োজন মনে করলে ভারতীয় য়ুনিয়ন হায়দারাবাদকে অবরুদ্ধ করে রাখতে পারে।

কথাটা যে কতখানি সত্যি তা ছাতারীর নবাবও বুঝতেন, তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যদেরও সে বিষয়ে কোন রকম সন্দেহ ছিল না।

শেষ কথা বলে দিলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটন : সময় আর নেই। এখনই যদি আপনারা অন্তর্ভুক্তির চুক্তি সই না করেন তাহলে অদূর ভবিষ্যতে হায়দারাবাদ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

হ্যাঁ, কিম্বা, না—কোন রকম কথা না দিয়েই হায়দারাবাদ ডেলি-গেশনের সদস্যরা ফিরে গেলেন। যাওয়ার আগে তাঁরা স্থিতি-অবস্থার চুক্তি [Standstill Agreement] সই করতে রাজি হয়েছিলেন ; কিন্তু অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করতে চান নি।

এই 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' নীতিতে লর্ড মাউন্টব্যাটন এবং ভি-পি-মেনন কেউ খুসী ছিলেন না। তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, যে- রাজ্য অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করবে না তাঁর সঙ্গে স্থিতি-অবস্থা ঘোষণা করা ভারতীয় য়ুনিয়নের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে।

এইখানেই প্রথম ধাপের আলোচনা শেষ হয়ে গেল।

১৯৪৭ সালের ২৫শে জুলাই চেম্বার অফ প্রিনসেস-এর আলোচনা শেষ হওয়ার পরে একটি নিগোসিয়েটিং কমিটি [Negotiating Commitee] গঠন করা হল। সেই কমিটিতে ছাতারীর নবাবকেও সদস্য নির্বাচিত করা হ'ল। ছাতারীর নবাব কমিটিতে থাকতে রাজি হলেন না।

কেন ?

ওই কমিটি অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আলোচনা করবে। হায়দারাবাদ বর্তমানে অন্তর্ভুক্তি চায় না।

তাহ'লে কী করতে চান নিজাম বাহাদুর ?

ছাতারীর নবাব জানালেন : আর একটি কমিটি গঠন করুন। সেই কমিটিতে হায়দারাবাদ, ভারতীয় য়ুনিয়ন, আর পাকিস্তান থেকে সদস্য নিন ; আর নিন সেই সব রাজ্য থেকে সদস্য যারা বর্তমানে ভারতীয় য়ুনিয়নের সঙ্গে যোগ দিতে নারাজ।

প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে ভারতের তরফ থেকে তা বাতিল হয়ে গেল।

বাতিল হয়ে গেল বটে, কিন্তু ভারতের সমস্যা তাতে মিটলো না। লর্ড মাউন্টব্যাটন বেশ বুঝতে পারলেন ১৫ই আগষ্টের মধ্যে হায়দারাবাদকে অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করানো যাবে না। কিন্তু তাই বলে নিজামের সঙ্গে আলোচনার দ্বার রুদ্ধ করা উচিৎ হবে না।

কারণ ?

লর্ড মাউন্টব্যাটনের বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত হায়দারাবাদকে ভারতের সঙ্গে যোগ দিতেই হবে।

তাহলে অন্যান্য রাজাদের মত অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করতে নিজামের আপত্তিটা কোথায় ?

মাউণ্টব্যাটনের ধারণা আপত্তি আসছে তাঁর জঙ্গী যুদ্ধবাজ অনুচরদের কাছ থেকে। তারাই নিজামের সরকারকে অধিকার করে রয়েছে, সামরিক বিভাগ নিয়ন্ত্রিত করছে। নিজাম যদি নিজের দায়িত্বে অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করেন তাহলে তারা সবাই বিদ্রোহ করে বসবে—নিজামের জীবন তাতে বিপন্ন হবে।

সুতরাং এ-আলোচনার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হোক—১৫ই আগস্টের পর অন্তত আরও দুটি মাস।

ভারত সরকার ভাবতে লাগলেন।

ভি-পি-মেনন বললেন ঃ এই দুটি মাসে হায়দারাবাদের পরিস্থিতি জটিলতার মুখে এগিয়ে যাবে। এই সময়টা নিজাম চুপ করে বসে থাকবেন না।

ইতিমধ্যে হায়দারাবাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। ইত্তেহাদের কর্ণধার হয়েছেন কাশিম রেজভি। বাহাদুর ইয়ার যঙ-এর মৃত্যুর পরে ইত্তেহাদ-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ইনি। একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর। এক নিজাম উসমান আলি খাঁকে নিয়েই সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে ; তার ওপরে আবার কাশিম রেজভি।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন রেজভি। লাটুরে আইন ব্যবসাতে নেমেছিলেন। মক্কেলের সংখ্যা ছিল তাঁর অত্যন্ত নগণ্য। স্থানীয় ইত্তেহাদ দলের প্রধান নেতা ছিলেন তিনি। এছাড়া আরও একটি কাজ ছিল তাঁর। সেটি হচ্ছে স্থানীয় গুণ্ডামহলকে আইন সংক্রান্ত উপদেশ দেওয়া।

হঠাৎ তাঁর কপাল ফিরে গেল। একদিন ওই গুণ্ডার দল এক লরী বোঝাই খাবার নিয়ে চম্পট দিচ্ছিল। পুলিশ তাদের কয়েকজনকে পথে গ্রেপ্তার করলে গুণ্ডারা লোকজন জড় করে পুলিশদের

হাত থেকে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। সেই গুলির আঘাতে গুণ্ডাদের সর্দারটি মারা যায়।

পুলিশের গুলিচালনা উচিৎ হয়েছে কিনা তারই তদন্ত করার জন্যে একটি কমিশন বসল। তিন জন সদস্যের মধ্যে একজন হিন্দু, আর একজন মুসলমান সদস্য এই গুলি চালনাটিকে সমর্থন করলেন। তৃতীয় সদস্য হাইকোর্টের একজন বিচারপতি [জাতে মুসলমান] এই কাজটিকে অযৌক্তিক বলে রায় দিলেন।

ক্ষমতা পেয়ে রেজভি এই ভদ্রলোককে হায়দারাবাদের আইন এবং পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী করেছিলেন।

কাশিম রেজভির চোখ দুটো সব সময়ে উত্তেজনায় ভাঁটার মত জ্বলতো। একচক্ষু হরিণের মত অন্য কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না তাঁর। তিনি জানতেন হিন্দুরা কাফেরের জাত, ভারতবর্ষ [পাকিস্তান বাদ দিয়ে] হচ্ছে কাফেরদের দেশ। তিনি বিশ্বাস করতেন সেই কাফেররা মুসলমানদের নির্মূল করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। সুতরাং ওই হিন্দু কাফেররাই মুসলমানদের শত্রু। শেষ দিন পর্যন্ত এই বিশ্বাসে অটুট ছিলেন তিনি।

নিজের সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা কম উঁচু ছিল না, তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতীয় রাষ্ট্রের হাত থেকে দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদের উদ্ধার করার জন্যেই আল্লাহ্ তাঁকে ধরাধামে পাঠিয়েছেন। সে-দায়িত্ব তাঁকে পালন করতেই হবে।

এটি হল তাঁর প্রথম কাজ।

দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে মাদ্রাজের পূর্ব উপকুলের কাছাকাছি সমস্ত জায়গা হায়দারাবাদের অংশীভূত করা।

তাঁর তৃতীয় কাজ হচ্ছে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পরে তাঁর ধর্ম-যোদ্ধাদের নিয়ে দিল্লি বিজয় করা। তারপর তারা দিল্লীর লালকেল্লার ওপরে "আসফিয়া" পতাকা উত্তোলন করবে। এইখানেই শেষ নয়।

যতদিন না বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গগুলি হিজ এক্‌সজালটেড হাইনেশ নিজাম উসমান আলি খাঁর পা দু'টি ধুইয়ে দেবে ততদিন পর্যন্ত তাঁর ধর্মযোদ্ধারা নিরস্ত হবে না।

অর্থাৎ ছিন্ন-ভিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত একসূত্রে বেঁধে দেব আমি।

নিজাম উসমান আলি খাঁর মত উৎকট আশাবাদীও এতটা আশা করেন নি।

কিন্তু হিন্দুদের ওপরে রেজভি সাহেবের এতখানি উষ্মার কারণ কী?

তার একমাত্র কারণ হিন্দুরা কাফের, চিরকালই তারা মুসলমানদের দাসত্ব করে এসেছে; সে পাথরের পূজো করে, হনুমানের পূজো করে, গরুর বিষ্ঠা জিবে স্পর্শ করে! সেই হিন্দুদের শৃঙ্খলিত করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। এতে বিপদ রয়েছে সত্যি কথা, কিন্তু প্রকৃত মুসলমান হ'তে গেলে তাকে বিপদের মুখে পড়তেই হবে। যে বিপদ এড়িয়ে যায় সে সত্যিকার মুসলমান নয়। প্রকৃত মুসমানের কাজই হচ্ছে পার্থিব সমস্ত শক্তিকেই নস্যাৎ করে দেওয়া, এবং সমস্ত পৃথিবীকে তার শত্রু ক'রে তোলা।

"A Muslim is one who would set at naught all the earthly powers and make the whole world his enemies".—কাশিম রেজভির সোচ্চার ঘোষণা।

সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এগুলি কেবল কথার কথা নয়, রেজভির মনের কথা। এগুলিকে তিনি বিশ্বাস করতেন; এবং সেইভাবে কাজ করতেন। ফলে এক বছরের মধ্যেই কাশিম রেজভি হায়দারাবাদে একটি দুর্দমনীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। লাখ লাখ মুসলমান হিন্দু-বিদ্বেষকে মূলধন করে তাঁর পতাকার নিচে জমায়েত হয়ে হায়দারাবাদকে স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিল। হাজারে হাজারে তাঁর চেলারা জ্বলন্ত মশাল, তরোয়াল, বন্দুক নিয়ে হায়দারাবাদের লাখ লাখ ভীত সন্ত্রস্ত হিন্দু-

অধিবাসীদের মনে আতংকের সঞ্চার করেছিল, তাদের ওপরে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

যারা দূর থেকে কাশিম রেজভিকে মদৎ দিত তারা ভাবত একবার দাক্ষিণাত্যকে মুসলিম প্রধান দেশ বলে জিগির তুলতে পারলেই উত্তর ভারতের মুসলমানরাও ঝাঁকে ঝাঁকে দৌড়ে আসবে তাদের সাহায্য করার জন্যে। আর হায়দারাবাদের হিন্দুরা কী করবে? তারা দেখতে পাবে তাদের সাহায্য করার জন্যে ভারত থেকে কোন হিন্দু কেউ এগিয়ে আসছে না, কাশ্মীরে সৈন্য পাঠানোর জন্যে ভারত সরকারের সামরিক বাহিনীও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তখন কোন দিকে আশার আলো দেখতে না পেয়ে তারা অকথ্য অত্যাচারের মুখে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করবে; আইন সভার অর্দ্ধেক আসন মুসলমানদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে; এবং স্বীকার করে নেবে নিজাম শাহীর স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে।

কিন্তু স্বয়ং উসমান আলি খাঁ-ও কি সেই কথাই ভেবেছিলেন? তিনি কি সত্যিই ভারতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চাইছিলেন? তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রয়োজন বোধে ভারতবর্ষ জোর করে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার ক্ষমতা রাখে?

তিনি কী ভেবেছিলেন জানি নে; কিন্তু কাশিম রেজিভকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন; এবং অলিখিত ক্ষমতা দিয়েছিলেন প্রচুর। সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে হবে, আধুনিক অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে, হায়দারাবাদের ওপরে ভারতীয় রাষ্ট্র যে অন্যায় করছে দেশে-বিদেশে সেটা জোর কদমে প্রচার করতে হবে। এইগুলিই ছিল নিজাম বাহাদুরের নীতি।

সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে যে একটা সংঘর্ষ বাঁধবে সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন; এবং সেই জন্যেই তিনি ধীরে ধীরে সকলের অগোচরে তৈরি হচ্ছিলেন। একদিকে আলাপ-আলোচনা আর একদিকে সামরিক বিভাগটিকে ঢেলে সাজানো।

কিন্তু বিপদ হচ্ছে হিন্দুদের নিয়ে। যুদ্ধ যদি হয়ই, তাহলে হায়দারাবাদের হিন্দুরা চুপ করে বসে থাকবে না। তারা গুপ্তচরের কাজ করবে। এই রক্তবীজের বংশকে তিনি শেষ করবেন কেমন করে ?

কাশিম রেজভি কিন্তু সে ভয়ে কম্পিত নন। সে রকম দুর্ঘটনা যদি ঘটে তাহলে ওই হিন্দুদেরই যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রহণ করা হবে। তিনি বিপুল করতালির সঙ্গে প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করলেন ঃ হায়দারাবাদে প্রবেশ করার মত ভারতীয় য়ুনিয়নের যদি দুঃসাহস হয় তাহলে সেই আক্রমণকারীরা দেখতে পাবে এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষের মত অর্দ্ধ-দগ্ধ হিন্দুদের মৃত দেহ চারপাশে ছড়ানো রয়েছে। যেখানে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন সেখানে আমরা কাউকে রেহাই দিই না। আমরা মুসলমান।

If the Indian Union ventures to enter Hyderabad, threatened Razvi, the invaders will see the burning everywhere of the bodies of one crore and sixty-five lakhs of Hindoos. We Muslims do no spare others when we ourselves are not allowed to exist.*

কাশিম রেজভির গর্জন আর রাজাকারদের "আলা হজরত" ধ্বনিতে নিজাম উসমান আলি খাঁ কিছুটা যে ভরসা পেলেন না তা নয়; তবে কেবল ওদের ওপরেই নির্ভর করে তিনি চুপচাপ বসে রইলেন না। ভারতের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা সুরু হওয়ার আগেই তিনি মুসলীম লীগের ধর্ম এবং কর্মগুরু মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র সঙ্গেও যথারীতি আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিলেন।

ছাতারী ডেলিগেশন ভারত সরকারের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্যে যখন দিল্লিতে গিয়েছিল সেই সময় সদস্যেরা দিল্লিতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। হায়দারাবাদ যে ভারতীয় য়ুনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হ'তে চায় না একথা শুনে তিনি খুসীই হয়েছিলেন।

---

* Munshi—The End of an Era—P. 37

তাঁর খুসী-খুসী ভাব দেখে আশান্বিত হয়ে ছাতারীর নবাব জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিন্তু ভারতবর্ষ যদি চাপ দেয় ?

অর্থাৎ ?

হায়দারাবাদকে চারপাশ থেকে অবরোধ করে যদি শুকিয়ে মারে ?

জিন্নাহ্ সাহেবের সোজা উত্তর সহজভাবে বেরিয়ে এল ঃ তাহলে মরবে।

অর্থাৎ, ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেয়ে শুকিয়ে মরা তাঁর কাছে অনেক ভাল।

লাখ কথার একটা কথা বলে ছিলেন জিন্নাহ্ সাহেব।

এবারে ছাতারীর নবাবের পালা। অতি সহজ ভাষায় তিনিও একটি সহজ প্রশ্ন করলেন ঃ ভারতবর্ষ হায়দারাবাদকে যদি চরমপত্র দেয় তাহলে তাকে সাহায্য করতে কি পাকিস্তান এগিয়ে আসবে ?

উত্তর দিতে এতটুকু দেরী হয় নি জিন্নাহ্ সাহেবের ঃ উঁহু ! রসদ দিয়ে হায়দারাবাদকে সাহায্য করার মত সামর্থ্য পাকিস্তানের নেই।

অর্থাৎ এক শুকনো উপদেশ ছাড়া অন্য কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই পাকিস্তানের।

ভারতের সঙ্গে বৈঠকেও ডেলিগেশন বিশেষ সুবিধে করতে পারল না।

দু'জায়গার কোথাও কিছু করতে না পেরে, ছাতারী ডেলিগেশন ৫ই আগস্ট হায়দারাবাদে ফিরে গেল। এসেই সদস্যেরা দেখলেন একটি বিশাল ক্রুদ্ধ বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। তাঁদের দেখামাত্র সেই বিশাল জনতা গর্জ্জন করে উঠলো ঃ বিশ্বাস-ঘাতক, দেশদ্রোহী মুর্দাবাদ।

কেবল জনতাই যে তাঁদের বিশ্বাসঘাতক বলে অভিযুক্ত করল তা-ই নয়, স্বয়ং নিজাম বাহাদুরও তাঁদের ওপর ভীষণ চটে গিয়েছিলেন।

কেন ?

তাঁরা কিছু করতে পারেন নি বলে ?

নিজাম কি ভেবেছিলেন তাঁর সেই উন্মত্ত পরিকল্পনার জারক রসে ভারত সরকার গলে জল হয়ে যাবে ?

না, তা-ও না।

তবে ?

এর পেছনে অন্য কারণ ছিল।

সেই কারণটি হচ্ছে স্বয়ং কাশিম রেজভি।

ছাতারী ডেলিগেশনকে অপদস্থ করার পেছনে পরিকল্পনা ছিল কাশিম রেজভির। তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন যে জিন্নাহ্ সাহেব ছাতারীর নবাবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন। ভারতবিরোধী মুসলমান নবাব আর নবাবজাদাদের তখন একমাত্র আশা-ভরসার স্থল ওই মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। হায়দারাবাদের নিজাম, বিশেষ করে ইত্তেহাদী চাঁইরাও তাঁর ওপরে অনেক কিছু আশা করেছিলেন। সেই আশাতে ছাই পড়ার সংবাদে পাছে ইত্তেহাদের সদস্যেরা মুষড়ে পড়ে, আর তারই ফলে সংগঠনের দেওয়ালে ফাটল ধরে এই ভয়ে সমস্ত দোষটা ছাতারী ডেলিগেশনের ওপরে চাপিয়ে দিলেন রেজভি। তিনি প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করলেন যে ডেলিগেশনের সদস্যেরা সব বিশ্বাসঘাতক। ভারতকে কেউ তারা চটাতে চায় না। ছাতারীর নবাবের জমিদারী রয়েছে ইউ-পিতে, আলি জব্বর যঙ হচ্ছে নেহেরু আর প্যাটেলের দাসানুদাস ; আর লর্ড মাউণ্টব্যাটন হচ্ছেন স্যার ওয়ালটার মনকটনের বিবেকরক্ষক।

রেজভির মতে ডেলিগেশনের দুটি সদস্য হচ্ছেন সাঁচ্চা- পিংলে ভেনকাটারাম আর মিঃ রহিম। এঁরা না থাকলে সবই বরবাদ হয়ে যেত। হায়দারাবাদকে ভারত সরকারের কাছে মর্টগেজ দিয়ে ফিরে আসতেন ওঁরা।

উপসংহার করলেন কাশিম রেজভি : এই সব বিশ্বাসঘাতকদের

ওপরে স্টেটের এত বড় দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার আগে নিজাম বাহাদুরের আরও কিছু ভেবে দেখা উচিৎ ছিল।

নিজাম বাহাদুরও টোপ গিললেন রেজভির; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন ঃ ভারতীয় নবাবজাদারাই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

ইত্তেহাদ নিজামকে পরামর্শ দিল ঃ আর ভারতবর্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা নয়। এবারে আমরা যুদ্ধ করব—দিকে দিকে ছড়িয়ে দেব যুদ্ধের প্রস্তুতি।

যুদ্ধ তো করবে বুঝলাম; কিন্তু কামান বন্দুক···?

ছাতারীর নবাব আবার ছুটলেন জিন্নাহ সাহেবের কাছে।

প্রয়োজন হলে কিছু অস্ত্রশস্ত্র দিতে হবে যে।

সাফ কথা জানিয়ে দিলেন জিন্নাহ সাহেব ঃ একটি কামানও নয়।

ঘাড় নিচু করে ফিরে এলেন ছাতারীর নবাব।

তাহলে উপায়? ভেবে পড়লেন নিজাম আর তাঁর ইত্তেহাদী উপদেষ্টার দল। অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ হবে কেমন করে? পটকা ফাটিয়ে তো আর লড়া যাবে না।

মন্ত্রীদের বৈঠক বসল; গোপন শলা-পরামর্শ চলল। তারপরে ডাক পড়ল প্রধান সেনাপতি এল এদ্রুসের [EL Edroos]। ঠিক হল, অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্যে তাঁকেই বিদেশে পাঠানো হবে।

আর ঠিক হল, ইংলণ্ড আর অ্যামেরিকার সঙ্গে প্রতিরক্ষার চুক্তি করতে হবে। ভার দেওয়া হল নবাব আলি জব্বর যঙকে। তিনি লায়েক আলিকে সঙ্গে নিয়ে ইংলণ্ড আর অ্যামেরিকাতে যাবেন।

কিন্তু লায়েক আলি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি জানতেন ও দুটির কোন দেশই এই রকম চুক্তিতে রাজি হবে না। অনর্থক নিজের নাম খারাপ করে লাভ কী? তিনি এই সফরে যেতে চাইলেন না। মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন।

কিন্তু কাশিম রেজভির দল চুপচাপ বসে থাকে নি। দিকে-

দিকে তারা 'স্বাধীন হায়দারাবাদ' ধ্বনি তুলেছে, সভা করেছে, মিছিল করেছে, আল্লা হজরত ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করেছে। ১৯৪৭ সালের ১১ই জুন নিজাম যে ফারমান জারি করেছিলেন তারই ভিত্তিতে এই ধ্বনি। ১৫ই জুন প্রকাশ্য জনসভাতে কাশিম রেজভি ঘোষণা করলেন—রাজাকার বাহিনী আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নয়, সত্যিকার সরকারী বাহিনী। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন: ১৫ই আগস্ট আমরা স্বাধীন হয়ে যাব। হায়াদারাবাদের প্রতিটি মানুষ যেন ওই দিনটির জন্যে প্রস্তুত থাকে। প্রয়োজন বোধে তাদের সব কিছুই বিসর্জন দিতে হবে।

২৭শে জুলাই ইত্তেহাদ হায়দারাবাদ শহরে স্বাধীনতার উৎসব পালন করল।

স্টেট কংগ্রেস এতদিন প্রায় চুপচাপ বসেছিল। ৭ই আগস্ট তারা পালটা আন্দোলন সুরু করল—হায়দারাবাদ, ভারতীয় যুনিয়নে যোগ দাও।

সংঘর্ষ বাঁধলো যথারীতি। একদিকে নিজামের পুলিশ-রাজাকার বাহিনী; আর একদিকে অগনিত নিরস্ত্র জনতা। লাঠি চলল, চলল গুলি। প্রায় দু'শ লোককে গ্রেপতার করল পুলিশ; সেই সঙ্গে স্টেট কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থকেও।

তবু থামলো না স্টেট কংগ্রেসের আন্দোলন। নির্দেশ গেল ১৫ই আগস্ট ঘরে-ঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কর।

সরকারের পক্ষও এর মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল।

এগিয়ে এল ১৪ই আগস্ট।

হায়দারাবাদের বিদায়ী ব্রিটিশ রেসিডেন্টের জন্যে শেষ ভোজসভা বসেছে।

আবেগময়কণ্ঠে ভাষণ দিলেন নিজাম উসমান আলি খাঁঃ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ নেশনস-এ থাকার ইচ্ছে আমার এবং হায়দারাবাদের

এখনও রয়েছে ! আমি বিশ্বাস করি, এতগুলি বছর ধরে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তা সহজে নষ্ট হবে না।

বিদায়ী ব্রিটিশ রেসিডেন্ট গভীর দুঃখের সঙ্গে বললেন : 1 join with your Exalted Highness in the hope that a new relationship between them [Hyderabad and Great Britain] may soon be created and prove as enduring as that which is passing away

অর্থাৎ, সম্রাট, আপনার বাসনা পূর্ণ হোক। আমিও মনে করি ব্রিটিশ সরকার আর হায়দারাবাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বাঁধন অটুট থাকবে।

এই সঙ্গে শোনা যায় তিনি একটি ভবিষ্যৎবাণীও করেছিলেন— অদূর ভবিষ্যতে দিল্লীর পতন হবে, আবার আমি এইখানে ফিরে আসব।

কিন্তু মুখের কথাতেই তিনি শান্ত হলেন না ; দরদী বন্ধুর মত অনেক কিছু করেও গেলেন। রেসিডেন্টের মধ্যে যেগুলি গোপন কাগজপত্র ছিল সেগুলিকে পুড়িয়ে দিলেন। সেকেন্দারবাদ আর আওরঙ্গাবাদে ভারত সরকারের যে-দুটি মিলিটারি ব্যারাক ছিল সেই দুটি দিয়ে দিলেন নিজামকে। হায়দারাবাদে ভারত সরকারের যে সমস্ত সামরিক উপকরণ পড়েছিল সেগুলি বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্য নিয়ে নিজামের অস্ত্রাগারে দিলেন তুলে ; সেই সঙ্গে দিলেন হাকিমপেথ বিমানবন্দরটিও।

এর পরেও নিজাম যদি স্বাধীনতার স্বপ্ন না দেখেন তো দেখবেন আর কবে ? তিনি বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করলেন : When the British go from India, I shall become an independent sovereign.

আ-মেন !

---

* Hyderadad's Relations with the Dominion of India (Published by the Nizam Govt.) P-8

পনেরই আগস্ট এল—চলে গেল।

হায়দারাবাদ অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করল না।

স্যার ওয়ালটার মনকটন লর্ড মাউন্টব্যাটনকে বোঝালেন যে আরও দুটি মাস সময় পেলে নিজামকে বোঝানোর তিনি একটা শেষ চেষ্টা করতে পারেন। তাঁর বিশ্বাস, ওই সময়ের মধ্যেই নিজামের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। পারস্পরিক হৃদয়-বিনিময়ের অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে।

লর্ড মাউন্টব্যাটনেরও অভিমত তাই।

অর্থাৎ, পনেরই আগস্টের পরে আরও দুটি মাস আলোচনা চলবে।

ভারতসরকারও শেষ পর্যন্ত তাতেই রাজি। আবহাওয়া কিছুটা শান্ত হোক।

হায়দারাবাদ কিন্তু শান্ত হল না। স্টেট কংগ্রেসের নির্দেশে ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা ১৫ই আগস্ট রাজপথ পরিক্রমা করল। পুলিশ ছিনিয়ে নিল কিছু জাতীয় পতাকা, পুড়িয়ে দিল কিছু। মিছিল সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্যে চলল লাঠি, চলল গুলি। বহু লোক হতাহত হল, ফাটকে ঢুকলো অনেকে। স্কুলের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে না গিয়ে রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়ালো, শত-শত সরকারী কর্মচারী পদত্যাগপত্র পেশ করল; কংগ্রেস, কমিউনিসট আর দেহাতি লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় যে সমস্ত শুল্ক আদায়ের সরকারী ঘর ছিল সেগুলিকে পুড়িয়ে দিল।

রেজভিও চুপ করে বসে থাকার মানুষ নয়। তিনি ঘোষণা করলেন: স্টেট কংগ্রেসের গুণ্ডাবাজিতে ভয় পেয়ে নিজাম যদি ভারত সরকারের রচিত অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করেন তাহলে,

তিনি তা নিজের দায়িত্বেই করবেন। হায়দারাবাদের মুসলমানেরা কোন দিনই তা মেনে নেবে না।

দুটি মাস পেয়ে নিজাম একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। সাপের ছোবলটা কোন রকমে তাঁর গা ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছে। সাময়িক ভাবে হলেও বিপদ কেটেছে. এখনই তাঁর আসল কাজ। রাজ্যটিকে সুদৃঢ় করতে হবে; বিদেশের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ, যা করার তার সবটুকুই করে ফেলতে হবে।

তারই জন্যে তোড়জোড় পড়ে গেল নিজামের দরবারে।

২৭শে আগস্ট (১৯৪৭) নিজাম একটি বিবৃতি দিলেন:

In my Firman of june 11, 1947, and in my speech of August 14, 1947, I made public my attitude towards the problems arising out of Indian Indepen dence. So far as my State is concerned, I explained that when the British went, I should become an independent sovereign. Accordingly, I assumed that status on August 15, 1947.*

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

একটি কাগজে ঘোষনাতেই নিজাম বাহাদুর স্বাধীন হয়ে গেলেন।

স্যার ওয়ালটার মনকটন কিন্তু এই ঘোষণায় এতটুকু খুসী হতে পারেন নি। তিনি নিজামকে বোঝালেন—এই ঘোষণার জন্যে ভারত সরকার তাঁকে দুমাস সময় দেয় নি। দিয়েছে আলোচনার জন্যে। স্বাধীনতার ঘোষণা করে তিনি সেই আলোচনার দ্বার রুদ্ধ করছেন।

মনকটন সাহেবের এই কথা শুনে রাজাকাররা গেল ক্ষেপে।

---

*V.V. Rao + V. R. Rao : India's Police Action. P-2

কাশিম রেজভি প্রকাশ্যেই তাঁকে ভারত সরকারের দালাল বলে চিহ্নিত করলেন। তিনি জোর গলায় বললেন : এই সব দালালদের আপনারা চিনে রাখুন।

কোন প্রতিবাদ করলেন না নিজাম।

প্রতিবাদ এল মনকটন সাহেবের কাছ থেকে। তিনি পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন।

পদত্যাগ করলেন ছাতারীর নবাব, আর নবাব আলি জব্বর যঙ্।

টনক নড়লো নিজামের। তিনি মনে-মনে ঠিকই জানতেন স্বাধীনতা ঘোষণা করা আর স্বাধীন হওয়ার মধ্যে আশমান-জমীন ফারাক। তাই আলোচনার দরজা তিনি বন্ধ করতে চান না। অথচ স্যার মনকটন ছাড়া লর্ড মাউন্টব্যাটনকে দলে ভিড়ানো যাবে না, এবং ছাতারীর নবাব ইতিমধ্যে আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে বসার জন্যে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দিন ঠিক করে ফেলেছেন।

ওঁরাও একমত ; আগে রেজভিকে শায়েস্তা করুন, তারপর আমরা যাব।

শেষ পর্যন্ত একটি ফরমান জারি করলেন নিজাম। মাননীয় সদস্যদের ওপরে রাজাকাররা যে আক্রমণ করেছে তার নিন্দা করলেন।

সদস্যরা পদত্যাগ পত্র ফিরিয়ে নিলেন।

দ্বিতীয় ডেলিগেশন এল দিল্লীতে।

সর্দার প্যাটেলের কড়া নির্দেশ অন্তর্ভুক্তির দলিলের একটি ধারাও রদবদল করা হবে না।

অথচ নিজাম বাহাদুর কোন মতেই ওই দলিল সই করবেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, কোন অন্তর্ভুক্তির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার জন্যে হায়দারাবাদ ডেলিগেশন দিল্লীতে আসে নি। দুটি পাশাপাশি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে উভয়ের পারস্পরিক

সুবিধার্থে যে রকম চুক্তি হয় সেইরকম একটি চুক্তিই তিনি ভারত সরকারের সঙ্গে করতে চান। তার বেশী নয়।

তাহলে আপনাদের প্রস্তাবগুলি এবারে বলুন।

প্রস্তাবগুলি হল : হায়দারাবাদকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। হায়দারাবাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে। সেই বাহিনীকে পরিচালিত করবেন নিজাম, সুসজ্জিত করবেন নিজাম, বাহিনীর মাইনে দেবেন নিজাম। সেই সামরিক বাহিনীর ওপরে ভারত সরকারের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

তবে হ্যাঁ, বাইরে থেকে যদি কোন শত্রু ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে তখন তিনি কিছু সৈন্য ভারতকে ধার দেবেন। কত সৈন্য দিতে পারবেন সে বিষয়ে উপযুক্ত সময়ে বিবেচনা করা যাবে।

কিন্তু কোন সময়ে ভারত-পাকিস্তানে লড়াই বাঁধলে, হায়দারাবাদ সেই সুযোগ ভারতকে দেবে না।

হায়দারাবাদের ডাক-তার বিভাগ আর যান বাহনের ওপরে ভারতসরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

বেশ কথা! তারপর?

এর পরেও যদি অন্তর্ভুক্তির চাপ জোর করে সৃষ্টি করা হয় তাহলে তার ফল ভাল হবে না।

কী রকম?

হায়দারাবাদে রক্তগঙ্গা বইবে ; সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আবার সুরু হবে। সেই হাঙ্গামা ভারতের বিভিন্ন স্টেটে ছড়িয়ে পড়বে।

দস্তুরমত হুমকির ব্যাপার! তা হবে না-ই বা কেন? তখন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের মন কষাকষি চরমে উঠেছে। ভারতের পেশী কতটা শক্ত তা একবার বাজিয়ে দেখতে হবে তো!

এই চরমপত্রের ওপরেও কিছুটা আলোচনা হল। তারপরে দুটি পক্ষের একটি সম্মিলিত খসড়া নিয়ে ডেলিগেশন হায়দারাবাদে ফিরে

গেল। দেখলো নিজাম শক্ত হয়ে গিয়েছেন। স্বাধীনতার কিছু কম নিতে তিনি রাজি নন।

মনকটন সাহেব বোঝালেন যতদিন পর্যন্ত হায়দারাবাদ শক্তিশালী না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ওই 'স্বাধীনতা' কথাটা উচ্চারণ করা একটু বন্ধ করুন; ভারতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসুন। হায়দারাবাদের সুদিন এলে সেই চুক্তি ভাঙতে কতক্ষণ! এই রকম চুক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ কি কোন দিন ভাঙে নি?

কিন্তু সে সব কথা শোনার পাত্র নিজাম নন। তিনি অচল, অটল। [এর মধ্যে পাকিস্তানের কাছ থেকে কোন টিপস্ এসেছিল কি!] স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন কথা তাঁর মুখ থেকে বেরোবে না।

ক্ষোভে বিরক্তিতে মনকটন সাহেব ইংলণ্ডের পথে রওনা হলেন।

কিন্তু আবার তিনি ফিরে এলেন। নিজাম বাহাদুর মনকটন সাহেব ছাড়া নিজেকে বড় অসহায় মনে করতেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটনও জানতেন মনকটন সাহেব ছাড়া নিজামকে চারে টেনে আনা প্রায় অসম্ভব। এই দুজনের বিশেষ অনুরোধে আবার তিনি ফিরে এলেন।

১০ই অকটোবর হায়দারাবাদ থেকে আবার একটি ডেলিগেশন লর্ড মাউণ্টব্যাটনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে দিল্লীতে এসে হাজির হল। নিজামের প্রস্তাব সেই এক। প্রতিরক্ষা আর বৈদেশিক দপ্তর আমার চাই।

সর্দার প্যাটেল তো চটে লাল; বলে দিলেন: আপনাদের যদি আর কিছু বলার না থাকে তাহলে অনর্থক সময় নষ্ট করবেন না; আপনারা ফিরে যান।

সর্দারের মূর্তি দেখে ডেলিগেশন ফিরে গেল হায়দারাবাদে। নিজামও চান নি যে সর্দার প্যাটেল প্রত্যক্ষভাবে এই আলোচনায় যোগ দেন। যোগ দিলে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে এই ভয়ে নূতন নির্দেশ দিয়ে আবার ডেলিগেশন পাঠালেন দিল্লীতে।

রাশি-রাশি আলোচনার পরে 'স্থিতি-অবস্থা'র দলিলটির খসড়া তৈরি হল। চুক্তিটি হল এক বছরের জন্যে।

সেই চুক্তির খসড়াটি নিয়ে ডেলিগেশন সোজা 'কিং কোটি'-তে নিজাম বাহাদুরের কাছে হাজির হল। খসড়া আর লর্ড মাউন্টব্যাটনের লেখা আনুসঙ্গিক চিঠিগুলি তাঁকে পড়িয়ে শোনানো হল। এবারে তাঁর স্বাক্ষর করার পালা। কী যেন ভাবলেন নিজাম; তারপরে আরও ভালভাবে পরীক্ষা করার জন্যে একসিকিউটিভ কাউনসিলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

নিজাম বাহাদুরের সভাপতিত্বে কাউনসিলের আলোচনা বসল। এই আলোচনাতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন নিজাম বাহিনীর সেনাপতি এল-এদ্রুস [EL-Eldroos] এবং রাজা বাহাদুর।

এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কী তা আমি জানতে চাই। —নিজাম বাহাদুর সদস্যদের জিজ্ঞাসা করলেন।

পিংলে ভেনকটারামা রেড্ডী বললেন: আপনার অভিমতের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু তার আগে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই, অবশ্য নিজাম বাহাদুরের সম্মতি থাকলে।

বেশ, প্রশ্ন করুন।—রাজি হলেন নিজাম বাহাদুর।

আমরা কি এর আগে কোনদিন স্বাধীন ছিলাম অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা জার্মাণীর মত ?

না, না।—একসঙ্গে সবাই উত্তর দিল।

ধরুন, ভারতীয় য়ুনিয়নের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমাদের যদি যুদ্ধই করতে হয়, তাহলে কতদিন আমরা সেই যুদ্ধ চালাতে পারব ?

প্রধান সেনাপতি উত্তর দিলেন: চার দিনও নয়।

নিজাম সংশোধন করে বললেন: দু'দিন বলুন।

রাজা বাহাদুর বললেন: তাহলে স্থিতি-অবস্থার চুক্তিটি আমাদের আর দেরি না করেই সই করে পাঠিয়ে দেওয়া উচিৎ। অন্যান্য দেশীয়

রাজ্যগুলি যে সব সুবিধে পেয়েছে আমরা পেয়েছি তাদের চেয়ে অনেক বেশী।

নিজাম সায় দিলেন তাঁর কথায়। কথাটা ঠিক।

একমাত্র ময়ন নওয়াজ যঙ [Moin Nawaz Jung] এবং আর একটি ভদ্রলোক ছাড়া ৬-৩ ভোটে কাউনসিল ঠিক করল যে মন্‌কটন সাহেব যে খসড়াটি নিয়ে এসেছেন সেটি গ্রহণযোগ্য, এবং নিজাম বাহাদুরের এখনই সেটি সই করে পাঠানো উচিৎ।

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন নিজাম।

তবু কিছু ছোট-খাট রদবদলের পরে ২৫শে সেপটেমবর নিজাম বাহাদুর খসড়াটিকে অনুমোদন করলেন।

ঠিক হল ২৭শে সেপটেমবর স্বাক্ষরিত দলিলগুলি নিয়ে ডেলিগেশন দিল্লীতে যাবে। তার আগের দিন সন্ধ্যোবেলা সদস্যেরা নিজাম প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। কথা ছিল, তাঁদের সামনেই নিজাম দলিলগুলিতে স্বাক্ষর করবেন।

আবার দলিল গুলি আনা হল, আবার সেগুলি পড়া হল। না, সব ঠিক রয়েছে। এবারে সই করার পালা। তাহলেই আপাতত কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম।

হঠাৎ কী হল ভগবান জানেন। নিজাম বাহাদুর বললেন ঃ এত রাত্রিতে আর সই করব না। কাল খুব সকালে ডেলিগেশনের দিল্লী যাওয়ার আগেই ওটা সই করে দেব।

সদস্যেরা পরস্পরের মুখের দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলেন; এ যে দেখি মহম্মদ তুঘলকের জ্যেঠামশাইরে বাবা। ক্ষণে-ক্ষণে মতিহীন, মত পালটাচ্ছে তো পালটাচ্ছেই।

কিন্তু উপায় কী? নিজাম বাহাদুরের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কথা বলবে কে?

সদস্যেরা যে যার ডেরায় ফিরে গেলেন।

কিন্তু পরের দিন দিল্লী যাওয়া আর তাঁদের হ'ল না।

তার অনেক আগে থাকতেই, অর্থাৎ, রাত্রি তিনটে থেকেই তাঁদের বাড়ীর চারপাশে প্রবল হট্টগোল শোনা গেল। প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার রাজাকার স্যার ওয়ালটার মনকটন, ছাতারীর নবাব, আর স্যার সুলতান আহ্‌মেদ এর বাংলো ঘেরাও করে বসলো। তারা এসেছে ট্রাকে, বাসে এবং মোটর গাড়ীতে। সঙ্গে এনেছে বর্শা আর হরেক মাপের তরোয়াল। আর এনেছে অসংখ্য মাইক।

সেই মাইকে তারা ক্রমাগত ঘোষণা করে চলল : ডেলিগেশনের সদস্যদের কিছুতেই দিল্লী যেতে দেওয়া হবে না। জোর করে তাদের ঘরে বন্ধ করে রাখা হবে। স্বাধীন হায়দারাবাদ কি জিন্দাবাদ! ডেলিগেশন কো মুর্দাবাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু নিজাম? কোথায় নিজাম বাহাদুর? তিনি কি এসব বিষয় কিছুই জানেন না, না, না-জানার ভান করে বসে রয়েছেন?

দুটি ঘণ্টা ধরে রাজাকারদের কাছ থেকে খিস্তি-খেউড় খাওয়ার পরে ভোর পাঁচটার সময় তাঁরা সমরবিভাগে টেলিফোন করলেন তাঁদের উদ্ধার করার জন্যে। একজন ব্রিটিশ অফিসার তাঁদের শেষ পর্যন্ত নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে দিলেন।

সকাল আটটার সময় নিজাম বাহাদুর টেলিগ্রাম পাঠালেন লর্ড মাউণ্টব্যাটনকে! অনিবার্য কারণ বশত ডেলিগেশনের দিল্লী পৌঁছাতে দু'চার দিন দেরী হবে।

কারণটা কী বোঝা গেল সেইদিনই বিকাল বেলায়।

কিন্তু কারণটা কী?

কাশিম রেজভির মতে এই চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু নিজাম বাহাদুরের মতে সেই পরিস্থিতিতে ওর চেয়ে ভাল চুক্তি আর হতে পারে না। তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন আগামী কাল রেজভিকে দিয়ে এই চুক্তির খসড়াটি আমি অনুমোদন করাবোই?

অর্থাৎ?

হায়দারাবাদ সম্পর্কে শেষ কথা বলার অধিকার কার—নিজামের না, রেজভির ?

ব্যাপার কিছুটা গোলমেলে ঠেকছে না ?

পরের দিন আবার আলোচনা সভা বসলো। নিজাম বাহাদুর নিশ্চিন্ত যে ওর চেয়ে ভাল চুক্তি আর হতে পারে না।

তাহলে আর সময় নিচ্ছেন কেন ? সই করুন।

হ্যাঁ, করব। নিশ্চয় করব। এই কে আছ ? রেজভিকে ডাক।

ডাকতে হল না। রেজভি কাছাকাছিই কোথাও অপেক্ষা করছিলেন, তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে এলেন।

নিজাম বাহাদুর খসড়াটি থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই চুক্তি গ্রহণে আপনার আপত্তি কেন জানতে পারি ?

কাশিম রেজভি বললেনঃ ওই চুক্তি সই করার অর্থই হচ্ছে হায়দারাবাদের ধ্বংস হওয়া।

ধ্বংস হওয়া কেন।

প্রতিরক্ষা আর বৈদেশিক দপ্তর ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে ভারতের দাসত্ব স্বীকার করা। হায়দারাবাদ আর দাক্ষি-ণাত্যের মুসলমানরা তা কোন দিনই মেনে নেবে না, আলা হজরত।

কিন্তু ডেলিগেশন তো অন্য কথা বলে।

অন্য কথা বলা ছাড়া উপায় নেই ; কারণ ডেলিগেশনের সদস্যেরা দুর্বল, অকাজের। আমরা যে চুক্তিপত্রটি প্রথমে পাঠিয়েছিলাম সেইটির ওপরে জোর দেওয়া ওদের উচিৎ ছিল। হায়দারাবাদের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হবে সমানে-সমানে, পাশাপাশি দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে যে রকম চুক্তি হয় সেই রকম, দাসত্বের ভিত্তিতে নয়।

ভাবিত হলেন নিজাম।

তাহলে এখন কী করা উচিৎ ?—প্রশ্ন করলেন নিজাম।

কাশিম রেজভি বললেন ঃ আপনি এই চুক্তি সই করবেন না, আলা হজরত। আমাকে একবার সুযোগ দিন। ভারতীয় য়ুনিয়ন

এখন তার ঘর সামলাতেই নাজেহাল হয়ে পড়েছে। এমন সময় জোর দিলে আমাদের সমস্ত দাবীই তারা মেনে নেবে। ডেলিগেশন যা পারে নি, আমি তা-ই পারব।

সুলতান আহ্‌মেদ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ডেলিগেশন যেখানে অসফল হয়েছে, আপনি সেখানে সফল হবেন এই রকম মনে করার পেছনে আপনার যুক্তিটা কী ?

নিশ্চয় আছে। একটা নয়, অনেকগুলি।

অন্তত, একটা বলুন।

আমি আগেই বলেছি ভারতীয় য়ুনিয়ন উত্তরাংশে বিব্রত হয়ে উঠেছে। এখন আমরা যা বলব, ভারত তাতেই রাজি হবে ; যা চাইব তা-ই দিতে বাধ্য হবে।

পাগল কি আর গাছে ফলে !

ও ছাড়া অন্য কোন চুক্তির খসড়া নিয়ে যাও-না একবার ; সোজা ময়লা ফেলার বাক্সে গিয়ে পড়বে। বলে, হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা ভাবে কত জল।

যাক পাগলের সঙ্গে কথার কচকচি করে লাভ নেই। নিজাম বাহাদুর কী বলেন ?

নিজাম বাহাদুরের আর বলার কী রয়েছে ? সাত্যই তো আর তিনি ওই রকম একটি চুক্তি চান নি। নেহাৎ উপায় নেই বলেই তিনি সই করতে যাচ্ছেন। কিন্তু যদি কোন উপায় সত্যিই এখনও কোথাও থেকে থাকে কাশিম রেজভি কি সেই উপায় খুঁজে বার করতে পারবে ?

দোনামনা হলেন নিজাম বাহাদুর।

ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়াচ্ছে বুঝতে পেরেই চারজন সদস্য পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কাশিম রেজভি ; যাওয়ার সময় বলে

গেলেন: আলা হজরত, আমাকে শেষ বারের জন্যে একটা সুযোগ দিন।

নিজাম রেজভির দিকে লক্ষ্য করে বললেন: এই বস্তাপচা লোকগুলো সব পাগল হয়ে গিয়েছে।

সদস্যেরা ভাবতে-ভাবতে গেলেন—এই পাগলটার খপ্পরে পড়লে নিজামও যাবেন, হায়দারাবাদও যাবে। *

কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে, পাগল কে? রেজভি, না, নিজাম?

রেজভিকে সৃষ্টি করার পেছনে অবদান কার?

অবদান নিজামের।

রেজভিই হলো তাঁর দ্বিতীয় সত্তা।

তাঁর প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় লাইন।

কাশিম রেজভি জিতলেন।

কিন্তু ওইখানেই থামলেন না তিনি; আরও এগিয়ে গেলেন।

নিজাম উসমান আলি খাঁ হায়দারাবাদের "আলা হজরত" বটে; কিন্তু রাজাকার দলের নেতা কাশিম রেজভি তখন স্টেটের প্রায় সর্বেসর্বা। নিজামের মত ধুরন্ধরও তাঁকে চটাতে সাহস করলেন না।

পুরানো ডেলিগেশনকে অপদার্থ প্রমান ক'রে, রেজভি প্রধান মন্ত্রীকে নিয়ে কাজ সুরু করলেন। ছাতারীর নবাব পদত্যাগ করার পরে, স্যার মেহ্‌দি ইয়ার যঙকে সাময়িক ভাবে ওই পদটিতে বহাল করা হয়েছিল। এখন একজন স্থায়ী প্রধান মন্ত্রী চাই।

রেজভির মতে ওই পদটিতে বসার একমাত্র যোগ্যতা রয়েছে ইত্তেহাদী ইয়ারদোস্ত লায়েক আলির।

লায়েক আলির বিরুদ্ধে বলার কিছু না থাকলেও, নিজাম স্বভাবতই ইত্তেহাদীদের কবলে পড়তে রাজি ছিলেন না। কাশিম রেজভি যে তাঁর মাথার ওপরে ছড়ি ঘোরাবেন সেটা তিনি কোন রকমেই

* K. M. Munshi: The End of An Era. P-55-66

বরদাস্ত করতে পারছিলেন না, অথচ স্পষ্ট করে 'না' বলারও সাহস হচ্ছিল না তাঁর।

শোনা যায়, বিষয়টি নিয়ে প্রথমে তিনি মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। লায়েক আলিকে পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কাজে লাগানোর কথা তখন ভাবছিলেন জিন্নাহ্ সাহেব। তাই তিনি তখন তাঁকে ছাড়তে চান নি; কিন্তু নিজামকে তিনি অন্য অজুহাত দেখিয়েছিলেন। তাঁর মতে লায়েক আলিকে প্রধান মন্ত্রী করলে ভারতের সঙ্গে নিজামের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে।

খুসী হলেন নিজাম। আপাতত ছাড়ান পেলেন রেজভির হাত থেকে। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙলো না।

তিনি ঠিক করলেন পিংলে ভেনকাটারাম রেড্ডীকে প্রধান মন্ত্রী করবেন।

অত কাঁচা মানুষ কাশিম রেজভি নয়। তিনি ঘাড় নেড়ে বললেনঃ কভী নেহী।

চাপে পড়ে আবার জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলে, রাজি হলেন মিঃ জিন্নাহ্। হায়দারাবাদের প্রধান মন্ত্রী হলেন লায়েক আলি।

জয় জয়াকার কাশিম রেজভির।

নিজাম উসমান আলি খাঁ যাঁর কথায় ওঠেন বসেন, প্রধান মন্ত্রী লায়েক আলি খাঁ যাঁর ডান হাত, যাঁর হুমকিতে দেড় কোটি হিন্দু তটস্থ, যাঁর ইঙ্গিতে হাজার হাজার রাজাকার কুচকাওয়াজ করে, তাঁর জয় জয়াকার হবে না-ত হবে কার?

প্রকাশ্য জনসভায় এক হাতে কোরান আর এক হাতে তরোয়াল ধরে দাঁড়ালেন কাশিম রেজভি। হায়দারাবাদের "মুক্তি যোদ্ধা"-র খেতাব নিয়ে গর্জন করতে লাগলেন।

এইবার কাশিম রেজভি দিল্লী যাবেন।

দিল্লী কি আজকের? ওর মহিমা কি কম? একটি রোমাঞ্চকর

নাম এই দিল্লী। কত রাজা মহারাজা ওখানে রাজত্ব করেছেন, কত রাজা উঠেছেন, কত রাজা পড়েছেন ওরই চত্বরে। যে যোদ্ধা দিল্লী পর্যন্ত ধাওয়া করে নি সে যোদ্ধাই নয়, যে রাজনীতিবিদ দিল্লী যায় নি কোন দিনই সে রাজনীতিবিদ-ই নয়।

তাছাড়া, গোটা হায়দারাবাদই যে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। এতবড় গুরু দায়িত্ব যাঁর মাথার ওপরে তিনি কি চুপ করে বসে থাকতে পারেন ?

সুতরাং দিল্লী চল।

মনকটন-ছাতারী যা পারেন নি, তিনিই সে-কাজ করে আসবেন।

মন্ত্রী যোশীকে নিয়ে রেজভি দিল্লী যাত্রা করলেন।

তিনি নিজে শক্ত; সুতরাং ভারতের সবচেয়ে শক্ত মানুষ বলে পরিচিত সর্দার প্যাটেলের সঙ্গেই তিনি সরাসরি আলোচনা করবেন।

সর্দারের বসার ঘরে যথাসময়ে হাজির হলেন দু'জন। বিনীতভাবে একটু হেসে হাত তুলে নমস্কার করলেন যোশী; সেলাম ঠুকলেন রেজভি।

দু'জনেই বসে তাকালেন সর্দারের দিকে; যেন একটি পাষাণ স্তব্ধতা চুপ করে বসে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলেন সর্দার; কী চাই আপনাদের ?

রেজভির চোখের ওপরে তখন উন্মাদের ছায়াপাত হয়েছিল। তাঁর চোখ দুটি বনবন করে ঘুরছিল। সেই ঘূর্ণামান চোখ দুটির ভেতর থেকে আগুনের ফুলকী বেরিয়ে আসছিল। তাঁকে দেখেই মনে হচ্ছিল যেন কোন দৈত্য তাঁর ওপরে ভর করেছে। তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার সর্দারের দিকে তাকালেন। ভয়ে যোশীর বুক দুরু দুরু করে উঠলো; কিন্তু সর্দারের চোখ দুটিতে কোন পলক পড়লো না। একটি নিটোল ঔদাসীন্যে তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

স্তব্ধতা ভেঙে রেজভি বললেন: আপনার কাছ থেকে আমি চাই হৃদয়ের পরিবর্তন।

সর্দার চুপ করে রইলেন। বড় অস্বস্তিকর সেই নির্বাক মুহূর্তগুলি। অবশেষে তিনি বললেন : যার হৃদয়ে বিষের বীজাণু গিজ-গিজ করছে, হৃদয়ের পরিবর্তন তারই দরকার।

রেজভি জিজ্ঞাসা করলেন : হায়দারাবাদকে আপনি স্বাধীন থাকতে দিচ্ছেন না কেন?

সর্দার উত্তর দিলেন : যতদূর সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশীদূর আমি এগিয়েছি। অন্যান্য স্টেটদের আমি যা দিইনি, হায়দারাবাদকে তা-ও আমি দিয়েছি।

রেজভি বললেন : কিন্তু আমি চাই হায়দারাবাদের অসুবিধেগুলি আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন।

সর্দার বললেন : আমি তো কোন অসুবিধে দেখছিনে, যদি না আপনারা পাকিস্তানের অন্য একটা সমঝোতায় এসে থাকেন।

উত্তেজিত হয়ে কাশেম রেজভি চিৎকার করে উঠলেন : আপনি যদি আমাদের অসুবিধে না দেখেন, তাহলে আমরা কিছুতেই আত্ম-সমর্পন করব না। হায়দারাবাদের জন্যে আমরা যুদ্ধ করব, এবং প্রয়োজন হলে, শেষ মানুষটি পর্যন্ত জীবন বিসর্জন দেব।

সর্দার বেশ কড়া স্বরেই মন্তব্য করলেন : আপনারা আত্মহত্যা করতে চাইলে আমি ঠেকাবো কেমন করে?

রেজভি পুরানো কথাটাই আবার বললেন : হায়দারাবাদের মুসলমানদের আপনি চেনেন না। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে প্রয়োজন হলে আমরা সর্বস্ব বিসর্জন দেব।

সর্দার বললেন : সর্বস্ব বিসর্জন দেওয়ার কথা যদি বলেন, ভারতবর্ষ দেখিয়েছে কেমন করে তা দিতে হয়। হায়দারাবাদ এখনও তা দেখায়নি।

তারপরে কাশিম রেজভি যথারীতি চিৎকার করতে সুরু করলেন —কখনও পারস্যের উর্দুতে, কখনও বা চোস্ত ইংরেজী ভাষায়।

কাশিম রেজভির সমস্ত কথা সর্দার প্যাটেল চুপ করে শুনলেন;

একটানা দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন রেজভি। তারপরে দম নেওয়ার জন্যে একটু থামলেন। সেই সুযোগে সর্দার বললেন: সন্ধ্যা আসার আগে আপনারা সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আলোর রশ্মি থাকতে থাকতে আপনারা অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। এই আমার শেষ উপদেশ।

আলোচনা শেষ হয়ে গেল। যোশী আর রেজভি সর্দার প্যাটেলের বসার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ২৫শে তারিখে হায়দারাবাদে রাজাকারদের প্রকাশ্য জনসভায় কাশিম রেজভি দিল্লীতে তাঁর সাফল্যের কথা জানিয়ে দিয়ে বললেন: এতদিন পরে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা দিল্লীতে হায়দারাবাদের আসল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছে। সর্দার আমাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সে-আমন্ত্রণ আমি যদি প্রত্যাখ্যান করতাম তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণ্য এবং বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার চলছে তাকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হোত। জানি দিল্লীর আমন্ত্রণে অনেক বিপদ লুকিয়ে ছিল। তথাপি আমি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি, কারণ প্রকৃত মুসলমান কখনও বিপদকে ভয় করে না। এবং সেই বিপদ তুচ্ছ করে আমি সর্দারের সঙ্গে দেখা করেছি।

হাজার হাজার রাজাকার কাশিম রেজভির এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনে মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল, করতালিতে মুখরিত করে তুলল দিগবিদিক।

কাশিম রেজভি যতই তড়পাক, দিল্লীতে গিয়ে যে তিনি কিছুই করতে পারেন নি সে-সংবাদ নিজাম বাহাদুর পেয়েছিলেন। তাঁর অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি দিয়ে সর্দার প্যাটেলকে এতটুকু পারেন নি গলাতে। সে চেষ্টা তাঁর সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

অথচ দু' মাসের অতিরিক্ত সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজন মনে করলে ভারতীয় য়ুনিয়ন হায়দারাবাদকে আর কোন সময় দিতে

না পারে, বন্ধ করে দিতে পারে তার সঙ্গে সমস্ত আলাপ আর আলোচনার দরজা।

যদি সেরকম কিছু ঘটে তাহলে তিনি করবেন কী?

স্বাধীনতা ঘোষনা করবেন?

কিন্তু সেপথে বাধার সৃষ্টি করবে হায়দারাবাদের হিন্দুরা; তাদের মদৎ দেবে ভারতীয় য়ুনিয়ন। সেই বাধা দূর করতে গেলে যুদ্ধ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

অথচ যুদ্ধ করার মত শক্তি তখনই তাঁর ছিল না। লাঠি, পটকা, আর তরোয়াল সম্বল ক'রে কাশিম রেজভির চেলারা যুদ্ধং দেহী ভঙ্গীতে যতই চেঁচাক না কেন তাতে হায়দারাবাদের লাভ হবে না কিছু।

হায়দারাবাদকে যুদ্ধক্ষম করে তুলতে গেলে এখনও কিছুটা সময় দরকার।

সেই সময়টুকুর জন্যে প্রয়োজন হ'লে তাঁকে Standstill Agreement সই করতে হবে।

২৪শে নভেম্বর মাউনটব্যাটেন সাহেব ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। তারপরের দিন হায়দারাবাদ থেকে একটি ডেলিগেশন এল দিল্লীতে আলোচনা করার জন্যে। অনেক তর্ক-বিতর্ক, মন কষাকষির পরে সেই আগেকার চুক্তির খসড়াটি নিয়ে ডেলিগেশনের সদস্যরা হায়দারাবাদে ফিরে গেলেন।

২৯শে নভেম্বর [১৯৪৭] নিজাম সেই চুক্তিটি সই করলেন। সেই সঙ্গে নিজাম লর্ড মাউণ্টব্যাটনকে গোপনে একটি চিঠি পাঠালেন। তাতে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে তিনি যোগ দেবেন না। তবে তিনি এটাও জানিয়ে দিলেন যে যদি কোন কারণে ভারতীয় য়ুনিয়ন ব্রিটিশ কমনওয়েলথ পরিত্যাগ করে তাহলে সমস্ত বিষয়টি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করার অধিকার তাঁর থাকবে; এবং যদি কোন দিন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ বাঁধে তাহলে তিনি নিরপেক্ষ থাকবেন।

সে-পরের কথা পরে ভাবা যাবে। আপাতত তো কিছুটা স্বস্তি।

স্থিতি-অবস্থার মেয়াদ একটি বছর।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হল।

অনেকেই ভেবেছিল এই একটি বছর ভারতবর্ষ আর হায়দারাবাদের মধ্যে সহজ আবহাওয়া ফিরিয়ে আনবে, উত্তেজনা কমবে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন পণ্ডিত নেহেরু।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ভি-পি মেনন।

কেবল চুপ করে রইলেন সর্দার প্যাটেল। এসব বিষয়ে তিনি বড় একটা আশাবাদী ছিলেন না। তবু তিনি কিছু বিরূপ মন্তব্য করলেন না। সব কিছু মেনে নিলেন।

২৯শে নভেম্বর ১৯৪৭ সালে কনসটিটিউয়েনট অ্যাসেমলিতে এই চুক্তির খসড়াটি পেশ করে সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন, হায়দারাবাদের আভ্যন্তরীন নানান অসুবিধার কথা আমরা জানি। ভারত সরকার দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সহযোগিতাই কামনা করে এসেছে; জোর করে কিছু করা তার বহুঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে। সেই নীতি অনুসারে স্বল্প-মেয়াদী এই স্থিতি-অবস্থার চুক্তিটি গৃহীত হয়েছে। আমরা আশা করি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে হায়দারাবাদ এক বছর পরে ভারতের নবগঠিত শাসনতন্ত্রের সঙ্গে নিজের শাসনতন্ত্র মিশিয়ে দেবে।

সর্দার প্যাটেলের এই উক্তির মধ্যে কতটা প্রত্যয় ছিল জানি নে; কিন্তু অলক্ষ্যে বসে সেদিন বিধাতাপুরুষ নিশ্চয়ই একটু মুচকি হেসেছিলেন।

কেন হেসেছিলেন তা হায়দারাবাদের ঘটনাবলী আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

যে আভ্যন্তরীন গোলযোগ দূর করার জন্যে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত

হল—এই একটি বছরে সে গোলযোগ তো থামলোই না, বরং উত্ত-রোত্তর বেড়ে গেল।

নিজামশাহী আর ইত্তেহাদী চক্রান্ত কাশিম রেজভির নেতৃত্বে আসন্ন প্রতিরোধ সংগ্রামটিকে সুসংগঠিত করে তোলার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলো। এবং তাদের সেই প্রস্তুতিতে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সমর্থন জানালো বিদেশী কিছু শাসক আর তাদের মুখপাত্রগুলি।

১লা জুন, ১৯৪৮ সালে কোয়েটাতে হায়দারাবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন পাকিস্তানের মহম্মদ আলি জিন্নাহ্।

Hyderabad is an independent sovereign State...... India should not resort to methods of force, and violence to compel Hyderabad to accede to India, for it is contrary to high sense of morality and justice and fair play in dealing with a sovereign independent neighbouring State. *

অর্থাৎ, হায়দারাবাদ একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র। সেই হায়দারাবাদকে সামরিক শক্তি দিয়ে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে, ভয় দেখিয়ে ভারতীয় য়ুনিয়ানে যোগ দেওয়াতে বাধ্য করার নীতি ভারতের গ্রহণ করা উচিৎ নয়। কারণ, একটি স্বাধীন, সার্বভৌম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে এই ধরণের দুর্ব্যবহার করা উচ্চমানের নীতি আর ন্যায়ের বিরুদ্ধে।

তা তো বটেই। তাহলে এই ধরণের উচ্চমানের নীতি আর ন্যায় কাশ্মীরে হানাদার পাঠনোর সময়ে জিন্নাহ্ সাহেবের ছিল কোথায়?

ঠিক সেই দিনই তাঁর চেলা পাকিস্তানের বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ জাফরুল্লা খাঁ সংবাদপত্রের কাছে তাঁর প্রভুর উক্তিটিকেই সমর্থন করলেন:

Our sympathies are obviously with Hyderabad. We do not see why Hyderabad should be forced to accede to India. *

স্বাভাবিক কারণেই আমাদের সহানুভূতি হায়দারাবাদের উপরে। হায়দারাবাদকে জোর করে ভারতীয় য়ুনিয়নে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে কেন তা আমরা বুঝতে পারি নে।

জাফরুল্লা খাঁর ক্ষোভের কারণ নেই তা আমরা বলছি নে। জুনাগড় গেল, কাশ্মীর গেল-গেল অবস্থায় পড়ে, আবার হায়দারাবাদও টলটলায়মান। ভারতবর্ষের নীতিটা কী? জুনাগড়ে রাজার অধিকারকে নস্যাৎ করে দিল ভারত; আবার কাশ্মীরে এসে সেই রাজার অধিকারকেই আইন সঙ্গত বলে স্বীকার করল; আবার হায়দারাবাদে এসে দেখি সেই জুনাগড়ের নীতি চালু করা হচ্ছে।

কোন্‌টা ভারতের আসল নীতি, কোন্‌টা নকল?

এই জটিল রাজনীতি বোঝা এবং বোঝানো সত্যিই বড় কষ্টকর।

সুতরাং হায়দারাবাদের দুঃখে যে পাকিস্তানী নেতাদের কলজে কেটে যাবে সেবিষয়ে আশ্চর্য হওয়ার আর কী রয়েছে?

কেবল পাকিস্তানকে দোষ দিয়েই বা লাভ কী?

স্বয়ং চর্চিল সাহেব ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুলাই হাউস অফ কমন্‌স-এ কী বলেছেন দেখুন:

It (Hyderabad) at present a sovereign independent state. ...of the fifty member States of U.N., 39 were smaller, 20 had smaller territorios, and 15 had smaller revenue. We are told that Hyderabad is surrounded by Indian territories, that it is land-locked, and has no access to sea. Such circumstances

---

*** V. V. RAO+V. R. RAO : India's Police Action P. 3.**

have nothing to do with the right of Independence. Switzerland is completely land-locked, with no access to sea. It has maintained its independence for hundreds of years.

বর্তমানে হায়দারাবাদ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ইউনাইটেড নেশনস-এ যে পঞ্চাশটি সদস্য স্টেট রয়েছে তাদের মধ্যে উনচল্লিশটি হায়দারাবাদের চেয়ে ছোট—কুড়িটি সীমানায়, পনেরটি রাজস্ব আদায়ে। শোনা যায়, হায়দারাবাদের চারপাশে নাকি ভারতীয় ভূখণ্ড, এবং এর কোন অংশ দিয়ে সমুদ্রে যাওয়ার নিজস্ব কোন পথ নেই। এসবের সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক কী রয়েছে? সুইজারল্যানড-এরও সেই একই অবস্থা, কিন্তু শত-শত বছর ধরে এ তো স্বাধীনতা ভোগ করে যাচ্ছে।

তাই যদি হবে তাহলে আয়ারল্যানড নিয়ে এত হই-চই করেছে কেন ব্রিটিশ সরকার; এবং আলাসটারে এই যুগেও এত ব্রিটিশ সৈন্য প্রেরণ করা হচ্ছে কেন? তাছাড়া, সুইটজারল্যানড তো চিরকালই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। হায়দারাবাদের সে রকম অস্তিত্ব কি কোন দিন ছিল?

নিজের নাক না কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করার চেষ্টাটা ব্রিটিশ রাজনীতির একটি মৌলিক অধিকারই বটে!

ইত্তেহাদের দল এই সংবাদে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ধেই-ধেই করে নাচতে সুরু করে দিল। তাহলে তাদের সংগ্রামকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে মানুষ রয়েছে পৃথিবীতে! ব্রিটিশ প্রেস আর তাদের এজেন্টরা সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে। 'শাহ্ ওসমান' আর 'আজাদ হায়দারাবাদ প্যাইনদাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল।

নিজাম উসমান আলি খাঁ এতে খুসীই হলেন। দিনের বেলাতেও তিনি স্বাধীন হায়দারাবাদের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এখন আর ব্রিটিশদের দেওয়া 'হিউ একসজালটেড হাইনেশ' নয়; এখন তিনি

রাজচক্রবর্তী—'হিজ ম্যাজেসটি'। এরপর থেকে তিনি মুসলমানদের একেশ্বর হয়ে দাঁড়াবেন। তাঁর পতাকা বিজয়গর্বে দিল্লীর লাল কেল্লার ওপরে উড়বে।

মিঃ উসমান আলি খাঁ, সি-জি-এস-আই, জি-বি-ই, ব্রিটিশদের "বিশ্বস্ত বন্ধু", আশফিয়া বংশের সপ্তম নিজাম দিনের বেলাতেও এই সব স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

কিন্তু তিনি জানতেন না যে তিনিই এই বংশের শেষ নিজাম।

তিনি জানতেন না অদূর ভবিষ্যতে তাঁর সব স্বপ্ন মরসুমী ফুলের মত ঝরে যাবে।

তিনি জানতেন না পৃথিবীতে অতি চতুর মানুষও মাঝে-মাঝে এমন সব কাজ করে যা করতে মূর্খরাও সাতবার পিছিয়ে আসে।

যা বলছিলাম।

এই একটি বছর নিজাম প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে গ্রহণ করলেন।

কীসের প্রস্তুতি ?

তাঁর এবং তাঁর সাকরেদদের প্রথম কাজ হল রিফিউজির পোশাকে ভারতীয় য়ুনিয়ন থেকে বারো হাজার পাঠান এবং আট লক্ষ মুসলমান আমদানি করা।

পাঠানদের দিয়ে তিনি যুদ্ধ করাবেন। বারো হাজার পাঠানের মধ্যে তিন হাজার পাঠান তিনি নিয়মিত সমর বিভাগে ঢুকিয়ে দিলেন। বাকিদের কাজ হল ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ঢুকে শান্তি আর শৃঙ্খলা নষ্ট করা, লুঠ করা। অন্যান্য মুসলমানদের ওপরে হিন্দু সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত করার ভার দেওয়া হল।

অস্ত্র আর রসদ তৈরী করার জন্যে কাদির বাগ আর মতিমাহালে কারখানা স্থাপিত হল। এগুলির ভার দেওয়া হল লেঃ কর্নেল এম-এ-হাসানের ওপরে। সেখানে তৈরী হোত 'মিলস থানড গ্রেনেড', লি-এনফিলড ৩০৩ রাইফেলের ব্যারেল, ওয়ান-সট রাইফেল ইত্যাদি।

যে সমস্ত মুসলমান আর পাঠান শ্রমিকরা ভারতীয় অস্ত্র কারখানায় কাজ করেছিল তাদেরই সেই সব কাজে নিয়োগ করা হল। প্রতি দিন তিনটি সিফট-এ প্রায় ন'শ শ্রমিক সেখানে কাজ করত। হায়দারাবাদ সিটিতে একটি স্টেনগান তৈরি করার কারখানা স্থাপিত হল। সেখানে খাটতো প্রায় চারশ শ্রমিক। এছাড়া মুসলমানদের অজস্র দোকানে সাধারণ অস্ত্রও তৈরি হতে লাগলো।

এক কথায় গোটা হায়দারাবাদ জুড়েই অস্ত্র তৈরি করার মহড়া সুরু হয়ে গেল। হিন্দুদের কাছ থেকে আগ্নেয় অস্ত্র ছিনতাই করে সেগুলি সব সমর বিভাগে জমা দেওয়া হল। ছিনতাই করা কিছু অস্ত্র দেওয়া হল রাজাকারদের হাতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে হায়দারাবাদের নিজস্ব সৈন্য সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ব্রিটিশ সরকার এই বাহিনীটিকে আধুনিক কায়দায় ঢেলে সেজে-ছিল। ১৯৪৭ সালে লেঃ জেনারেল লকহার্ট, জি-ও-সি সাদার্ন কম্যানড, হায়দারাবাদের সমর দপ্তরকে ৩৮টি Stag Hounds A craft (Anti air-craft) কামান উপহার দিয়েছিলেন। সেই সময়ে নিজামের ঘরোয়া বাহিনী House Hold Brigade তৈরি হয়, এবং, দুটি 'নিজাম ইনফ্যানট্রি' গঠন করা হয় নতুন করে। মোটের ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার কালে হায়দারাবাদের সৈন্য বাহিনী দশ হাজারে এসে দাঁড়ায়।

এইগুলি ছাড়াও, লায়েক আলি মন্ত্রীপরিষদ হায়দারাবাদের সমর বিভাগটিকে ঢেলে সাজার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। নতুন নতুন অস্ত্র কারখানা তৈরি করেছে, সংস্কার করেছে পুরাতন কারখানাগুলি। ভারতবর্ষ পুলিশ অ্যাকসন নেওয়ার আগে হায়দারাবাদের সৈন্য সংখ্যা ২৮০০০ হাজারে গিয়ে পৌঁছেছিল।

এছাড়া ছিল সৈন্যদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা। ভারতবর্ষের সামরিক দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত অনেক ব্রিটিশ, অ্যাংলো ইনডিয়ান

এবং মুসলমান অফিসাররা এই প্রশিক্ষণ শিবিরে সাময়িক ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লেঃ কর্ণেল ওয়েস্‌টন, মেজর জে-বি ক্রসথওয়েট, মেজর লিটল, মেজর ক্রিজি ইত্যাদি। গেরীলা যুদ্ধ শেখানোর জন্যে লেঃ বার্ডকে নিয়োগ করা হয়েছিল। ভাইসরয়-এর কমিশনের [V. Cos] দু'শ থেকে তিনশ মুসলমান অফিসার নিজামের সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

এইসব ছাড়াও বিদেশ থেকে সামরিক সম্ভার আসতে লাগলো চোরা পথে। ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের পরোক্ষ সাহায্যে আন্তর্জাতিক কুখ্যাতি-সম্পন্ন চোরাই কারবারে সিদ্ধহস্ত একটি দলের সঙ্গে হায়দারাবাদ সরকার চুক্তি সই করল। এই দলটি "সিডনী কটন" [Sydney Cotton] নামে পরিচিত। এদের বিমান ঘুরে বেড়াত চারদিকে। এই বিমানগুলির তারা নাম দিয়েছিল "Mercy Flights". এরা প্রচার করে দিয়েছিল যে জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্যে এরা বিদেশে ওষুধ চালান দিচ্ছে। এই অজুহাত দেখিয়ে সেই কুখ্যাত দলটি হায়দারাবাদে প্রচুর সমর উপকরণ সরবরাহ করেছিল। এদের ঘাঁটি ছিল করাচীতে। পাছে ভারতীয় আকাশ পথে সোজাসুজি উড়ে এলে কৈফিয়ৎ বা তদন্তের মুখে পড়তে হয় এই ভয়ে সিডনী কটন-এর বিমানগুলি করাচী বিমানবন্দর ছাড়িয়ে আরব উপসাগরের দক্ষিণ দিকে এঁকেবেঁকে সোজা হায়দারাবাদের মধ্যে ঢুকে যেত। হায়দারাবাদে ঢোকার পথে যে ভারতীয় রাজ্যটি পড়ত সেটিকে তারা কুড়ি মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করে চলে আসত।

এইখানেই চুপ করে বসে থাকে নি হায়দারাবাদ সরকার। হায়দারাবাদের সৈন্য বিভাগের একটি মোটা অংশ বাস্তুত্যাগী মুসলমান দিয়ে গঠিত হয়েছিল। তারা যুদ্ধও করেনি কোন দিন, কামান-বন্দুক-বিমানধ্বংসী যন্ত্রপাতিও কোনদিন দেখেনি। আপদ কালে যাতে তারা দল ছেড়ে পালিয়ে না যায় [যা তারা সত্যিই করেছিল] সেইজন্যে

ভারত সরকার তাতেই রাজি। অস্ত্র দেওয়া হবে, রসদ দেওয়া হবে। তাছাড়া সৈন্যবাহিনীও তো ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। সুতরাং সময় মত ও-সবই সরে আসবে।

এক কথায় ভারত সরকার চুক্তির সব ধারাই মেনে নিলেন।

কিন্তু নিজাম করলেন কী?

Almost before the ink was dry on the Standstill Agreement, the Nizam's Govt. issued two ordinances in quick succession. The first imposed restrictions on the export of all precious metals from Hyderabad to India. The second declared Indian Currency to be not legal tender in the state. *

অর্থাৎ চুক্তির গায়ে কালির দাগ শুকোতে না শুকোতে নিজাম-শাহী সরকার পরপর দুটি জরুরী আইন ঘোষনা করলো। প্রথম ঘোষনাতে হায়দারাবাদ থেকে ভারতবর্ষে যে সমস্ত দামি-দমি ধাতু চালান আসতো তাদের ওপরে নিয়ন্ত্রণ জারি করা হল।

দ্বিতীয়টি আরও মোক্ষম। ভারতীয় কারেন্সী হায়দারাবাদে নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

এইখানেই শেষ নয়।

On top of this, the Govt. of India received information that the Govt. of Hyderabad had advanced a loan of Rs 20 crores to Pakistan in the form of Govt. of India securities of equivalent value. *

ভারত সরকার জানতে পারলো যে হায়দারাবাদ সরকার পাকিস্তানকে কুড়ি কোটি টাকা ধার দিয়েছে।

এইখানেও শেষ নয়।

নিজাম জানালেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন। ভারতকে না জানিয়েই জন-সংযোগের

---

*. Integration of the Princely States—P. 339

কাজ করার জন্যে তিনি করাচীতে আগেই একটি অফিসার নিয়োগ করে পাঠিয়েছেন।

নিজামের কাণ্ডকারখানা দেখে তো সবাই হতবাক।

ভারত সরকার একটি কড়া অভিযোগ পাঠালো নিজাম সরকারের কাছে।

নবাব ময়ন নওয়াজ যঙ-এর নেতৃত্বে হায়দারাবাদ ডেলিগেশন এল দিল্লীতে। 'যুদ্ধং দেহী' ভাব নিয়ে নওয়াজ যঙ আলোচনাতে বসলেন।

প্রথমেই তিনি বললেন—হায়দারাবাদ ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, আক্রান্ত, এবং রক্তাক্ত সমস্ত ভারত জুড়েই তার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালানো হচ্ছে; ভারতের দুরভিসন্ধিপূর্ণ প্রচার যন্ত্রের সে একটি শিকার।

অর্থাৎ, ভারত যতই অন্তর্ভুক্তির জন্যে চাপ দেবে ততই হায়দারাবাদের স্বাধীনতাকামী মুক্তি-যোদ্ধাদের আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠবে।

কিন্তু ভারতীয় কারেন্সীকে আপনারা হায়দারাবাদে বেআইনী বলে ঘোষনা করলেন কেন?

হায়দারাবাদের কারেন্সীকে জনপ্রিয় করার জন্যে। তাছাড়া এই ঘোষনার ফলে ভারতীয় কারেন্সীর কোন ক্ষতি হয়েছে কি?—প্রশ্ন করলেন নওয়াজ যঙ।

কিন্তু পনেরই আগস্টের আগে একাজ কি আপনারা করতে পারতেন?

না। তখন হায়দারাবাদের পৃথক কোন অস্তিত্ব ছিল না।

বেশ। আপনারা মূল্যবান ধাতুর চালানে নিয়ন্ত্রণ জারি করেছেন কেন?

নওয়াজ যঙ বললেনঃ নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয় নি। তবে

হায়দারাবাদ থেকে মূল্যবান ধাতু রপ্তানি করার আগে অর্থ দপ্তরের অনুমতি নিতে হবে, সকলকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পনেরই আগস্টের আগে কি এই অনুমতি নিতে হোত ?

না। তবে পনেরই আগস্ট আমরা পেরিয়ে এসেছি। তাছাড়া এই নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে রাজনৈতিক কোন সমস্যা জড়িত নেই, জড়িত রয়েছে স্টেটের স্বার্থ।

আর করাচীতে পাবলিসিটি অফিসার নিয়োগ ?

ওটা তো আজকের ব্যাপার নয়—তু'বছর আগের। ওটার গুরুত্ব আমাদের কাছে যথেষ্ট। হায়দারাবাদ কী করছে সেই সম্বন্ধে বিদেশকে ওয়াকিবহাল করাই এই নীতির উদ্দেশ্য। এর ফলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে হৃদয়-বিনিময়ের সুযোগ আসবে।

পনেরই আগস্টের আগে কি পলিটিক্যাল দপ্তরের মাধ্যমে ছাড়া আপনারা এই কাজ করতে পারতেন ?

উত্তর এল ঃ পলিটিক্যাল দপ্তরের অস্তিত্ব আজ আর নেই।

পাকিস্তানকে যে কুড়ি কোটি টাকার ইনডিয়ান সিকিউরিটি ধার দিয়েছেন তার পেছনে আপনাদের যুক্তি কী ? স্থিতি-অবস্থা স্বাক্ষর করার সময়েও তো এই ঋণের কথা আমরা জানতে পারি নি।

ময়ন নওয়াজ যঙ উত্তর দিলেন ঃ পাকিস্তানকে কুড়ি কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যাপারটা নিজামের ভূতপূর্ব মন্ত্রীমণ্ডলীই ঠিক করে গিয়েছেন। তাছাড়া ওটা হল গিয়ে হায়দারাবাদের ইনভেসটমেনট।

অর্থাৎ ভারত সরকারের সব আপত্তিই নবাব ময়ন নওয়াজ যঙ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু সব জিনিস অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় ? স্থিতি-অবস্থার চুক্তিটি খুললেই নবাবের যুক্তির অসারতা প্রমানিত হয়ে যাবে। একথা সেখানে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে যে পনেরই আগস্টের আগে দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যে সম্পর্ক ছিল পনেরই আগস্টের পর থেকে হায়দারাবাদের সঙ্গে ভারতের সেই সম্পর্ক

বজায় থাকবে। সেই সম্পর্কটিকে অস্বীকার করতে না পারলে, হায়দারাবাদ সরকার তার কোন কাজই সমর্থন করতে পারে না। কিন্তু চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে সে-ক্ষমতা নিজামের নেই।

প্রধান মন্ত্রী লায়েক আলি হাজির হলেন দিল্লীতে। কিন্তু গান্ধীজির হত্যার ফলে [৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮] সেদিন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে নি। তবে ভারত সরকার স্পষ্টভাবে তাঁদের জানিয়ে দিল যে হায়দারাবাদ সরকার যদি পাকিস্তানের কাছ থেকে কুড়ি কোটি টাকা ফিরিয়ে না আনে এবং রাজাকারদের অত্যাচারকে প্রকাশ্যে নিন্দা না করে তাহলে ভবিষ্যৎ আলোচনার আর কোন প্রয়োজন থাকবে না।

বিষয়গুলি নিয়ে ভেবে দেখবে এবং অতিশীঘ্রই ভারত সরকারকে তার ফলাফল জানাবে এই আশ্বাস দিয়ে হায়দারাবাদ ডেলিগেশন ফিরে গেল।

ইতিমধ্যে হায়দারাবাদে রাজাকারদের উৎপাত বাড়লো। গান্ধীজির অস্থি নিয়ে মুন্সীজি ফিরে গিয়েছিলেন হায়দারাবাদে। সেখানে সঙ্গমে তাঁর অস্থি নিমজ্জনের সময় যে বিপুল জনসভা হয়েছিল তাতে মুসলমানরাও নাকি দলে দলে যোগ দিয়েছিল, এবং 'গান্ধীজি কি জয়' ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করেছিল। তিনটি দিন হিন্দু-মুসলমানের এই মিলন আর উচ্ছ্বাস সহ্য করতে পারেন নি কাশিম রেজভি। তাঁর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন :

'স্বাধীন ভারত আজ দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে। আইন সভার মধ্যে স্বাধীনতার উৎসব চলছে; অসহায় মুসলমানদের প্রাণহীন দেহ বাইরে রাস্তার ওপরে পড়ে রয়েছে।...কেন্দ্রীয় সরকার তার দেশকে শাসন করার অযোগ্য। এই পরিস্থিতিতে আমার ওপরে ভার পড়েছে হায়দারাবাদ আর কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যোগ-সূত্র স্থাপন করার। আমার সামনে যে প্রশ্নটা আজ এসে দাঁড়িয়েছে

সেটা হচ্ছে—কার সঙ্গে আমি সম্বন্ধ স্থাপন করব? মিঃ নেহেরুর সঙ্গে, সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে, ধনতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ, হিন্দুমহাসভা, রাজপুত, শিখ বা অন্ধ্রবাসী? হায়দারাবাদ একাত্মতায় সুদৃঢ়; তোমরা অন্ধকারের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আগে তোমাদের একটা সঠিক অস্তানা খুঁজে বার কর; তারপর হায়দারাবাদের দিকে নজর দিয়ো।

হায়দারাবাদের এজেন্ট জেনারেল মুন্সীজির ওপরেও তাঁর বিক্ষোভের সীমা নেই। তাঁকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন:

'স্টেট কংগ্রেস অধুনা ডেকান হাউসে স্থানান্তরিত হয়েছে। হায়দারাবাদের এজেন্ট জেনারেল আর ভারতীয় যুনিয়নের প্রতিনিধি নন। তিনি স্টেট কংগ্রেসের সভাপতি। ভারতের এই প্রতিনিধি করছেন কী? যেখানেই এই ভদ্রলোকটি তাঁর পায়ের ধুলো দিচ্ছেন সেইখানেই মূর্তিমান ধ্বংস এসে উপস্থিত হচ্ছে। এই রকম মানুষকে এক মুহূর্ত সহ্য করা হায়দারাবাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তিনি শেষ করলেন তাঁর বক্তব্য:

'এই চুক্তিটিকে এখনই ছিঁড়ে ময়লা ফেলার বাক্সে ফেলে দেওয়ার জন্যে আপনারা সরকারকে নির্দেশ দিন। সরকার সেই চেষ্টাই করছেন; এবং আমি তাঁদের আরও কিছুটা সুযোগ দিতে রাজি রয়েছি। কিন্তু ভারতীয় যুনিয়নের সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। আমি তাদের এক মাসের বেশী সময় দিতে নারাজ। আমার এই ঘোষনাটিকে যুদ্ধের ঘোষনা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।'

Free India was being enslaved. When inside the Assembly Hall, freedom was being celebrated, lifeless bodies of helpless Muslims lay outside the street! The central Government is incompetent to govern the country. In this atmosphere, I am asked to establish relations between Hyderabad and the Union. The question that confronts me is—'with whom shall I establish my relations? With

Mr. Nehru, Sardar Patel, Capitalism, Socialism, the Hindu Mahasabha, the Rajputs, the Sikhs or the Andhras ? Hyderabad is a solidarity. You (referring to Indian Union) are in the mists. Find out a place for yourself first, and then turn your attention to Hyderabad.

You must ask your Government to tear this Instrument into pieces at once and throw it into the waste-paper baskets. The Government are trying to do so and I offer them a further opportunity. But as far as the Indian Union is concerned, I cannot grant more than one month's time. This declaration of mine can be taken as declaration of war. *

অর্থাৎ কাশিম রেজভির ঘোষনাকে যুদ্ধের ঘোষণা বলে গ্রহণ করতে হবে।

ভারত সরকার তা গ্রহণ করুক আর নেই করুক, হায়দারাবাদে পুরো দমে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলল। দিন-দিন বেড়ে চলল রাজাকারদের অত্যাচার। দৈনন্দিন জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠল হায়দারাবাদের হিন্দুদের।

আর চুপ করে বসে থাকাটা উচিৎ হবে না ভেবে ভারত সরকার নিজামকে একটি চিঠি পাঠালো। সেই চিঠিতে নিজামকে বলা হল—

আপনি স্থিতি-অবস্থার চুক্তি ভাঙছেন।

পাকিস্থানকে আপনি যে কুড়ি কোটি টাকার ঋণ দিয়েছিলেন সেই ঋণের টাকা ফিরিয়ে এনেছেন কিনা সে-সংবাদ এখনও আমাদের জানান নি।

রাজাকারদের সংগঠন নিষিদ্ধ করুন।

ভারতে রপ্তানির ওপরে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন সেটি তুলে নিন।

K. M. Munshi : The End of an Era. P. 114

হায়দারাবাদে ভারতীয় কারেন্সীকে আগের মত চালু করুন।

চিঠিখানির মধ্যে কৈফিয়ৎ তলবের যে সুরটি নিহিত ছিল সেটি শুনতে পেয়েই প্রধান মন্ত্রী লায়েক আলি ক্ষেপে গেলেন। এজেন্ট জেনারেল মুন্সীজির হাত থেকে চিঠিখানি পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি ; বললেন ঃ দেশের জন্যে প্রয়োজন হলে নিজাম বাহাদুর আত্ম-ত্যাগ করবেন। হায়দারাবাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে এখানকার দু'লাখ মুসলমান জীবন বিসর্জন দেবেন।

২৯শে মার্চ [১৯৪৮] লায়েক আলি, কাশিম রেজভি এবং অন্যান্য ইত্তেহাদী নেতাদের মধ্যে একটি গোপন বৈঠক বসলো ভবিষ্যতের কর্ম-পন্থা নির্ধারণের জন্যে। সেই আলোচনাতে সকলেই একমত হলেন যে

কাশ্মীরে ভারত নিশ্চয়ই হারবে।

সেই জন্যে হায়দারাবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালাতে সে সাহস পাবে না।

যদি শেষ পর্যন্ত তেমন কোন অভিযান ভারত চালায় তাহলে সারা ভারতের মুসলমানরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে।

সর্দার মৃত্যুশয্যায়। তাঁর বাঁচার কোন আশা নেই।

সর্দার একবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে-সঙ্গে ভারত সরকারও তার সমস্ত অভিযান চিঠিপত্র আর ব্যর্থ আলোচনার মধ্যে দিয়ে চালাবে।

অতএব, মা ভেতব্যম। জোর কদমে রণমাঝে সজ্জিত হও। নিজামকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানাও। প্রাসাদের মধ্যে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখ।

সঙ্গে সঙ্গে কাজ সুরু হয়ে গেল।

নিজামকে একপাশে হঠিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন তিনটি মূর্তি ঃ লায়েক আলি, ময়ন নওয়াজ, এবং কাশিম রেজভি। তাঁদের গুপ্ত-চর ইয়ার যঙ সব সময়েই প্রায় নিজামের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াত।

কাউকেই প্রায় তাঁর সঙ্গে একলা দেখা করতে দেওয়া হোত না ; এমন কি নিজামের আইন উপদেষ্টা স্যার ওয়ালটার মনকটনকেও না। এত-দিন ধরে সমস্ত কাগজপত্র নিজামের কাছে দেওয়ার রীতি ছিল ; এবার থেকে সেই রীতি উঠে গেল। লায়েক আলি মুখে মুখেই তাঁর মতে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি নিজামকে জানাতেন, আর নিজাম কলের পুতুলের মত ঘাড় নাড়তেন।

আর একদিকে সাঝ-সাঝ রব, গোটা হায়দারাবাদ জুড়েই কেবল যুদ্ধের প্রস্তুতি। এক রাজাকারদের সংখ্যাই এক লক্ষে গিয়ে দাঁড়ালো। তারা দেশের সমাজ জীবনের ওপরে আধিপত্য বিস্তার ক'রে লুঠ-পাট হত্যা রাহাজানিতে ভরিয়ে দিল চারপাশ। কে-এম-মুন্সী এ বিষয়ে তদন্ত করে বলেছেন ঃ

Between April, 1947, and March, 1948, approximately 250 villages in the State had been looted or burnt, 4000 houess set on fire, 500 persons killed or wounded, and 450 women molested. Yet, the Hyderabad Radio claimed that this was all untrue. *

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৪৮ সালের মার্চের মধ্যে হায়দারাবাদ স্টেটে প্রায় ২৫০টি গ্রাম ভস্মীভূত বা লুণ্ঠিত হয়েছে, ৪০০০ বাড়ীতে আগুন দেওয়া হয়েছে, ৫০০ মানুষ নিহত অথবা জখম হয়েছে, এবং ধর্ষিতা হয়েছে আনুমানিক ৪৫০টি নারী।

তবু হায়দারাবাদ বেতার থেকে বলা হচ্ছে ঃ এ সব মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। সব ঝুটা হ্যায়।

অস্ত্র আসছে নানা জায়গা থেকে। তৈরি হচ্ছে, দেশ-বিদেশ থেকে চোরাই হয়ে আসছে। কিছু ভূতপূর্ব ব্রিটিশ সামরিক অফিসার নিজামের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছে প্রশিক্ষণের জন্যে। সীমান্ত-বর্তী অঞ্চলগুলিতে হিন্দু অধিবাসীদের ওপরে হামলা সুরু হয়েছে।

* The End of An Era—P. 137

রাজাকারদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রে ঢুকে পড়ছে তারা। রাজাকাররা ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত জায়গাগুলির ওপরে হামলা স্বরু করে দিয়েছে।

ওপাশে ভারতীয় রাষ্ট্রের সীমান্ত অঞ্চলগুলি পাহারা দেওয়ার জন্যে ভারতীয় পুলিশ মোতায়েন করা হল। ছোটখাট সংঘর্ষ স্বরু হল। গুজব রটলো যে বোম্বাই-এর সীমান্তবর্তী সহর সোলাপুরে সামরিক অফিসারদের জন্যে বাড়ী দখল করা হচ্ছে।

হায়দারাবাদের প্রধান সেনাপতি এল-এদ্রুস এবারে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তিনি তাঁর সামরিক অফিসারদের ডেকে জানিয়ে দিলেন—যুদ্ধ আসন্ন প্রায়। আপনারা সব প্রস্তুত থাকুন।

আকাশে বাতাসে তখন যুদ্ধের গুজব ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষ নাকি হায়দারাবাদ আক্রমণ করবে।

এরই মধ্যে দার-উস-সালামে [Dar-US-Salam] মহা আড়ম্বরে 'হায়দারাবাদ অস্ত্র-সংগ্রহ দিবস' [The Hyderabad Weapon's Week] উৎযাপিত হল। জায়গাটি হচ্ছে ইত্তেহাদের প্রধান কার্যালয়। সপ্তাহের শেষ দিনে [৩১শে মার্চ] মফঃসলের রাজাকাররা বিরাট একটি মিছিল বার করল। তাদের সঙ্গে অবশ্য সহরের পুলিশরাও যোগ দিয়েছিল। কাশিম রেজভি সেই বিরাট মিছিলের অভিবাদন গ্রহণ করলেন।

সেই সময় লনডন টাইমস-এর প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। সেইখানে কাশিম রেজভি ভারতীয় য়ুনিয়নের বিরুদ্ধে সে বিষোদগার করেছিলেন তা যেমন হিংসাত্মক তেমনি উত্তেজনাপূর্ণ। সেই বক্তৃতার অংশ বিশেষ আমি এখানে তুলে দিলাম।

'হায়দারাবাদ একটি মুসলিম স্টেট। ভারতীয় য়ুনিয়ন দাক্ষিণাত্য থেকে মুসলমান শাসনকে মুছে দিতে এগিয়ে আসছে। ভুলে যাবেন না, হায়দারাবাদের সাড়ে চার কোটি মুসলমান ইসলামিক রাষ্ট্রের পতাকা তুলে ধরার জন্যে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'আমরা গত আট শ' বছর ধরে দাক্ষিণাত্য শাসন করছি ; এবং ভারতীয় য়ুনিয়ন পছন্দ করুক আর নাই করুক, আমরা তা শাসন করে যাব।

'প্রায় এক হাজার বছর পরে ভারতীয় য়ুনিয়নের হাতে আজ ক্ষমতা এসেছে। কিন্তু তারা শাসন করতে জানে না। সেই জন্যেই তারা মুসলমানদের কাছে সাম্রাজ্য হারিয়েছিল। আবার সেই ক্ষমতা তাদের হাতে এসেছে ; এখন তারা চাইছে আমাদের সংহতি নষ্ট করতে, শিং দিয়ে গুঁতোতে চাইছে আমাদের, ধমক দিয়ে আমাদের বশে আনতে চাইছে।...

'কারবালার কথা ভুলে যাবেন না। প্রতিটি মুসলমানই যোদ্ধা। শুধু যোদ্ধা নয়, সে একটি প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা। সত্যি কথা বলতে, কি, সারা ভারত জুড়ে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত। ভারত যদি আজ স্বাধীন হয়ে থাকে তাহলে তার সমস্ত কৃতিত্ব এই মুসলমানের।...

'যতদিন না পর্যন্ত আপনারা লক্ষ্যে পৌঁছছেন ততদিন পর্যন্ত তরোয়াল খাপে ঢোকাবেন না ['দিল্লী চল' রব]। শত্রুকে কুকুরের মত বিতাড়িত করুন। তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। নিজের অসুবিধের কথা ভাববেন না। আমরা ভগবানে বিশ্বাসী। যিনি এই ইসলামিক রাষ্ট্র স্থষ্টি করেছেন সেই আল্লাই অমাদের একমাত্র বন্ধু। তিনি আমাদের ওপরে বিরূপ হবেন না। আসুন, একহাতে কোরান, আর এক হাতে তরোয়াল নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই, শত্রুকে টুকরো টুকরো করে কুঁচিয়ে আমাদের ইসলামিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করি।

'ভারতের মুসলমানরা আমাদের গুপ্তচরের কাজ করবেন। ভারতীয় য়ুনিয়ন আমাদের মধ্যে গুপ্তচরের সন্ধান করছে। আমরা তাদের উলটো চাপ দিই। তখন তারা বুঝবে মুসলমান কি শক্ত ধাতুতে গড়া'।

'অহো ভাগ্যম। কাফির হিন্দু, যারা পাথর এবং হনুমানের পুজো করে [হাসি], যারা ধর্মের নামে গরুর মূত্র পান করে এবং গোবর ভক্ষণ করে (আবার হাসি), যারা অক্ষরে অক্ষরে বর্বর, তারা আমাদের করবে শাসন !! কী দুরাশা তাদের !!'

এইখানেই কি শেষ ?

না। আরও আছে।

'বন্ধুগণ, আমার হৃদয় আজ রক্তাক্ত। দিল্লীতে তারা যে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে, এখানেও তারা তাই করতে চায়। যে-পদ্ধতিতে তারা হায়দারাবাদকে দাসত্বের শৃঙখলে বাঁধতে চায়, সেই পদ্ধতিটা হল বেনিয়াদের। এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে খোলা তরোয়াল। আমি আজ এখানে রয়েছি। কাল হয়ত এখানে থাকবো না। কিন্তু বন্ধুগণ, আমি আপনাদের নিশ্চয় করে বলতে পারি আপনারা যদি কাশিম রেজভিকে জীবনে বা মরণে খুঁজে পেতে চান তাহলে তাকে বানজারার রাজপ্রাসাদের মধ্যে পাবেন না, বা পাবেন না চা-এর বিলাসী কোন আসরে। তাকে পাবেন যুদ্ধক্ষেত্রে। দেখবেন, হয় আমি শত্রু নিধন করছি, অথবা মরে পড়ে রয়েছি—আমার এক হাতে খোলা তরোয়াল, আর বুকের উপরে কোরান। *

আল্লাহো আকবর !! সিদ্দিকী-ডেকান জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল। তারপরেই সুরু হল—দিল্লী চল, দিল্লী চল।

কুইক মার্চ।

কাশিম রেজভি তো বক্তৃতা দিয়েই খালাস। তার হেঁপা পোয়াতে স্যার ওয়ালটার মনকটনের নাভিশ্বাস উঠলো। ভদ্রলোক মাসিক আলোচনার জন্যে দিল্লীতে গিয়েছিলেন ৭ই এপ্রিল। আর ঠিক সেইদিনই সকালবেলা হিন্দুস্থান টাইমস ফলোয়া করে কাশিম

* K. M. Munshi : The End of An Era : P. 141-42

রেজভির ৩১ শে মার্চের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণটি ছাপিয়ে দিল। হই-চই পড়ে গেল চারপাশে।

লর্ড মাউনটব্যাটন ক্রুদ্ধ।

পণ্ডিত জওহরলাল বিক্ষুব্ধ।

সর্দার প্যাটেল বিব্রত।

পার্লামেনট উদ্বেলিত।

এরই নাম স্থিতি অবস্থা! এই হল গিয়ে নিজামের হৃদয় পরিবর্তনের নমুনা!

মনকটন সাহেব লজ্জায় মাথা তুলতে পারলেন না। রেগে ফিরে গেলেন হায়দারাবাদে।

দিল্লীতে হায়দারাবাদের যে ডেপুটি এজেনট জেনারেল ছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি হায়দারাবাদে লায়েক আলিকে টেলিফোন করলেন: রেজভিকে মুখ বন্ধ করতে বলুন। অন্যথায় সব ভেসতে যাবে। লর্ড মাউন্টব্যাটন থেকে শুরু করে কেউ ডেলিগেশনের সঙ্গে আলোচনায় বসবে না।

নিজামের কানেও খবরটা গেল। তিনিও রেজভির ওপরে চটে লাল। ওই পাগলটার জন্যেই না তাঁর পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

লায়েক আলির সঙ্গে রেজভির গোপন কী-সব শলাপরামর্শ হল ভগবান জানেন; কিন্তু অগ্নি উদ্গীরণকারী বীর রেজভি বললেন: ওসব ঝুটা হ্যায়। না হয়েছে মিছিল, না হয়েছে সভা। কিছুই হয়নি। বক্তৃতা দেব কোথায়? দুষ্ট লোকেরা মিথ্যে রটিয়েছে সব।

কিন্তু ১লা এপ্রিলের নিজাম গেজেটটাও কি তাহলে মিথ্যা?

লণ্ডন টাইমস-এর বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ ব্রিটারের সংবাদটিও মিথ্যা তাহলে?

শেষ পর্যন্ত নিজাম বলে পাঠালেন: খবরের কাগজে রেজভির

যে বক্তৃতাটি ছাপা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা। সুতরাং আলোচনা যেন বন্ধ না হয়।

রেজভির মুণ্ডপাত করলেন নিজাম।

এখনও আঘাত করার সময় আসেনি।

এখনও সময় নেওয়ার পালা !!

আর রেজভি কিনা···মূর্খ।

এপ্রিলের মাঝামাঝি স্যার ওয়ালটার মনকটন একটি নতুন পরিকল্পনা পেশ করলেন। তাঁর বিশ্বাস এই পরিকল্পনাটি দুই পক্ষের গ্রহণযোগ্য হলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে মন কষাকষি চলছে তা দূর হবে। পরিকল্পনার মধ্যে ধারা ছিল চারটি ঃ

(১) রাজাকারদের মিছিল আর সমাবেশ নিষিদ্ধ করে নিজাম কাশিম রেজভিকে সংযত করবেন।

(২) প্রগতিশীল মন্ত্রীদের নিয়ে নিজাম তাঁর নতুন সরকার তৈরি করবেন।

(৩) গঠন করবেন আইন-সভা।

(৪) আইন-সভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজাম এমন একটি সরকার গঠন করবেন যে সরকার সেই আইনসভার কাছে দায়ী থাকবে।

চমৎকার কথা। লর্ড মাউন্টব্যাটন রাজি হয়ে গেলেন। সম্মতি দিলেন পণ্ডিত নেহেরু আর সর্দার প্যাটেল। সর্দার প্যাটেল তো খোলাখুলি ভাবে বলেই দিলেন, লর্ড মাউন্টব্যাটন যদি নিজামের কাছ থেকে ওই গুলি আদায় করতে পারেন তাহলে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামাবেন না।

কিন্তু নিজাম বাহাদুর ওতে রাজি নন।

তিনি বললেন—স্টেট কংগ্রেসের সঙ্গে আমি কোন আলোচনায় বসবো না। তবে আমার প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে নিশ্চয়ই আমি

কিছু করবো ; দরকার হলে, পুরানো মন্ত্রীসভা ভেঙে নতুন মন্ত্রী-সভা গঠন করব।

কিন্তু এক তোড়জোড় করা ছাড়া আর কিছুই হল না। ভক-ভক করে ধোঁয়া ছাড়লো ; এক ফোঁটা আগুনও বেরোল না।

রেজভি তাঁর রাজাকার চেলাদের সম্মেলনে বললেন : 'ভারতীয় য়ুনিয়নের যদি একটি সৈন্য হায়দারাবাদে প্রবেশ করে তাহলে আমার রাজাকার বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে মাদ্রাজে প্রবেশ করবে, এবং হায়দারাবাদের জন্যে হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করবে।

'আপনারা জানেন ভারতবর্ষ বর্তমানে ব্রাহ্মণ আর বেনিয়াদের রাজত্ব। প্রথমে তারা চেয়েছিল, হায়দারাবাদকে ভারতের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যেতে হবে। এখন তারা বলছে দায়িত্বশীল সরকার বসাও। চালাকিটা একবার দেখুন! একবার দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হলেই হায়দারাবাদকে জোর করে ভারতীয় য়ুনিয়নের মধ্যে ঢোকানো যাবে; এবং আমাদের মজলিস সমেত রাজাকার বাহিনীকে অতি সহজেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে। আপনারাই সেই পরিকল্পনাটিকে ভেস্তে দিয়েছেন'।

এই বক্তৃতার পর কাশিম রেজভিকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানানো হল। তাঁকে খেতাব দেওয়া হল মুজাহিদ-ই-আজম, অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বীর।

মনকটন সাহেব রেজভির কাণ্ডকারখানা দেখে নতুন খসড়াটি নিজাম বাহাদুরের হাতে দিয়ে সোজা বিলেত চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন যে নিজাম যদি ভারত সরকারের সঙ্গে সত্যিই একটা বোঝাপড়ায় আসতে চান তাহলে আবার তিনি ফিরে আসবেন। নচেৎ এই তাঁর শেষ যাওয়া।

অর্থাৎ নিজামকে কিছু করতে হবে!

কিন্তু তিনি করবেন কী? পুলিশ বলুন, মিলিটারি বলুন,

যে বক্তৃতাটি ছাপা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা।' সুতরাং আলোচনা যেন বন্ধ না হয়।

রেজভির মুণ্ডপাত করলেন নিজাম।

এখনও আঘাত করার সময় আসেনি।

এখনও সময় নেওয়ার পালা !!

আর রেজভি কিনা···মূর্খ।

এপ্রিলের মাঝামাঝি স্যার ওয়ালটার মনকটন একটি নতুন পরিকল্পনা পেশ করলেন। তাঁর বিশ্বাস এই পরিকল্পনাটি দুই পক্ষের গ্রহণযোগ্য হলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে মন কষাকষি চলছে তা দূর হবে। পরিকল্পনার মধ্যে ধারা ছিল চারটি :

(১) রাজাকারদের মিছিল আর সমাবেশ নিষিদ্ধ করে নিজাম কাশিম রেজভিকে সংযত করবেন।

(২) প্রগতিশীল মন্ত্রীদের নিয়ে নিজাম তাঁর নতুন সরকার তৈরি করবেন।

(৩) গঠন করবেন আইন-সভা।

(৪) আইন-সভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজাম এমন একটি সরকার গঠন করবেন যে সরকার সেই আইনসভার কাছে দায়ী থাকবে।

চমৎকার কথা। লর্ড মাউন্টব্যাটন রাজি হয়ে গেলেন। সম্মতি দিলেন পণ্ডিত নেহেরু আর সর্দার প্যাটেল। সর্দার প্যাটেল তো খোলাখুলি ভাবে বলেই দিলেন, লর্ড মাউন্টব্যাটন যদি নিজামের কাছ থেকে ওই গুলি আদায় করতে পারেন তাহলে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামাবেন না।

কিন্তু নিজাম বাহাদুর ওতে রাজি নন।

তিনি বললেন—স্টেট কংগ্রেসের সঙ্গে আমি কোন আলোচনায় বসবো না। তবে আমার প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে নিশ্চয়ই আমি

কিছু করবো ; দরকার হলে, পুরানো মন্ত্রীসভা ভেঙে নতুন মন্ত্রী-সভা গঠন করব।

কিন্তু এক তোড়জোড় করা ছাড়া আর কিছুই হল না। ভক-ভক করে ধোঁয়া ছাড়লো ; এক ফোঁটা আগুনও বেরোল না।

রেজভি তাঁর রাজাকার চেলাদের সম্মেলনে বললেন : 'ভারতীয় য়ুনিয়নের যদি একটি সৈন্য হায়দারাবাদে প্রবেশ করে তাহলে আমার রাজাকার বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে মাদ্রাজে প্রবেশ করবে, এবং হায়দারাবাদের জন্যে হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করবে।

'আপনারা জানেন ভারতবর্ষ বর্তমানে ব্রাহ্মণ আর বেনিয়াদের রাজত্ব। প্রথমে তারা চেয়েছিল, হায়দারাবাদকে ভারতের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যেতে হবে। এখন তারা বলছে দায়িত্বশীল সরকার বসাও। চালাকিটা একবার দেখুন! একবার দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হলেই হায়দারাবাদকে জোর করে ভারতীয় য়ুনিয়নের মধ্যে ঢোকানো যাবে; এবং আমাদের মজলিস সমেত রাজাকার বাহিনীকে অতি সহজেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে। আপনারাই সেই পরিকল্পনাটিকে ভেস্তে দিয়েছেন'।

এই বক্তৃতার পর কাশিম রেজভিকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানানো হল। তাঁকে খেতাব দেওয়া হল মুজাহিদ-ই-আজম, অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বীর।

মনকটন সাহেব রেজভির কাণ্ডকারখানা দেখে নতুন খসড়াটি নিজাম বাহাদুরের হাতে দিয়ে সোজা বিলেত চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন যে নিজাম যদি ভারত সরকারের সঙ্গে সত্যিই একটা বোঝাপড়ায় আসতে চান তাহলে আবার তিনি ফিরে আসবেন। নচেৎ এই তাঁর শেষ যাওয়া।

অর্থাৎ নিজামকে কিছু করতে হবে!

কিন্তু তিনি করবেন কী? পুলিশ বলুন, মিলিটারি বলুন,

রাজাকার বলুন—সবাই রেজভির কথায় উঠছে আর বসছে। সেই মুজাহিদ-ই-আজমের বিরুদ্ধে তিনি যাবেন কেমন করে?

লায়েক আলি তাঁর কানে-কানে কী যেন বললেন: সঙ্গে-সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন নিজাম।

তিনি দিল্লীকে জানিয়ে দিলেন: মনকটন সাহেবের খসড়াটি গ্রহণযোগ্য নয়।

অর্থাৎ তাঁর সাম্রাজ্যের কোথায় কী করতে হবে তা তিনিই ভাল জানেন। এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার দিল্লীর নেই।

২২ শে এপ্রিল তিনি একটি ফরমান-ও জারি করলেন। সেই ফরমানে তিনি সকলকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর স্টেটের সকলেই তাঁর কাছে সমান; বিদেশ থেকে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের যে প্রস্তাব এসেছে সেটিকে তিনি নাকচ করে দিয়েছেন। বিদেশী সরকার হায়দারাবাদের শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দিতে চায়। আমরা তাতে বাধা দেব।

লায়েক আলিও একজিকিউটিভ কাউন্সিলে প্রায় একই কথা বললেন। ভারত সরকারের সঙ্গে হায়দারাবাদের যে আলোচনা চলছে তাতে হায়দারাবাদ এতটুকু মাথা নোয়ায় নি; বরং মাথাটা তার ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠেছে। অন্তর্ভুক্তির কোন কথাই আমরা শুনব না। হায়দারাবাদে হিন্দুদের ওপরে কোন নির্যাতন চলছে না, আইন শৃঙখলা এতটুকু ভেঙে পড়ে নি। ভারতীয় সংবাদপত্র-গুলি মিথ্যা প্রচার চালিয়ে হায়দারাবাদ আক্রমণ করার জন্যে ভারত সরকারকে উত্তেজিত করছে। হায়দারাবাদ যদি আক্রান্ত হয় আমরা তার উপযুক্ত জবাব দেব। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে হায়দারাবাদে যুদ্ধ প্রস্তুতি পুরোদমে চলতে লাগলো। "স্টেট ফোরসেস স্কীম"-এ হায়দারাবাদকে সাত হাজার সৈন্য দেওয় হয়েছিল। সেই সংখ্যা নিজাম ১৯৪৭ সালেই গোপনে বাড়িয়ে তের হাজার করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়াল বাইশ

হাজার তিনশ তিরানব্বই-এ। এ ছাড়া আরও এগার হাজারের মত সৈন্য শিক্ষানবীশী করছিল। পুলিশের সংখ্যাও আটতিরিশ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল পনের হাজারের মত "হোম গার্ড"। এরা ছাড়াও ছিল সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী। তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখের মত।

রসদ তৈরি করার জন্যে আটটি কারখানা চালু হল। প্রতিদিন সাড়ে তিন হাজার গ্যালন করে অ্যালকোহল [Power alcohol] তৈরি হ'তে লাগলো।

বিমানবাহিনীর জন্যে পাইলট সংগ্রহ করা হ'ল। বিদার আর হায়দারাবাদে নতুন বিমান বন্দর তৈরি করার কাজ হল সুরু।

ভারতের সীমান্তে কড়া পাহারা থাকা সত্বেও, ভারতের নানা জায়গা থেকে চোরাই পথে অস্ত্র আর রসদ আসতে লাগলো।

এর পরেও যদি নিজাম বাহাদুর মনকটন সাহেবের খসড়াটি স্বীকার করে নিতেন তাহলে ঘরে তিনি মুখ দেখাতে পারতেন? বিদেশী শত্রুদের হাসি থামানো বন্ধ করতে পারতেন?

সমস্ত লক্ষ্য করছিল ভারত সরকার।

কিন্তু কী ভাবছিল তারা?

পণ্ডিত নেহেরু কোন দিনই দ্ব্যর্থক ভাষায় কথা বলেন নি; এবারেও বললেন না। ২৬ শে এপ্রিল বোম্বাই-এর সংবাদসেবীরা তাঁকে যে ভোজ-সভায় আপ্যায়িত করেছিলেন সেইখানেই তিনি বললেন: রাজাকারদের ক্রিয়াকলাপে হায়দারাবাদের অধিবাসীদের শান্তি আর নিরাপত্তা যদি বিঘ্নিত হয় তাহলে ভারত সরকার হায়দারাবাদে হস্তক্ষেপ করবেন। শত্রুতা বন্ধ করার সময় এসেছে। হায়দারাবাদ সরকার যদি তাদের দমন করতে না পারেন, অন্য উপায় গ্রহণ করতে হবে আমাদের।

নিজাম বাহাত্বরের প্রতিক্রিয়া কী হল ঠিক বোঝা গেল না বটে; কিন্তু ওই মাসেরই শেষের দিকে ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ধাপে বিষোদগার করার জন্যে একেবারে পাকা ব্যবস্থা করে ফেললেন তিনি। হায়দারাবাদ-দরদী কিছু বিদেশী জার্ণালিস্টদের ওপরে এই ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

অতিশীঘ্রই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের পীঠস্থান হয়ে উঠলো হায়দারাবাদ।

নিজাম বাহাত্বরের একটি মহৎ গুন এই যে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার পথ কিছুতেই তিনি বন্ধ করবেন না। এমন ধৈর্য বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বার বার আলোচনা হচ্ছে—মনে হল সব ঠিক হয়ে গিয়েছে—নিজাম বাহাত্বর খুশী—দস্তখৎ করার জন্যে কলম তুলেছেন—তারপরেই ব্যস। সেই কলম তিনি নামিয়ে রাখলেন, এবং সেই যে নামালেন আর তা তুললেন না।

ভেঙে গেল আলোচনা। বিরক্ত হয়ে যে যার পথ ধরলো। আবার সুরু হল আলোচনা।

ভেতরে ভেতরে সঙ্কট মুহূর্তের জন্যে তিনি তৈরি হচ্ছেন, ছোরা শান দিচ্ছেন গোপনে-গোপনে; বাইরে তিনি আলোচনার ঠাট বজায় রেখেছেন।

এই করতে-করতে ১৯শে জুন এগিয়ে এল। লর্ড মাউণ্টব্যাটন ভারতবর্ষ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে যাবেন!

২১শে জুন তাঁর জাহাজ ভারতীয় উপকুল ছেড়ে চলে গেল।

ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় নিজামকে লর্ড মাউণ্টব্যাটন শেষ চিঠি দিয়ে গেলেন। সেই চিঠিতে নিজামকে তিনি বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে সমস্ত ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করলেন। সেই সঙ্গে এই কথাটাও তিনি

পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে অজুহাত তিনি যতই দিন না কেন তাঁর মত নবাবের পক্ষে চূড়ান্ত একটা কিছু স্থির করার দায়িত্ব কম নেই ; এবং জাতির সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে যদি তিনি একটি মাত্রও ভুল পদক্ষেপ করেন তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তাঁকে জবাবদীহি করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। হয় তাঁকে বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে ঘৃনা কুড়াতে হবে, আর না হয়, দক্ষিণ ভারতের চিন্তাশীল বীর হিসাবে তিনি সম্মানিত হবেন।

নিজামের কাছে মাউণ্টব্যাটনের এই শেষ উঁপদেশ।

উত্তর এল নিজামের ঃ

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমি [এবং আমার সরকার] আপনার পরিশুদ্ধ শেষ খসড়াটিকে গ্রহণ করতে পারলাম না। কেন পারলাম না সেকথা মনকটন সাহেব নিশ্চয় আপনাকে জানিয়েছেন।

আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।

ইতি

এর পরেই একদিন হায়দারাবাদের বৈশেদিক দপ্তরের সেক্রেটারী জাহীর আহ্মেদ এলেন ভারতীয় এজেন্ট জেনারেল কে-এম-মুন্সীর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি একটা সম্মানজনক মিটমাট করার জন্যে মুন্সীজির শরণাপন্ন হলেন। মুন্সীজি সর্দার প্যাটেলকে জানালেন। সর্দার প্যাটেল হেসেই উড়িয়ে দিলেন কথাটা, বললেন ঃ Tell him that the Settlement has gone to England.

কথা বলার শেষ। এসেছে কাজ করার দিন।

কথাটা দু'দলের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

এখন আর ঢাকাঢাকির ব্যাপার নেই। হায়দারাবাদের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সাজ-সাজ রব উঠেছে। মনে হল গোটা হায়দারাবাদ শহরটিই একটি মিলিটারী ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। হায়দারাবাদের কোষাগার থেকে লাখ-লাখ কোটি-কোটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের কাজে।

আকাশে-বাতাসে যুদ্ধের আমেজ দেখা দিল।

ঠিক হল, সাইরেন বাজার সঙ্গে-সঙ্গে হায়দারাবাদের বোমারুগুলি বোম্বে আর ম্যাড্রাসে বোমা ফেলে সব তছনছ করে আসবে।

এই সব বোমারুগুলি কোথায় রয়েছে?

রয়েছে দক্ষিণ আরবে।

এর নাম হচ্ছে পিকক এয়ার বোর্ণ ডিভিশন (Peacock Airbor-ne Divison)

আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেল ইত্তেহাদীরা।

এবারে আর ভারতের নিস্তার নেই।

নিজামের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ভেসতে গেল।

ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করে সর্দার প্যাটেল ফিরে এলেন দিল্লীতে। লর্ড মাউন্টব্যাটন ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিয়েছেন; ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হয়েছেন চক্রবর্তী সি-রাজাগোপালাচারী।

পথ পরিষ্কার সর্দার প্যাটেলের।

"পাতিয়ালা এবং পূর্ব পাঞ্জাব স্টেট য়ুনিয়ন উদ্বোধন"—উৎসবে ভাষণ দিতে উঠে তিনি বললেনঃ অনেকেই আমাকে একটি প্রশ্ন করেছেন, হায়দারাবাদের কী হ'বে? তাঁরা ভুলে গিয়েছেন এই প্রশ্নের উত্তর আমি একবার জুনাগড়ে দিয়েছিলেম; বলেছিলেম, হায়দারাবাদ যদি সোজা পথে না চলে তাহলে তার অবস্থাও এই জুনাগড়ের মতই হবে। সেই কথা আজও খাটে; এবং আমি সেই কথা মতই চলব।

Many have asked me the question: What is going to happen in Hyderabad? They forget that when I spoke at Junagadh, I said openly that if Hyderabad did not behave properly it would go the way of

Junagadh. These words still stand, and I stand by these words.

দীর্ঘ দিন রং তামাসা দেখার পরে সর্দার প্যাটেল এই প্রথম মুখ খুললেন। যাঁকে নিজাম সব সময় এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলেন সেই সর্দারকে সামনে দেখে তিনি বিচলিত হলেন। বুঝলেন, পালে এবার সত্যি সত্যি বাঘ পড়েছে।

হায়দারাবাদ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এল এদ্রুস। ছ' ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ। বসার ঘরে দেখলে মনে হয় তিনি একটি নিখুঁৎ যোদ্ধা। মিষ্টি কথা তাঁর ঠোঁটের ডগায়, সৌজন্যের অবতার।

ইত্তেহাদ এবং লায়েক আলির বন্ধু ছিলেন এল-এদ্রুস। কিন্তু পরে লায়েক আলি তাঁর ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। শোনা যায়, পাকিস্তানী কোন সমরবিশারদের যুক্তিতে তিনি এল-এদ্রুসকে সরাতে পারেন নি। অনেকের মতে এল-এদ্রুসের সম্মোহনী শক্তি ছিল অসীম। কাঁচা সৈন্যদের পাকিয়ে তুলতে তাঁর বেশী সময় যেত না। রাজাকারদের চাপে যে বাহিনী দুমড়ে পড়েছে সেই বাহিনীকে সোজা করার চেষ্টায় তিনিও উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু এইখানেই বিরোধ লাগলো কাশিম রেজভির সঙ্গে।

রেজভির চেলারা তখন সীমান্তবর্তী এলাকায় অহেতুক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে চলেছে। ভারতসীমান্তে ভারতীয় টহলদার বাহিনীর হাতে ধোলাই খেয়ে তারা হায়দারাবাদের হিন্দুদের ওপরে ঝাল মেটাতে সুরু করেছে। তারা অনেক সময় রেল ষ্টেশনে ঢুকে ট্রেনের কামরা থেকে যাত্রীদের টেনে এনে তাদের সর্বস্ব লুট করে নিত, হিন্দুদের দোকানে ঢুকে জোর করে বার করে দিত জিনিসপত্র; জোর করে আদায় করত টাকা; অমুসলমান নারীরা দিনের বেলাতেও রাস্তায় বেরোতে সাহস করত না।

অর্থাৎ সরকারের পক্ষ থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার কোন চেষ্টাই হল না।

এড্রুস সাহেব জানতেন আসন্ন যুদ্ধের সময় দেশের মধ্যে এই ধরনের বিশৃঙ্খলতা দেশের নিরাপত্তা নষ্ট করে। কিন্তু রাজাকাররা বেপরোয়া। শিশির দৈত্যকে বাইরে ছেড়ে দিলে তাকে আবার ভিতরে এনে ঢোকানো কষ্টকর, অনেক সময় তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

রাজাকাররা যখন সামরিক কাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে সুরু করল, তখনই এড্রুস সাহেব চটলেন বেশী।

বম্বের সোলাপুর জেলায় 'বর্সি' বলে একটি ভারতীয় এলাকা ছিল। তার চারপাশেই নিজামের জমিদারী। ভারতীয় পুলিশদের সেখানে যেতে হলে হায়দারাবাদের নানাজ গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হ'ত। একদিন ভারতীয় কিছু পুলিশ যথারীতি সেই গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল; এমন সময় রাজাকাররা তাদের ওপরে আক্রমণ চালাল। খবর পেয়ে সীমান্তের টহলদারী সেনারা ছুটে গেল; তারপরে যুদ্ধ করে বর্সিটি উদ্ধার করল। কিছু লোক হতাহত হল।

দুটি রাষ্ট্রের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি অনুসন্ধান কমিটি বসল। সেই কমিটিতে হায়দারাবাদ থেকে ছিলেন লেঃ কর্নেল ওয়েস্টন, ভারত থেকে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার সিং। ফল বেরোল। দুজনেই একবাক্যে সমস্ত দোষ রাজাকারদের ওপরে চাপিয়ে দিলেন।

রেজভি গেলেন ক্ষেপে: লেঃ কর্নেল ওয়েস্টনকে খতম করো।

সেনাপতি এল-এড্রুস সে কথায় কানই দিলেন না।

রেজভি তখন ঠিক করলেন নানাজ গ্রামটিকে দখল করার জন্যে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠাবেন। ভেস্তে দিলেন প্রধান সেনাপতি।

কিন্তু চটলেন তিনি; সোজাসুজি নিজামের কাছে গিয়ে বললেন: হয় রাজাকারদের নিরস্ত্র করুন, না হয় তো, তাদের আমার অধীন করে দিন।

লায়েক আলি তাতে রাজি হলেন না। কাশিম রাজভি তাহলে করবেন কী?

এল-এড্রুস বললেন : যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ, আজ পর্যন্ত যা রয়েছে এবং বিভিন্ন উপায়ে সংগৃহীত হয়েছে সে-সব আমাকে দিয়ে দিন।

উঁহু, তাতেও রাজি নন লায়েক আলি।

তাহলে, সেনাপতি যুদ্ধ করবেন কী দিয়ে?

কেন, সম্মোহনী শক্তি দিয়ে।

যুদ্ধ যে একটা খেলা নয় এই সামান্য কথাটা কর্তাব্যক্তিদের কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না এল-এড্রুস।

হায়দারাবাদ সরকারের অবস্থাও তখন বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। একের পর এক পদত্যাগপত্র পড়তে লাগলো মন্ত্রীদের। নিজামের জ্যেষ্ঠ পুত্র—বেরারের প্রিন্স ছিলেন সত্যিকার প্রধান সেনাপতি। ঝগড়া করে তিনি পদত্যাগ করলেন। তাঁর আর একটি পুত্র প্রিন্স মুথাজাম ঝা বলে পাঠালেন নিজামকে—আমি হায়দারাবাদ ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে যাব।

কেন, কেন?

রাজকুমার বললেন: হায়দারাবাদের প্রকৃত বন্ধুরাই আজ হায়দারাবাদ ছেড়ে গিয়েছেন। এখানে আর থেকে লাভ কী?

পিংলে ভেনকাটারামা রেড্ডীও স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে বাঙ্গালোরে উপস্থিত হলেন। একে একে নিবিল দেউটি।

হেথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে টুটে।

কিং কোটির অচলায়তনে পায়চারি করছিলেন নিজাম উসমান আলি খাঁ।

লর্ড মাউন্টব্যাটন নেই, নেই প্রিয়তম পারিষদ স্যার ওয়ালটার মনকটন। ছাতারীর নবাব নেই; এমন কি স্যার মির্জা ইসমাইলও উধাও হয়ে গিয়েছেন।

এখন তিনি করেন কী?

কার সঙ্গে পরামর্শ করবেন?

কাশিম রেজভি আর লায়েক আলি কেবল তাঁর সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়েই খুসী হন নি, তাঁর চারপাশে গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন নিজের ইচ্ছায় কিছুই করার মত ক্ষমতা তাঁর নেই। খাল কেটে ঘরে কুমীর ঢুকিয়েছেন নিজাম বাহাদুর।

হস্ ইয়ার যঙকে ডেকে পাঠালেন নিজাম। ইনি নিজামের একজন প্রিয় পারিষদ ছিলেন। তুজনের মধ্যেই বেশ খোলা ভাবেই কথা হল।

হস্ সাহেবের মন্তব্য সহজ: লায়েক আলির মন্ত্রীসভা নাকচ করে দিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করুন। ভারতীয় য়ুনিয়নে যোগ দিন। রাজাকারদের সংগঠনটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিন। প্রয়োজন হলে ভারত সরকারের কাছ থেকে সৈন্য চেয়ে পাঠান।

কারণ?

লায়েক আলি মন্ত্রী সভার সঙ্গে ভারত সরকার কোন আলোচনায় আর বসতে রাজি নয়—এই জন্যে।

ওদিকে কাশিম রেজভি ফোঁস করে উঠলেন: কী! এত বড় কথা? দেখি, কে লায়েক আলি মন্ত্রী সভাকে নাকচ করে।

ভেতরে-ভেতরে স্যার মির্জা ইসমাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন নিজাম। দিল্লীর নাড়ি টেপার জন্যে তিনি ছুটলেন দিল্লীতে। দেখলেন, জল অনেকদূর গড়িয়েছে। সর্দার প্যাটেল এখন হায়-দারাবাদের সমস্ত বকেয়া কাজ নিজের হাতে রেখেছেন। মাউন্ট-ব্যাটনের শেষ খসড়া নিয়ে আলোচনায় বসার আর সময় নেই।

সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, লায়েক আলির সঙ্গে সর্দার কোন কথা বলতে নারাজ।

খবর জানিয়ে নিজামকে টেলিগ্রাম করলেন স্যার মির্জা ইসমাইল।

চনমন করে উঠলো ইত্তেহাদ। এবারে লায়েক আলি মন্ত্রী-সভাকে নাকচ করে দেবেন নিজাম। কতকগুলি বেইমান মিরজা-ফরের দল নিজামকে বুজিয়ে বাজিয়ে ভারত সরকারের কাছে হায়দারাবাদকে বিকিয়ে দিবে।

ইত্তেহাদ কি তা মেনে নেবে?

কখনই না।

যুদ্ধং দেহী ভঙ্গীতে হাজার হাজার রাজাকার নিজাম-বিরোধী ধ্বনি দিতে লাগলো। এবারে তাদের লক্ষ্যস্থল আলা হজরত স্বয়ং নিজাম। ইত্তেহাদী কাগজগুলি অভিযোগ করল মন্ত্রীসভার সঙ্গে নিজাম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মাথার ওপরে খোলা তরোয়াল তাদের চকচক করে উঠলো। তারা স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিল নিজাম যদি ভারত থেকে সৈন্য আমদানির চেষ্টা করেন তাহলে হায়দারাবাদে নিজামের অস্তিত্ব থাকবে না।

নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়লেন নিজাম উসমান আলি খাঁ।

হায়দারাবাদের আইনপরিষদে লায়েক আলি কড়া ভাষণ দিলেন।

ভারতীয় য়ুনিয়ন জোর করে আমাদের দেশ দখল করতে পারে, ধ্বংস করতে পারে আমাদের। কিন্তু আমরা কিছুতেই তা স্বীকার করে নেব না। অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করার জন্যে আমরা রাষ্ট্রসংঘে আপীল করার ব্যবস্থা করেছি।

নিজামের বেতার থেকে মির্জা ইসমাইলের ওপরে আক্রমন চালালো ইত্তেহাদের চাঁইরা।

নিজাম ক্ষেপে লাল হয়ে গেলেন। লায়েক আলিকে ডেকে এনে বললেন: আপনি আমাকেও ডুবোলেন, হায়দারাবাদকেও ডুবোলেন।

এত বড় অপমানের পরে লায়েক আলি আর প্রধান মন্ত্রী থাকতে রাজি হলেন না। তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করলেন।

নিজামের মুখে হাসি ফুটলো।

দিল্লী থেকে স্যার মির্জা ইসমাইল বারবার তাগাদা দিতে লাগলেন: মাউণ্টব্যাটনের খসড়া সই করে পাঠান। সময় চলে যাচ্ছে।

নিজাম ঠিক করলেন খসড়াটি সই করে পাঠিয়ে দেবেন। টেলিগ্রামও গেল সেই রকম।

ভয়ে বুক দুর-দুর করে উঠলো লায়েক আলি, কাশিম রেজভি আর তাঁদের চেলাদের। ইতিমধ্যে প্রিন্স-অফ-বেরারের সঙ্গে মন কষাকষির ফলে প্রধান সেনাপতি এল-এড্রুসও পদত্যাগ করেছেন।

গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীকে নিজাম টেলিগ্রাম করলেন: মাউণ্টব্যাটনের খসড়াটি আমি স্বাক্ষর করেছি। সেটি নিয়ে লোক যাচ্ছে দিল্লীতে।

রেজভি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন; ইত্তেহাদী দল বিমূঢ় হয়ে গেল। কেউ কেউ বলল—বিদারে তারা নতুন সরকার গঠন করবে। সেনাবাহিনীর মধ্যেও দুটি ভাগ হয়ে গেল। একটি রইল নিজামের দিকে, অপরটি গেল রেজভির দিকে। হায়দারাবাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপরে কালো একটি মেঘ নেমে এল।

ওদিকে মির্জা ইসমাইল খুসী; ভারত সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এত দিনের এত চেষ্টা আজ সফলতা অর্জনের পথে।

৫ই আগস্ট রাত্রি ১০-৩০ মিনিটে লায়েক আলি আর কাশিম রেজভি এলেন নিজামের সঙ্গে দেখা করতে।

পরের দিন সকালে নিজাম অন্য মানুষ—মানে, সেই আগেকার। তিনি ঘোষণা করলেন: যাই ঘটুক, আমি ও-খসড়ায় দস্তখৎ করব না।

লায়েক আলি তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্বের গদীতে আবার জেঁকে বসলেন।

নিজাম আবার ফিরে গেলেন তাঁর পুরানো জায়গায়।

কিন্তু ভারত করবে কী?

সারা ভারত জুড়েই অস্বস্তি তখন দানা পাকিয়ে উঠেছে। সরকারের তীব্র সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে ভারতীয় প্রেস। ভারত সরকারের 'হচ্ছে-হবে' ভাবে কেউ খুসী নয়।

হায়দারাবাদ থেকে যারা পালিয়ে আসছে তাদের মুখ থেকে অত্যাচারের বীভৎস কাহিনী সব শোনা গেল। হায়দারাবাদ থেকে যে-সব ট্রেণ আসছে সশস্ত্র রাজাকার আর নিজাম সরকারের পুলিশ তাদের ওপরে হামলা করছে, লুঠপাট করছে তাদের। বাস্তুত্যাগীতে ভারতের সীমান্ত প্রায় ভরে উঠেছে। ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্যরাও সরকারের অকর্মণ্যতায় হই-চই সুরু করেছে।

কিন্তু কী করবে ভারত সরকার ?

যুদ্ধ ?

ভারত সরকার যুদ্ধের কথা ভাবছে না ; হায়দারাবাদ ভারতেরই একটি অঙ্গ। একটি অঙ্গের সঙ্গে আর একটি অঙ্গ যুদ্ধ করে না।

তাহলে, ভারত সরকার ভাবছে কী ?

পার্লামেণ্টের সদস্য থেকে সবার, অর্থাৎ, হায়দারাবাদ নিয়ে যাঁরাই কিছু চিন্তা করেন, মুখে ওই একই প্রশ্ন—ভারত সরকার করছে কী ?

একদল বলে বড় বাড় বেড়েছে নিজামের। এখনই তাকে শায়েস্তা করা উচিৎ।

আর একদল বলে—শায়েস্তা করতে গেলেই হায়দারাবাদের হিন্দু বিপন্ন হবে। কাশিম রেজভি তো আগেই বলে দিয়েছে একটি ভারতীয় সৈন্যও যদি হায়দারাবাদে ঢোকে তাহলে ওখানকার সব হিন্দুদের জবাই করা হবে। ভারতের হিন্দুরাও চুপ করে বসে থাকবে না ; তার বদলা নেবে। তখন সারা ভারত জুড়ে আবার সুরু হবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

পাকিস্তান আনন্দে হাততালি দেবে। বিদেশী প্রেস পৃথিবীর চার পাশে ভারতের বিরুদ্ধে জোর কদমে প্রচার কার্য চালিয়ে যাবে।

সত্যিই বড় ভাবনার কথা।

একদল বলে—যতই আমরা ভাববো ততই নিজাম শক্তিবৃদ্ধি করবে। সুতরাং যা করার ঝটপট করে ফেল। ল্যাঠা চুকে যাক।

আর একদল বলে—কাজটা অত সোজা নয়, যাদু। নিজামের বিমানবাহিনী আরবে ডিম পাড়ছে। সেই ডিম ফেটে ঝাঁকে-ঝাঁকে তারা উড়ে আসবে ভারতের আকাশে, লাখ-লাখ টন বোমা ফেলে উড়িয়ে দেবে বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, এবং একেবারে অসম্ভব না হলে, দিল্লীও।

ভারতে নিযুক্ত কিছু ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসার সায় দিয়ে বলে—সেই সঙ্গে হায়দারাবাদের স্থল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ৮'ফুট লম্বা এল এদ্রুসের কথাটা মনে রেখে। ভদ্রলোক একেবারে দুর্ধর্ষ। তাঁর হাতে কাটা সৈনিকও লাফিয়ে ওঠে।

তবু ভারত সরকার ভাবছে—ভাবছে—ভাবছে।

এদিকে লায়েক আলি আর একটি চাল চেলে বসলেন। সতেরই আগস্ট পণ্ডিত নেহেরুকে তিনি একখানি চিঠি দিলেন। সেই চিঠিতে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এক গোছা।

ভারতীয় য়ুনিয়ন স্থিতি-অবস্থার চুক্তিগুলি বারবার ভাঙছে।

চারপাশে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে হায়দারাবাদের জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সীমান্ত অঞ্চল থেকে ভারতীয় সেনারা হায়দারাবাদে ঢুকে সেখান কার নিরপরাধ মানুষদের ওপরে নির্যাতন চালাচ্ছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারত সরকার যখন হায়দারাবাদের কোন অভিযোগই গ্রাহ্যের মধ্যে আনছেন না; তখন ভারতের সঙ্গে আলোচনার বৈঠকে বসে আর লাভ নেই।

নিজাম বাহাদুর সেইজন্যে সমস্ত ব্যাপারটি রাষ্ট্রসংঘের নজরে আনার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রসংঘের সহযোগিতায় দুটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ বৃদ্ধি পাবে।

হায়দারাবাদের ডেলিগেশন যাতে রাষ্ট্রসংঘে যেতে পারে তার জন্যে ভারত সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করলে নিজাম বাহাদুর খুসী হবেন।

ভারত সরকার তাতে রাজি নয়।

কারণ, হায়দারাবাদের সমস্যা ভারতের ঘরোয়া সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান করতে গেলে দু'টি দলকেই তা করতে হবে। রাষ্ট্র-সংঘের সে-বিষয়ে নাক গলানোর কোন এক্তিয়ার নেই।

সুতরাং হায়দারাবাদী ডেলিগেশনকে কোন সাহায্য করতে ভারত সরকার রাজি নয়।

কিন্তু তাতে ডেলিগেশনকে আটকানো গেল না। নবাব ময়ন নওয়াজ যঙ-এর নেতৃত্বে ডেলিগেশনের সদস্যরা করাচী গেল, সেখান থেকে সোজা অ্যামেরিকাতে হাজির হল নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে।

৩১শে আগস্ট গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী নিজামকে একখানা চিঠি দিলেন। রাজাকারদের ক্রমবর্দ্ধমান অত্যাচারে হায়দারাবাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। রাজাকারদের দমন করুন। রাজাকারদের সংগঠনটিকে বেআইনী বলে ঘোষণা করুন। সেই সঙ্গে সেকেন্দ্রাবাদে ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে পুনরায় পাঠানোর অনুমতি দিন। তাহলেই হায়দারাবাদে আবার শান্তি ফিরে আসবে।

৫ই সেপটেম্বর নিজাম গভর্নর জেনারেলের চিঠির উত্তর দিলেন। হায়দারাবাদে জনজীবনের নিরাপত্তা যে বিঘ্নিত হয়েছে আপনার এ-সংবাদ ভুল। আর যদি তা হয়েই থাকে তার জন্যে আপনি

অনর্থক বিব্রত হবেন না। আমার সাম্রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব আমার এবং সেই দায়িত্ব সম্পাদন করার মত ক্ষমতা আমার নিজেরই রয়েছে। তার জন্যে ভারতীয় মিলিটারী পাঠানোর দরকার নেই।

লায়েক আলি আরও একটু কড়া সুরে বললেন: ভারতীয় য়ুনিয়নের টহলদারী সৈন্যদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েই রাজকারদের সংগঠন নেহাৎ আত্মরক্ষার তাগিদে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই গড়ে উঠেছে। আর আইন-শৃঙ্খলার কথা যদি বলা হয় তাহলে সেটা হল হায়দারাবাদের নিজস্ব ব্যাপার। তা নিয়ে ভারত সরকারের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

এর পরেও, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার অছিলায় হায়দারাবাদে যদি সৈন্য পাঠানো হয় তাহলে বুঝতে হবে ভারত সরকার স্থিতি-অবস্থার চুক্তি ভাঙতে বদ্ধ-পরিকর। এই ভাবে ভারত সরকারের ক্রমাগত অবন্ধুসুলভ ক্রিয়া কলাপের ফলে যদি কোন অবাঞ্ছিত পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে হায়দারাবাদ বাধ্য হয়, তাহলে তার সমস্ত দায় আর দায়িত্ব গিয়ে পড়বে ভারত সরকারের ওপরে।

অর্থাৎ, এক কথায় হায়দারাবাদে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় নি, হিন্দুদের ওপরে বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করা হয় নি। হিন্দুরা সব মিথ্যে কথা বলছে, খৃশ্চান মিশনারীরা মিথ্যে কথা বলছে; হিন্দু প্রেস আর হিন্দু রেড়িয়ো চব্বিশ ঘণ্টা মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়েছে। ভারত সরকার বর্তমানে তাদেরই একটি শিকার।

এখন ভারত সরকার করবে কী?

মাউণ্টব্যাটনের বুদ্ধিতে সেকেন্দ্রাবাদ থেকে সামরিক বাহিনী সরিয়ে আনাটাই ভুল হয়েছে।

সেই ভুলের মাশুল কত দিতে হবে কে জানে?

নিজাম সরকারের সঙ্গে আর আলোচনায় বসে কাজ হবে না; নিজামের নিজস্ব কোন কথা নেই। লায়েক আলি আর

কাশিম রেজভির ইত্তেহাদী দলই তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্বকে কুক্ষিগত করে রেখেছে।

এখন ভারত সরকারের কাছে একটি মাত্র পথই খোলা রয়েছে। সেই পথ ধরেই তাকে এগোতে হবে।

কিন্তু কবে, কখন ?

নয়ই সেপটেম্বর মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেল। হায়দারাবাদে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পাঠানো হবে।

কিন্তু তার আগে ভারতরক্ষা আইনের বলে সারা ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হল। ভারতের কোন অংশে যাতে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দেখা না দেয় সেইজন্যে এই ব্যবস্থা। প্রতিটি স্টেটে পুলিশ আর মিলিটারীকে সজাগ করে রাখা হল।

হায়দারাবাদকে শায়েস্তা করতে ক'দিন লাগবে ?

সামরিক বিভাগের মুখপাত্র জানালেন—সাত দিন।

তাড়াতাড়ি অভিযান শেষ করতে না পারলেই জটিলতা বাড়বে।

কিন্তু অভিযান সুরু হবে কবে ?

সর্দার প্যাটেল অপেক্ষা করছিলেন জিরো আওয়ারের জন্যে।

সেই আওয়ারটি এগিয়ে এল।

তেরই সেপটেম্বর সুরু হল 'অপারেশন পোলো'।

সময় তখন ভোর চারটে।

জেনারেল অফিসার কম্যানডিং, সাদার্ন কম্যানড, জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজির ওপরে এই পুলিশী অভিযানের সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হল। সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে একটি বাণীতে তিনি বললেনঃ শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে তোমরা এগিয়ে যাও। বাধা পেলে সেই বাধাকে তোমরা ধ্বংস করবে। যারা আইন-শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তাদের সবাইকে রক্ষা করবে তোমরা।

Go forward to your mission. Crush any resistence met and protect all law-abiding persons irrespective of religion, caste or creed.

ভারতীয় বাহিনী চারটি দলে বিভক্ত হয়ে চারটি দিক দিয়ে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করল।

প্রথম সাঁজোয়া বাহিনী [এবং এইটিই প্রধান বাহিনী] মেজর জেনারেল চৌধুরীর নেতৃত্বে সোলাপুর থেকে যাত্রা করল। দ্বিতীয় বাহিনী মাদ্রাজ সীমান্ত অতিক্রম করল মেজর জেনারেল রুদ্রের নেতৃত্বে। বোম্বাই সীমান্ত থেকে তৃতীয় বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললেন মেজর জেনারেল ডি-এস-ব্রার। এবং চতুর্থ বাহিনীটি হায়দারাবাদে ঢুকলো সি-পি, আর বেরার দিয়ে। এই দলের পরিচালক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার শিয়ো দত্ত সিং।

সকলেরই লক্ষ্য সেকেন্দ্রাবাদ।

আর এই সব কটি বাহিনীর পাহারাদার হিসাবে আকাশপথে চলল ভাইস মার্শাল সুব্রত মুখার্জির বোমারুগুলি।

নিজামের গুপ্তচরেরা দিল্লী থেকে যে সব গোপন সংবাদ সরবরাহ করত তাদেরই ভিত্তিতে লায়েক আলির দল বুঝতে পেরেছিল যে ভারতের অভিযান আসন্ন। তবে, খুব তাড়াতাড়ি করেও পনেরই সেপটেম্বরের আগে তা সুরু হবে না।

সেই হিসাব করেই কিছু অন্তর্ঘাতী কাজ করার জন্যে তারা লেঃ মুরকে নিয়োগ করেছিল। এই ভদ্রলোক আগে ছিলেন একজন ব্রিটিশ সৈনাধ্যক্ষ। পরে তিনি নিজামের সমরবিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। লেঃ মুর এক-জিপ ডিনামাইট এবং অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু সেতু উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। সেইগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে নলদুর্গের সেতু।

তেরই সেপটেম্বর সকালেই মুর সাহেব ধরা পড়লেন ভারতীয় বাহিনীর হাতে। ধরা পড়েই তিনি সব কবুল করে ফেললেন।

ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পরিকল্পনামত পনেরই আগস্ট বেরোলে হায়দারাবাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেতু ধ্বংস হয়ে যেত। ফলে অভিযান অতটা দ্রুত সফল হ'ত না। বেশী দেরী হলে হায়দারাবাদ হয়ত আর এক কাশ্মীরে পরিণত হ'ত।

নলদুর্গের ওপরেই রাজাকারদের ভরসা ছিল সব চেয়ে বেশী। ওইটিই ছিল হায়দারাবাদের ম্যাজিনো লাইন—নিজাম-রেজভির সবচেয়ে দক্ষ সৈনিকে বোঝাই। নিজামের সামরিক অফিসাররা বুক ফুলিয়ে বলত ওই নলদুর্গেই ভারতীয় বাহিনীর কবর খোঁড়া হবে।

নিজামের সেনাবাহিনী কোনদিন যে যুদ্ধ করেছে, অথবা, যুদ্ধ করে জিতেছে, এ-সংবাদ ইতিহাসের কোথাও নেই। তাদের যত বীরত্ব ওই নিরীহ দরিদ্র প্রজাদের কাছে। সেই প্রথম বোধ হয় সত্যিকার সামরিক বাহিনী দেখার সুযোগ হল তাদের; এবং সংঘর্ষ যতই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল ততই তাদের ধাত ছেড়ে যেতে লাগলো।

তবু নলদুর্গেই কিছুটা যা প্রতিরোধ এসেছিল। কিন্তু অগ্রগামী ভারতীয় বাহিনীর কাছে তা কিছুই নয়। নলদুর্গের পতনের পরেই সব ফর্সা। তারপরেই তারা দৌড়তে আরম্ভ করল; ঘাঁটি ছেড়ে পালালো, ব্যারাক ছেড়ে পালালো।

সামারিক বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ হ'তে দেখে, রেজভি রাজাকার বাহিনীকে পাঠালো গেরীলা যুদ্ধ করতে। কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর গোলার বহর দেখে তারাও পালালো পাঁই-পাঁই করে। যুদ্ধের পোশাক ছেড়ে দাড়ি কামিয়ে অসামরিক জনতার সঙ্গে মিশে গেল।

সবচেয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল হায়দারাবাদের সমরদপ্তরে। চেঁচামেচি আর হইচই ছাড়া অন্য কোন কাজই সেখানে হচ্ছিল না। কী করা উচিত তা কেউ বুঝতে পারছিল না। সৈন্যধ্যক্ষেরা যে যার ইচ্ছামত নির্দেশ দিতে লাগলো। সেই নির্দেশ পালন করার মত লোক কোথাও ছিল না। পরস্পরের সমালোচনায় উত্তেজিত হয়ে একদল আর এক দলের গায়ে কাদা ছিটোতে লাগল।

বড়-বড় অফিসাররা যুদ্ধক্ষেত্র বর্জন করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বসে রিপোর্ট তৈরী করল ; পাঠালো বেতারে। সেই ভুয়ো রিপোর্টের ওপরে ভিত্তি করে বেতারের মারফৎ ঘোষণা করা হল : ভারতীয় বাহিনীকে নানান ফ্রণ্টে হারিয়ে নিজাম-বাহিনী ভারতীয় য়ুনিয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে।

নিজাম সরকারের অতিথি হয়ে কিছু কিছু বিদেশী সাংবাদিক গ্রীনল্যানড হোটেলে বসে জামাই আদরে দিন কাটাচ্ছিল। হায়দারাবাদে পুলিশী অভিযান সুরু হ'তেই তারা বড়-বড় 'ডেসপ্যাচ' পাঠাতে লাগলো নিজেদের দেশের কাগজে :

পুলিশ অ্যাকসন !

আসলে ওটা সামরিক অভিযান। প্রতিবেশী স্বাধীন বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অনাবশ্যক এই আক্রমণ বর্বরোচিত সন্দেহ নেই।

দিকে-দিকে সেই বার্তা বিদ্যুতের মত নানান দেশে ছড়িয়ে পড়ল: ভারতবর্ষ হায়দারাবাদ আক্রমণ করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে স্বাধীনতা আজ বিপন্ন।

ইংলণ্ডের হাউস-অফ-কমন্সেও এই নিয়ে বিতর্ক সভা বসলো। স্যার অ্যাণ্টনী ইডেন এবং অনুরিন বিভান, প্রতিপক্ষ দু'টি দল-নেতাই বোধ হয় সেই প্রথম একই সুরে কথা বললেন—নিন্দা করলেন ভারতের আক্রমণকে।

নিরাপত্তা পরিষদেও হায়দারাবাদের প্রশ্নটিকে গ্রহণ করা হল।

দিকে-দিকে ছত্রভঙ্গ নিজাম বাহিনী, অর্থ ঢেলে তৈরি করা রাজাকার বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী। কোথাও তাদের কোন চিহ্ন নেই, একমাত্র গ্রীণল্যানড হোটেলের চারপাশ ছাড়া। সেখানে তখন ছিলেন ভারতীয় এজেনট জেনারেল কে-এম-মুন্সী। বোমা-কার্তুজ নিয়ে লরী বোঝাই রাজাকাররা উঁচু পর্দায় চিৎকার করতে করতে গ্রীণল্যানড-এর চারপাশে ঘুরতে লাগল : মুন্সীর মাথা চাই।

প্রধান সেনাপতি এল-এড্রুস স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন—ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

কিং কোঠির মধ্যে বসে নিজাম উসমান আলি খাঁ তখন কাঁপছেন।

তখন কি তাঁর শেষ মুঘল সম্রাট বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের কথা মনে পড়েছিল? দিল্লী অধিকার করে উন্মত্ত ইংরাজ সেনারা বাহাদুর শাহকে টেনে বার করার জন্যে লাল কেল্লার প্রতিটি কক্ষ তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছিল। তাঁকে কি ভারতীয় সেনারা সেইভাবে খুঁজে বেড়াবে?

মুঘল সাম্রাজ্যের মত আসফ ঝাহী বংশও কি তাঁরই সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের মানচিত্র থেকে একেবারে মুছে যাবে?

ষোলই সেপটেম্বর—গভীর রাত্রি।

আর ভারতীয় বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

ঠেকিয়ে রাখতে না পারলে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন ছাড়তে হবে তাঁকে।

তারপর?

কিন্তু সিংহাসনটা কি এখনও বাঁচানো যায় না?—মনে-মনে চিন্তা করলেন নিজাম উসমান আলি খাঁ।

মাউণ্টব্যাটন সাহেবের শেষ খসড়াটি মেনে নিলে হয়ত সিংহাসন বাঁচানো যাবে। সেকেন্দ্রাবাদে ভারতীয় সৈন্য রাখতে দিলে হয়ত সিংহাসন বাঁচবে। মন্ত্রী মণ্ডলীতে জনপ্রিয় নেতাদের নিলে হয়ত সিংহাসন বাঁচবে।

কিন্তু তার আগে লায়েক আলিকে পদত্যাগ করতে হবে; রেজভিকে করতে হবে নিয়ন্ত্রণ; রাজাকারদের বেআইনী বলে ঘোষণা করতে হবে।

তাহলে হয়ত সিংহাসনটা বাঁচানো যায়।

সিংহাসনের কাছে সব তুচ্ছ।

কিন্তু লায়েক আলি পদত্যাগ করতে রাজি নন। দিন দশেক সময় দিতে হবে তাঁকে।

কিন্তু অতদিন রাজ্য বাঁচলে তো তিনি তাঁর প্রধান মন্ত্রী থাকবেন।

লায়েক আলিকে বরখাস্ত-ও তিনি করতে ভরসা পাচ্ছেন না; কারণ, লায়েক আলিই তখন তাঁকে বরখাস্ত করে দেবেন।

একদিকে সমুদ্র, আর একদিকে শয়তান।

কী করবেন নিজাম?

ভারতের এজেনট জেনারেল কী বলেন?

ভারতের এজেনট জেনারেল মুন্সীজি বলেন মাউন্টব্যাটনের শেষ খসড়াটি আপনি সই করুন, লায়েক আলিকে বরখাস্ত করুন, রাজাকারদের সংগঠনটিকে বেআইনী বলে ঘোষণা করুন, স্টেট কংগ্রেসের সভাপতি এবং অন্যান্য কর্মীদের মুক্তি দিন; এবং কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে যুক্তি করে মন্ত্রীসভা গঠন করুন।

সতেরই সেপটেম্বর।

লায়েক আলির মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করল।

সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে নিজাম ভারতের গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর কাছে একটি বার্তা পাঠালেন;

আমার সরকার পদত্যাগ ক'রে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

মন্ত্রীসভার সদস্যদের আমি জানিয়েছি এই কাজটি কিছুদিন আগে করলে দুঃখের কিছু থাকতো না; এবং, এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে গঠনমূলক কিছু করার মত সময় আমার আর নেই। যাই হোক, আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই আমার সৈন্যেরা যাতে অস্ত্র সংবরণ করে সেই নির্দেশ আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। সেই সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর বোলারাম আর সেকেন্দ্রাবাদ ব্যারাকে বিনা বাধায় প্রবেশ করার সমস্ত ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি।

My Government has tendered its resignation, and asked me to take the political situation in my own hand completely.

In answer to this, I have informed them that I am sorry this was not done earlier and it is too late for me to do anything at this critical juncture. However, I inform your Excellency, that I have ordered cease-fire to my troops by this evening, and also have ordered to disband the Razakars and am allowing the Indian troops to occupy Bolaram and Secunderabad barracks. *

নিজাম সেই সঙ্গে আরও জানালেন যে তিনি নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করবেন, এবং স্যার মির্জা ইসমাইলকে প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। যদি ভারত সরকার তাতে রাজি হন তাহলে ইসমাইল সাহেবকে দিল্লী থেকে আনার জন্যে একটি চার্টার্ড প্লেন যাবে।

তার কিছু পরেই লায়েক আলি বেতার মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন: আজ সকাল থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে চরম বিরুদ্ধ প্রতিকূলতার

* K. M. Munshi : The End of an Era P. 226.

বিরুদ্ধে অনর্থক রক্তপাত করার কোন অর্থ নেই। ভারতীয় য়ুনিয়নের অস্ত্র, সাঁজোয়া আর বিমান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা আমাদের নেই। সব কিছু বিবেচনা করার পর মন্ত্রীপরিষদ পদত্যাগ করেছেন; এবং সমস্ত শাসনভার মাননীয় নিজাম বাহাদুরের হাতে তুলে দিতে মনস্থ করেছেন।

হায়দারাবাদের রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিলেন লায়েক আলি এবং তাঁর দোস্তরা।

বেতার ভাষণ শুনে পাকিস্তান তো অবাক।

একি বার্তা শুনি আজ মন্থরার মুখে?

হায়দারাবাদ রেডিয়ো প্রতিদিন খবর দিচ্ছে ভারতীয় বাহিনী ছিন্ন…ভিন্ন…বিপর্যস্ত নিজাম-বাহিনী সব তছনছ করে গোয়ার দিকে বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে…হঠাৎ একি বিপর্যয়!

শেষ পর্যন্ত "যুদ্ধ বিরতি" ঘোষণা করলেন নিজাম?

লায়েক আলির মন্ত্রী-পরিষদ পদত্যাগ করলেন?

শুধু আত্মসমর্পণ নয়, একেবারে বিনা শর্তে!

এর কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল?

করাচীর বিরাট জনতা বিক্ষুব্ধ…উদ্বেলিত।

ভারতবিরোধী ধ্বনি দিতে-দিতে জনতা ঘেরাও করল প্রধান মন্ত্রী লিয়াকাৎ আলি খাঁর প্রাসাদ।

কী চান আপনারা?

পাকিস্তান আর্মিকে এখনই ভারতবর্ষ আক্রমন করার নির্দেশ দেওয়া হোক।

লিয়াকৎ আলি শুনে তো অবাক!

ভারত আক্রমন করার মত শক্তি যে পাকিস্তানের নেই সেই কথাটা বিক্ষুব্ধ জনতাকে বোঝাতে সেদিন তাঁকে যথেষ্ট গলদঘর্ম হতে হয়েছিল।

সতেরই সেপটেম্বর নিজাম আলি খাঁ বেতারে ভাষণ দিলেন। তিনি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছেন। চক্রবর্তী রাজাগোপালচারীকে তিনি চিঠিতে যা লিখেছিলেন বেতারেও সেই কথাই বললেন। তিনি আরও জানালেন, রাষ্ট্রসংঘ থেকে তিনি হায়দারাবাদের কেশটি তুলে নিয়েছেন।

রাষ্ট্রসংঘে হায়দারাবাদের সদস্যরা হইচই সুরু করল ঃ এ কিছুতেই সম্ভব নয়। নিজামকে ভারতীয় বাহিনী বন্দী করে রেখেছে। বন্দী অবস্থায় তাঁকে যা বলানো হচ্ছে তাই তিনি বলছেন।

কিন্তু তখনও ভারতীয় বাহিনী হায়দারাবাদে ঢোকে নি। ভারতীয় বাহিনী হায়দারাবাদে ঢুকেছে আঠারোই সেপটেম্বর—অভিযান সুরু হওয়ার একশ আট ঘণ্টা পরে।

মেজর জেনারেল চৌধুরী আঠারোই সেপটেম্বর সামরিক প্রশাসক হিসাবে হায়দারাবাদের শাসনকার্য গ্রহণ করলেন।

শাসনভার গ্রহণ করার ঠিক পরেই শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হল, জনসাধারণকে নির্দেশ দেওয়া হল তারা যেন শান্তিপূর্ণ-ভাবে চলাফেরা করে; আইন আর শৃঙ্খলা ভাঙার কোন রকম চেষ্টা না করে এবং সামরিক প্রশাসকের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে।

সেই সঙ্গে লায়েক আলি এবং তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের গ্রেপ্তার ক'রে গৃহে অন্তরীণ রাখারও নির্দেশ গেল। সমাজবিরোধী আর হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত এমন হাজার হাজার রাজাকারদের গ্রেপ্তার করা হ'ল। কাশিম রেজভিকে গ্রেপ্তার করা হল ১৯শে সেপটেম্বর তারিখে।

কাশিম রেজভির ভবিষ্যৎ কী হবে কোন সংবাদদাতা জানতে চাইলে মেজর জেনারেল চৌধুরী একটু হেসেই বললেন ঃ রেজভির সখ ছিল দিল্লীর লালকেল্লায় যাওয়ার। সেইখানেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে।

সে যাই হোক, সব চেয়ে দুর্ভাবনার কথা ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আনন্দের বিষয় হায়দারাবাদ নিয়ে ভারতের কোথাও কোন দাঙ্গা বাঁধে নি।

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন হায়দারা-বাদ স্টেটটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এর বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পাশাপাশি ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে গেল মিশে।

একটি রাজ্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগের সমাপ্তি ঘটলো।

এক ধর্ম রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দেব আমি।

শিবাজি মহারাজার সেই স্বপ্ন কি শেষ পর্যন্ত সফল হবে?

বারবার বন্ধনের পাশ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছে।

দেশীয় রাজাদের নিয়ে কী ঝামেলায় না পড়তে হয়েছে ভারত-সরকারের?

বরোদার মহারাজা মেজর জেনারেল ফারজানন্দ-ই-খাস-ই-দৌলত-ই-ইংলিসিয়া [ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রিয় পুত্র], স্যার প্রতাপ সিং গাইকোয়াড়, সেনা খাস খেল, শামসের বাহাদুর শেষ রাত্রিতে বাহাদুরকা খেল দেখাতে সুরু করেছেন।

অথচ, এই স্যার প্রতাপ সিং গাইকোয়াড়ই প্রথম ভারতীয় মহারাজা যিনি ১৯৪৭ সালে কনসটিটিউয়েনট অ্যাসেম্বলিতে যোগ দেওয়ার জন্যে তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন; এবং পনেরই আগস্টের মধ্যে যে-সব রাজা-মহারাজা ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করেছিলেন ইনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। কেবল নিজেই সই করেন নি, সই করার জন্যে অন্যান্য রাজা-মহারাজাদেরও উৎসাহিত করেছিলেন।

সেদিন চারপাশেই ধন্যি-ধন্যি পড়ে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, স্যার শয়াজি রাও-এর উপযুক্ত বংশধর বটে।

এ-হেন স্যার প্রতাপ সিং গাইকোয়াড় অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করার কালি শুকোতে না শুকোতে এ-রকম গাওনা সুরু করলেন কেন?

কারণ, তাঁর সখ হয়েছে রাজচক্রবর্তী হওয়ার, যে-রাজ্যটিকে তিনি সোজা পথে দান করেছেন তার চেয়ে অনেক বড় একটি রাজ্য তিনি বাঁকা পথে ফিরিয়ে আনতে চান।

কিন্তু ভাগ্যের মার দুনিয়ার বার।

রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিয়াছিল যে সে বাঁচিয়া

আছে ; বরোদার মহারাজা প্রতাপ সিংহ গাইকোয়াড় বাঁচিবার চেষ্টায় প্রমাণ করিলেন যে তিনি মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছেন।

কথায় বলে, মরা হাতি লাখ টাকা। প্রতাপ সিং রাজার ছেলে ; রাজা নয়, মহারাজা। কেবল মহারাজা নয়, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রিয় পুত্র।" স্বাধীন ভারতে তাঁর যদি রাজচক্রবর্তী হওয়ার সখ জাগে তাহলে দোষটা কোথায় ?

ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দলিলে তিনি সই করেছিলেন সত্যি কথা ; তাই বলে কি তিনি তাঁর সর্বস্বত্ব বিকিয়ে দিয়েছিলেন, না, তাঁর ধমনীর নীল রক্ত রাতারাতি লাল হয়ে গিয়েছিল ? তিনি কি একটা হেঁজিপেঁজি মানুষ ! স্যার শয়াজি রাও ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রিয় পুত্র। তাঁর বংশধর ছিলেন স্যার প্রতাপ সিং। প্রাচীন ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক এই রাজ্যটিকে সব দিক থেকে সমৃদ্ধিশালী করতে রাও সাহেব কম চেষ্টা করেন নি। আট হাজার দু'শ ছত্রিশ বর্গমাইল পরিধি বিশিষ্ট এই রাজ্যটির বার্ষিক রাজস্ব ছিল সাত কোটি টাকার মত। বাঘা বাঘা দেওয়ান রেখে শয়াজি রাও বরোদাকে একেবারে ঢেলে সেজেছিলেন।

সেই বংশের বংশধর স্যার প্রতাপ সিং গাইকোয়াড়। দম্ভ দেখানোর যোগ্যতা ছিল তাঁর। দাক্ষিণ্য দেখানোর মত হৃদয় তাঁর চেয়ে বড় ছিল কার ?

স্বাধীন ভারতের মত শিশু রাষ্ট্রকে বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্যেই তিনি তাঁর বরাভয় হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ; কিন্তু সর্দার প্যাটেল সেই হাতে এমন একটি মোচড় দিলেন যে সেই হাতটি মচ্ ক'রে ভেঙে গেল। আর তা জোড়া লাগে নি।

ঘটনাটা ঘটেছিল উনিশশো সাতচল্লিশ সালের সেপটেম্বর মাসে। জুনাগড়ের নবাব স্যার মহব্বত খাঁ রসুল খঞ্জিকে নিয়ে তখন স্বাধীন ভারত-সরকারের রীতিমত গলদঘর্ম সুরু হয়েছে। অনেক ভেলকি খেলে নবাব শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

খবরটা জানাজানি হওয়া মাত্র কাথিওয়াড় অঞ্চলে হিন্দুরাজ্যগুলি একজোটে চিৎকার করতে সুরু করল; এর একটা বিহিত করার জন্যে নালিশ জানাল ভারত সরকারের কাছে। নতুন পরিস্থিতিতে কেমন করে ওই সব অঞ্চলে নিরাপত্তা বজায় রাখা যায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় সে-সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলেছিল। এরই এক ফাঁকে স্যার প্রতাপ সিং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বৃহৎ ভারতেরই স্বার্থের খাতিরে সর্দার প্যাটেলকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। কাথিওয়াড় অঞ্চলের সামগ্রিক এবং প্রশাসনিক নিরাপত্তা কীভাবে অটুট রাখা যায় সেই সব বিষয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত একটি পরিকল্পনা দাখিল করেছিলেন।

সেই চিঠিতে সর্দার প্যাটেলকে যুগপৎ সাহস আর সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, মা ভৈতব্যম। জুনাগড়ের পরিস্থিতি নিয়ে আপনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। আমার পরিকল্পনা মত কাজ করতে রাজি হলে কাথিওয়াড়ের নিরাপত্তা এতটুকু বিঘ্নিত হবে না। আইন আর শৃঙ্খলা বজায় রাখার সমস্ত দায় আর দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নেব।

সাধু, সাধু।

কাঠবিড়ালীও তো শ্রীরামচন্দ্রের বিপদ দেখে এগিয়ে এসেছিল। স্যার প্রতাপ সিং গাইকোয়াড় কাঠবিড়ালী নয়; মহারাজা। তিনি যে ভারত সরকারের বিপদে সাহায্যের ডালি নিয়ে এগিয়ে আসবেন তার চেয়ে সাধু প্রস্তাব আর কী রয়েছে?

কিন্তু ডালিটিতে রয়েছে কী?

প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে: কাথিওয়াড় অঞ্চলে যে ছ'টি এজেনসী রয়েছে সেগুলিকে সব বরোদা স্টেটের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই ছ'টি এজেনসীর নাম হচ্ছে, মহিকান্তা, রেওয়াকান্তা, সবরকান্তা, পালানপুর, পশ্চিম ভারতীয় স্টেটগুলি এবং গুজরাট।

কেবল দায়িত্ব দিলেই হবে না, কিছু ক্ষমতাও দিতে হবে।

যথা ?

বর্তমানে ভারতীয় ডোমিনিয়ন এগুলির ওপরে যে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করছে সেই সব ক্ষমতা তুলে দিতে হবে বরোদার মহারাজার হাতে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে : বিশেষ জরুরী অবস্থা দেখা দিলে সৈন্য আর রসদ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে হবে।

তৃতীয় প্রস্তাব হচ্ছে : বরোদার মহারাজাকে গুজরাট এবং সমগ্র কাথিওয়াড়ের রাজা ব'লে ঘোষণা করতে হবে। কেবল রাজা বলে ঘোষণা করলেই হবে না, সার্বভৌম ক্ষমতা দিতে হবে তাঁকে।

চতুর্থ প্রস্তাব হচ্ছে : প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক দপ্তর, এবং যানবাহন যে তিনটি বিষয় ভারতীয় ডোমিনিয়নের হাতে রয়েছে, এবং যে কটির ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তির দলিলে ভারতীয় রাজ্যগুলি সই করেছে সেগুলির দায়িত্ব তুলে দিতে হবে তাঁর হাতে।

আর কিছু ?

না ; আর কিছু নয়।

অর্থাৎ, ওইটুকু পেলেই তিনি গোটা কাথিওয়াড় অঞ্চলে শান্তি আর শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব নিতে পারবেন।

সেই সঙ্গে তিনি আশ্বাসও দিলেন যে ভারতীয় য়ুনিয়নের তিনি কেবল "বিশ্বস্ত বন্ধু"ই থাকবেন না, ভারতীয় য়ুনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েই থাকবেন।

এক কথায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি হাতে নিয়ে রাজচক্রবর্তীর আসনে ব'সে ভারত-সরকারের সঙ্গে তিনি মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চান।

চিঠি পেয়ে সর্দার প্যাটেলের চোখ তো ছানাবড়া। স্যার প্রতাপ সিং গাইকোয়াড়ের কি মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে ?

না, না ; বিকৃত হবে কেন ? বরং অনেক উর্বর হয়েছে।

আসল কথাটা হল, হায়দারাবাদের নিজামের সঙ্গে তিনি পাল্লা দিতে চেয়েছিলেন। একজন ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ প্রতিভূ; আর একজন হচ্ছেন মারাঠা শক্তির ধ্বংসাবশেষ। একজন চেয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের ওপরে প্রভুত্ব বিস্তার করতে; আর একজন চেয়েছিলেন পশ্চিম ভারতের ওপরে প্রভুত্ব বিস্তার করতে।

রাজায় রাজায় কোন ভেদ নেই। কোন জাত নেই রাজাদের।

বেশ কড়া ভাষাতেই সে চিঠির উত্তর পাঠালেন সর্দার প্যাটেল। সে চিঠির সারমর্ম হচ্ছেঃ আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আপনার সাহায্যের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। নিজের ঘর সামলানোর ক্ষমতা ভারত-সরকারের রয়েছে।

অন্য কথায়, আপনি নিজের চরখায় তেল দিন।

সত্যি কথা বলতে কি, কোন্ দিন নিজের চরখায় তিনি তেল দেন কি?

১৯৩৯ সালে বরোদার সিংহাসনে বসার পরে ওই যা ক'টি বছর [পূর্বপুরুষদের কপালের দোষে বলতে পারেন] তিনি মোটামুটি দায়িত্বশীল ভাবে রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন। তারপর থেকেই একটানা তিনি নিজের চরখায় তেল দিয়ে চলেছেন। সেই তেলের মহিমায় বারবার তাঁর পা পিছলে গিয়েছে, পিছলাতে পিছলাতে শেষ পর্যন্ত দুর্ভাগ্যের আস্তাবলে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন।

প্রথমেই ধরুন বিয়ের কথা। তাঁর প্রথমা মহিষী ছিলেন মহারানী শান্তা দেবী। মহারাজার ঔরসে তাঁর আটটি সন্তান জন্মেছিল। ১৯৪৩ সালে আবার তিনি বিয়ে করলেন। এঁর নাম সীতাদেবী। ভদ্রমহিলার আগের পক্ষের স্বামীও ছিলেন, একটি ছেলেও ছিল। স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ভদ্রমহিলা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার কিছু পরেই আর্যসমাজ মতে আবার তিনি হিন্দু হয়ে যান। তারপরেই মহারাজা তাঁকে বিয়ে করেন।

রাজার ছেলে এবং মহারাজা আর একবার বিয়ে করবেন এ এমন

একটা বড় কথা নয় ; কিন্তু বিপদ হচ্ছে, তখন বরোদা স্টেটে প্রথমা স্ত্রী জীবিতা থাকতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করাটা ছিল আইনত অসিদ্ধ। কিন্তু তাতে কোন অসুবিধে হয়নি মহারাজার। এতদিনকার রীতি, আইন, আর প্রচলনটিকে মহারাজা একটি কলমের খোঁচায় নাকচ করে দিলেন। প্রথমা স্ত্রী জীবিতা থাকতেও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করাটা বরোদা স্টেটে আইনত সিদ্ধ হয়ে গেল। সিদ্ধ তো হল ; কিন্তু মহারানী শান্তা দেবী জীবিতা থাকা অবস্থায়, আবার বিয়ে করাটা স্টেটের জনসাধারণ বেশ ভাল চোখে দেখলো না। বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। সবাই বুঝতে পারলো যে নিজের সুবিধের জন্যে মহারাজা একটি অসিদ্ধ আইনকে সিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। ব্রিটিশ-সরকারও আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহটিকে স্বীকার করে নেয় নি ; ভারত সরকারও না।

তারপরে ধরুন ভাতা। এতদিন ভাতা হিসাবে মহারাজা রাজকোষাগার থেকে বছরে নিতেন তেইশ লক্ষ টাকা। ১৯২৪ সাল থেকে সেই ভাতা বাড়িয়ে করলেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। ভূতপূর্ব মহারাজার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, রাজকোষাগার বা স্টেটের কোন সরকারী তহবিল থেকে, কোন মহারাজা বাড়তি কোন টাকা নিতে পারবেন না। মহারাজা স্যার প্রতাপসিং সে নির্দেশ অগ্রাহ্য ক'রে বিভিন্ন সরকারী তহবিল থেকে মোটা-মোটা টাকা অগ্রিম নিতে লাগলেন।

প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না কারও।

তার কারণও একটা ছিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের আগে "প্যারামাউণ্ট পাওয়ার," অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের হাতে ক্ষমতা ছিল তিনটি : প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক, আর যানবাহন। সেই তিনটি দায়িত্ব ভারত-সরকারের হাতে তুলে দিয়ে দেশীয় রাজারা ভারতীয় য়ুনিয়নের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করেছিলেন। অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনতার পূর্বে তাঁরা

যে-সব অধিকারগুলি ভোগ করতেন সেই সব অধিকারগুলি স্বাধীনতার পরেও তাঁরা আগের মতই ভোগ করতে লাগলেন। ভারত-সরকার সেগুলির ওপরে কোন হাত দেয় নি।

সুতরাং রাজ্যশাসন করার দায়িত্ব ছিল রাজাদের। তাঁরাই নিজ-নিজ স্টেটের হর্তাকর্তা-বিধাতা। আইন করতেন রাজারা, আইন ভাঙতেন রাজারা। তাঁদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস প্রজাদের ছিল না।

অন্যান্য দেশীয় রাজাদের মধ্যে বরোদা স্টেটটি আধুনিক রাজ্যের মর্যাদাসম্পন্ন হলেও, মূল নীতি আর রীতির দিক থেকে দুই-এর মধ্যে কোন ফারাক ছিল না।

কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করার পর থেকেই অন্যান্য এলাকার মত বরোদাতেও জনপ্রিয় এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্যে আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলো।

অনেক দর কষাকষির পরে মহারাজা স্টেটে একটি জনপ্রিয় সরকার গঠন করতে রাজি হলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি নতুন শাসনতন্ত্রও চাই।

ঠিক হল, শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্যে একটি কনসটিটিউয়েনট অ্যাসেমবলি বসবে। সেই অ্যাসেমবলি সাময়িকভাবে আইন পরিষদের কাজ করবে।

কিন্তু এই পরিষদের কতকগুলি বিষয়ে কোন এক্তিয়ার থাকবে না। মহারাজার ভাতা, আর ক্ষমতা, এবং তাঁর সম্বন্ধে কোন আইন তৈরি করার ক্ষমতা তার থাকবে না; সেই সঙ্গে থাকবে না আইন পরিষদ ডাকা বা তা ভেঙে দেওয়া সম্বন্ধে কোন নীতি নির্ধারণ করার ক্ষমতা।

অর্থাৎ, মহারাজা থাকবেন আইন পরিষদের ওপরে।

কংগ্রেসের তরফ থেকে দরবার গোপাল দাশ আর স্টেট দপ্তরের তরফ থেকে ভি-পি মেননের সঙ্গে যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে

মহারাজা উপরি উক্ত শর্তে পুরানো শাসনতন্ত্র নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন।

এই চাওয়ার মধ্যে মহারাজার হৃদয় পরিবর্তনের কোন ইঙ্গিত তো ছিলই না ; এমন কি গণতান্ত্রিক শাসন সংস্কারের নামে তাঁর এই ভাঁওতাবাজিতে প্রজারাও মোটেই খুসী হয় নি। ভারত-সরকারও তা জানতো। তবু, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। ছাই দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি হাতের মুঠি খুলে যায় এই রকম একটা দুরাশা তখন অনেকেই করেছিল।

কিন্তু সেটুকুই বা কোথায় হল ?

সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল মহারাজার কাছ থেকে কবে ঘোষণা বেরোয়।

আজ বেরোচ্ছ, কাল বেরোচ্ছে—করতে-করতে চারটি মাস কেটে গেল। জনসাধারণ যখন নতুন আন্দোলনের জন্যে তোড়জোড় করছে এমন সময় একটি "ঘোষণা" দিলেন মহারাজা প্রতাপ সিং গাই-কোয়াড়।

ওমা ! এ আবার কোন্ দেশী ঘোষণা !! ভি-পি মেনন, দরবার গোপাল দাশ, সর্দার প্যাটেল—সবাই অবাক ! তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় মহারাজা শাসন সংস্কারের যে মূলনীতিগুলি মেনে নিয়েছিলেন ঘোষণায় সে-সবের কোন উল্লেখ নেই, বা সেগুলি মহারাজার সুবিধেমত যথারীতি বিকৃত হয়েছে।

স্টেট দপ্তরের কাছ থেকে এই ঘোষণার প্রতিবাদ গেল।

মহারাজা সেই প্রতিবাদ গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না ; বরং উলটো চাপ দিলেন স্টেট দপ্তরের ওপরে। স্টেট দপ্তর তাঁর ওপরে অনাবশ্যক উৎপীড়ন চালিয়েছে। এর প্রতিকার চাই।

সর্দার প্যাটেল একটি বেশ কড়া চিঠি পাঠালেন মহারাজার কাছে। অনেক কথার মধ্যে তিনি লিখলেন : জুনাগড় নিয়ে আমরা যখন বিশেষ অসুবিধের মধ্যে পড়েছিলেম তখন আপনি নিজের কোলে

ঝোল টানতে চেয়েছিলেন। আমাদের বিপদের সুযোগ নিয়ে আপনি স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজচক্রবর্তী হওয়ার। সেই কথাটা আপনাকে স্পষ্ট-ভাবে জানিয়ে দেওয়ায় আপনি বলেছিলেন যে আপনার দেওয়ান স্যার বি-এল-মিটারই নাকি আপনাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিলেন। স্যার মিটার আপনার সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

বরোদা রাজ্যের শাসন-সংস্কার নিয়ে ভি পি মেনন আর দরবার গোপাল দাশের সঙ্গে আপনার যে-সমস্ত আলোচনা হয়েছিল, এবং যে বিষয়গুলি কার্যকরী করার জন্যে আপনি স্বীকৃত হয়েছিলেন, আপনার বর্তমান ঘোষণাটিতে সে-সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত নেই। থাকলেও, তা বিকৃত হয়েছে। ডঃ জীবরাজ মেহ্‌টাকে আপনার অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রীপরিষদের দেওয়ান করার কথা ছিল। আজ পর্যন্ত তা কার্যকরী হয় নি।

আপনি গর্ব করে বলেছেন ভারতীয় রাজাদের মধ্যে আপনি নাকি সব চেয়ে বেশী প্রগতিশীল। আপনার বরোদা স্টেটে জনসাধারণ নাকি অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে ভারতের অনেক রাজ্যেই অনেক আগেই বরোদার চেয়ে অনেক ভাল, অনেক প্রগতিশীল শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সংগঠিত হয়েছে। সেখানকার রাজারা নিজেদের ইচ্ছায় প্রগতির সঙ্গে সমান তালে চলা আর দেশকে চালানোর জন্যে পা বাড়িয়েছেন; আপনি পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন জনসাধারণের জোরালো আন্দোলনের চাপে পড়ে।

শেষ কথা বলে দিলেন সর্দার প্যাটেল: দেওয়ালের লিখন যদি আপনি পড়তে না চান তাহলে আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

অতএব সাবধান।

এর কোন জবাব আসে নি মহারাজার কাছ থেকে। তবে, চিঠি পাওয়ার পরেই ডঃ জীবরাজ মেহ্‌টাকে তিনি অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রীপরিষদের প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন।

কিন্তু ওই পর্যন্ত।

মন্ত্রী পরিষদের নাম তিনি ঘোষণা করলেন না। ডঃ মেহ্‌টা অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম দাখিল করা সত্ত্বেও তালিকাটি অনুমোদন না করেই মহারাজা য়েরোপে পাড়ি জমালেন। ডঃ মেহ্‌টার কাছ থেকে পূর্ণ মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার তাগিদ বারবার যাওয়া সত্ত্বেও, তিনি কোন সাড়াশব্দ দেন নি ; চুপচাপ বসেছিলেন।

মহারাজার জনপ্রিয় (!) মন্ত্রিপরিষদের খাসমহলে ডঃ মেহ্‌টাই কেবল ধুনি জ্বালিয়ে বসে রইলেন।

সময়টা হল ১৯৪৮ সালের মে জুন মাস।

ডঃ মেহ্‌টা সরকারী কাগজপত্র ওলটাতে লাগলেন। ওলটাতে-ওলটাতে তাঁর চোখ দুটি স্থির হয়ে গেল এ কী কাণ্ড! ভাতা হিসাবেই মহারাজা বার্ষিক কেবল পঞ্চাশ লক্ষ [আগে ছিল তেইশ লক্ষ] টাকা নিচ্ছেন না, তা ছাড়া, রাজকোষাগার থেকে ক্রমাগত টাকা নিয়ে চলেছেন। আরও মজার কথা, মহারাজা প্রথমে এই টাকা ধার হিসাবে নিয়েছিলেন ; কিন্তু জনপ্রিয় মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ঘোষণা করার ঠিক আগে তিনি এই মর্মে একটি নির্দেশ জারি করলেন যে হিস হাইনেশের নামে যে সব সরকারী ঋণ লেখা রয়েছে সেগুলি সব যথারীতি খরচ করা হয়েছে। সেই জন্যে সেগুলি সব খরচের খাতে লেখা হবে।

অর্থাৎ, সরকারের কাছে মহারাজার দেয় আর কিছু রইল না।

এই টাকার পরিমাণ কত ?

মোটামুটি ভাবে যা দাঁড়ায়·তা হ'চ্ছে এই ঃ

প্রথম দফায় ২২০ লক্ষ। দ্বিতীয় দফায় ১০৫ লক্ষ। তৃতীয় দফায় ৬৫ লক্ষ, এবং চতুর্থ দফায় ৪০ লক্ষ।

এছাড়া খবর পাওয়া গেল যে মহারাজা তাঁর দামি-দামি মণি-মুক্তাগুলি বিক্রী ক'রে দিচ্ছেন ; কিছু কিছু পাচার করছেন য়েরোপে।

কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ল। সে-সাপের দৈর্ঘ কতবড় তা জানতে গেলে আরও গর্ত খুঁড়তে হবে।

ডঃ জীবরাজ মেহ্‌টা আইন পরিষদের সদস্যদের কাছে ঘটনাটি প্রকাশ করে দিলেন।

সদস্যরা তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

যে স্টেটের বার্ষিক রাজস্ব মোটে সাতকোটি টাকা, সেখানে একা মহারাজাই যদি অত টাকা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করেন তাহলে উন্নয়ন মূলক কাজ হবে কোথা থেকে?

এরই নাম প্রগতিশীল স্যার প্রতাপ সিং গাইকোয়াড়!

কিন্তু উপায় কী? মহারাজার গায়ে হাত দেওয়ার অধিকার তো আইন-পরিষদের নেই।

কী করা যায়, কী করা যায় ভাবতে-ভাবতে শেষ পর্যন্ত একটা পথের হদিশ পাওয়া গেল।

আইন না থাক, নীতি তো একটা রয়েছে, যৌক্তিকতা বলে একটা বস্তু রয়েছে।

সেই নীতি অথবা যৌক্তিকতার ওপরে নির্ভর করে আইন পরিষদের অধিকাংশ সদস্য দুটি পৃথক পৃথক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এই প্রস্তাব দুটি তাঁরা আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করলেন না, করলেন জনসাধারণের তরফ থেকে স্টেটের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা চিন্তা করে।

প্রথম প্রস্তাবে বলা হল: মহারাজা প্রতাপ সিং গাইকোয়াড় রাজ্য শাসন করার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বিকৃত এবং জনস্বার্থবিরোধী ক্রিয়াকলাপের ফলে তিনি জনসাধারণের আস্থা হারিয়েছেন।

সুতরাং তাঁকে শাসনভার পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হোক।

সেই শূন্য স্থানে বসানো হোক তাঁর নাবালক পুত্র ফতেহ্‌ সিংকে। যতদিন পর্যন্ত ফতেহ্‌ সিং সাবালক না হন ততদিন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগ করা হোক।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আরও মারাত্মক।

মোটামুটি ভাবে দেখা যাচ্ছে মহারাজা ছ'কোটি টাকা নয়-ছয় করেছেন। এ-ছাড়া আরও কত কী করেছেন তা ভগবান জানেন। সমস্ত ব্যপারটি ভাল করে অনুসন্ধান করার জন্মে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হোক।

প্রস্তাব দুটি ভারত-সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলা হল অনু-সন্ধানের পরে ভারত-সরকার যেন মহারাজার বিরুদ্ধে প্রয়োজন বোধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

তাতেই কাজ হল।

য়েরোপ থেকে সোজা দিল্লীতে হাজির হলেন মহারাজা প্রতাপ সিং ; দেখা করলেন সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে।

পাঁকে পড়লে ঐরাবতের অবস্থাও কাহিল হয়ে দাঁড়ায়, প্রতাপ সিং তো নস্যি।

আবার আলোচনা স্থুরু হল।

অনতিবিলম্বে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করতে রাজি হলেন মহারাজা।

ভাল কথা। কিন্তু আপনি যে যখন-তখন প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ছেন, মাসের পর মাস বিদেশে কাটাচ্ছেন তার ফলে রাজ্যশাসনে অস্থবিধে হচ্ছে।

সে কথা ঠিক। তবে সে-অসবিধে দূর করতেও আমি বদ্ধপরিকর। যতদিন বাইরে থাকবো ততদিন আমার দায় আর দায়িত্ব বহন করার জন্মে একটি কাউনসীল তৈরি করব। সেই কাউন-সীলে থাকবেন দেওয়ানজি, আমার আইন মন্ত্রী, এবং মহারাণী শান্তাদেবী।

সরকারী তহবিল থেকে আপনি যে ছ' কোটি টাকা ধার নিয়েছেন তার কী হবে?

সে-সব টাকা আমি ফিরিয়ে দেব।

আর মূল্যবান হীরা-মুক্তা-জহরৎ—যেগুলি আপনি জওহরখানা থেকে সরিয়েছেন?

সেগুলি তো আমার নিজস্ব সম্পত্তি।

আপনার নিজস্ব নয়, রাজবংশের।

মহারাজা একটু ঘাড় নেড়ে বললেন: বেশ, তাও ফিরিয়ে দেব।

কিন্তু তার আগে দরকার জওহরখানায় কী ছিল, আর বর্তমানে কী রয়েছে তার একটা হিসাব করা। সেই অনুসন্ধান করার জন্যে প্রস্তাব এল যে ভারত সরকার একজন অফিসার নিয়োগ করবে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন মহারাজা।

বেশ বোঝা গেল মহারাজা আকণ্ঠ পাঁকের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছেন।

সব মিটমাট হয়ে গেল।

ভারত সরকারের একজন উচ্চ পদস্থ হিসাব পরীক্ষক হাজির হলেন বরোদা স্টেটে। তখনই বোঝা গেল মহারাজা কত গভীর জলের মাছ। তালিকা তৈরি করার জন্যে হিসাব পরীক্ষককে তিনি এতটুকু সাহায্য করলেন না।

করবেন কী ক'রে? অনেক মূল্যবান পাথরই তখন হাওয়া হয়ে গিয়েছে। সেগুলির মধ্যে ছিল বিখ্যাত সাত-পাপড়ি মুক্তোর হার, তিনটি মহামূল্যবান পাথর, স্টার অফ সাউথ, ইউজিন, শাহী আকবর। তা ছাড়া, দু'টি মুক্তোর কার্পেট। মহারাজা সেগুলি য়েরোপে চালান করে দিয়েছেন। বরোদা স্টেটের নীতি অনুসারে যেহেতু ওগুলি রাজবংশের, সেইজন্যে মহারাজা প্রতাপ সিংকে নির্দেশ দেওয়া হল অনতিবিলম্বে সেগুলি ফিরিয়ে আনার।

এদিকে নবগঠিত মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে মহারাজার মোটেই বনিবনা হচ্ছিল না। সবাই জানতো মহারাজার ফণায় কোন বিষ নেই। তাঁর বিষদাঁত ভেঙে গিয়েছে। দৈনন্দিন রাজকার্য নিয়ে কোন মন্ত্রীই প্রায়

তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন না, পরোক্ষে সবাই টিটকিরি দেন তাঁকে। রাজার সঙ সেজে সিংহাসনে বসে থাকতে সখ নেই তাঁর।

সময়ের চাকা ঘুরেছে।

ভি-পি মেনন বললেন: এ সব ঝুট ঝামেলার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আপনার লাভ নেই। ও-আপদ বিদেয় করে দিন।

কী রকম?

বরোদাকে বোম্বাই-এর সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

প্রতাপ সিং এতটা আশা করেন নি। হাজার হোক, এটা তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি। এর অস্তিত্ব তিনি একেবারে লোপ করে দেবেন?

ভি-পি মেনন অনেক বোঝালেন। এতে আপনার আপত্তি করার কিছু নেই। প্রথমত, যে সম্মান আর প্রতিপত্তি নিয়ে এতদিন আপনি রাজত্ব করেছিলেন আজ তার কিছুই নেই। ১৫ই আগস্টের পর থেকে এখন সব রাজারাই কলের পুতুল। মন্ত্রী-পরিষদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার অধিকার তাঁদের নেই।

দ্বিতীয়ত, আপনার রাজ্যটির কিছু অংশ অন্য স্টেটের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

তৃতীয়ত, আপনি নিজে মারাঠা; কিন্তু আপনার স্টেটের অধিকাংশ প্রজাই হলেন গুজরাটি, ভাষায় দিক থেকে ভিন্ন গোষ্ঠির।

চতুর্থত, আপনি জোর করে বলতে পারেন না যে এই ভাষার ওপরে ভিত্তি করে বরোদার প্রজাদের মধ্যে কোন রকম অন্তর্বিরোধ বাঁধবে না। যদি বাঁধে, তাহলে রাজকার্য পরিচালনা করা আপনার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।

ভি-পি মেননের কথার সারমর্ম হচ্ছে—মধু যখন নেই তখন মৌচাকে হাত ঢুকিয়ে লাভ কী?

তার চেয়ে বোম্বাই-এর সঙ্গে বরোদাকে মিশিয়ে দিন: সব ঝক্কি চলে যাক ভারত সরকারের হাতে। আপনি মোটা বার্ষিক ভাতা,

আর ব্যক্তিগত সম্পদ নিয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান। পুতুল রাজা হয়ে আপনার লাভটা কী?

মহারাজা ভাবলেন; বললেন: আচ্ছা ভেবে দেখি। তবে মহারানী শান্তা দেবীর সঙ্গে যুক্তি না করে এ-বিষয়ে পাকা কথা আমি দিতে পারবো না।

মহারানী তখন বোম্বাই-এ। তাঁর সঙ্গে আলোচনা হ'ল; তিনি জানালেন বরোদা স্টেটটিকে বোম্বাই-এর অন্তর্ভুক্ত করতে তাঁর আপত্তি রয়েছে। তা সত্ত্বেও, মহারাজার যদি সেই রকমই ইচ্ছে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তাঁর বিরোধীতা করবেন না।

তারপরে দীর্ঘ আলোচনা চলল মহারাজার সঙ্গে।

মহারাজা বেশ বুঝতে পারলেন যে রাজত্ব করে আর সুখ নেই, ভবিষ্যতও নেই। এখন সোয়াস্তিই ভাল। শেষ পর্যন্ত ভি-পি-মেননের প্রস্তাবে তিনি রাজি হলেন—কিন্তু গভীর দুঃখের সঙ্গে। ভাবাবেগে তিনি মাঝে-মাঝে ভেঙে পড়তে লাগলেন। তারপরে অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করে দিয়ে তিনি গাইকোয়াড় রাজবংশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

রাজন্য ভাতা হিসাবে ঠিক হল ভারত সরকার তাঁকে বছরে সাড়ে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দেবেন। তবে রাজকোষাগার থেকে তিনি যে অর্থ নিয়েছেন সেই অর্থ যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁকে।

তিনি আরও কথা দিলেন যে জওহরখানার হিসাব তিনি মিলিয়ে দেবেন; রাজবংশের এবং তাঁর নিজের যে সমস্ত মণি-মুক্তা-হীরা-জহরত রয়েছে সেগুলির পৃথক পৃথক তালিকা করবেন। তাছাড়া য়েরোপ আর ভারতে তাঁর যে সব সম্পত্তি রয়েছে সেগুলির জন্যে ট্রাষ্ট তৈরি করে, মহারানী শান্তা দেবী আর তাঁর ছেলেদের উত্তরাধিকারী করে যাবেন।

এর চেয়ে উত্তম প্রস্তাব আর কী রয়েছে?

১৯৪৯ সালের পয়লা মে ভারতের মানচিত্র থেকে বরোদা

স্টেটটি নিশ্চিহ্ন হয়ে বৃহৎ বোম্বাই-এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। মহারাজ প্রতাপ সিং গাইকোয়াড় তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে গেলেন।

তাতেই কি গোলমাল মিটে গেল ?

না ; মিটলো না।

রাজত্বের ঝামেলা মিটলেও, প্রতাপ সিংকে নিয়ে ঝামেলার আর শেষ রইল না।

প্রতিশ্রুতি মত প্রতাপ সিং ঋণের টাকাও শোধ করলেন না ; মণি-মুক্তার হিসাবও দাখিল করলেন না। দিচ্ছি-দেব করে তিনি কেবল দিন কাটাতে লাগলেন।

স্টেট দপ্তর যতই তাঁকে ধরতে যান ততই মহারাজা প্যাঁকাল মাছের মত পিছলে পড়েন।

খবর এল মহারাজা হীরা-মুক্তা তো ফিরিয়ে আনছেনই না, বরং জওহরখানা থেকে আরও মূল্যবান জিনিসগুলি য়েরোপ পাচার করে ছিচ্ছেন। এই ভাবে আর কিছু দিন চললে জওহরখানা ফাঁক হয়ে যাবে। মহারানী তাঁর সন্তানদের নিয়ে পথে বসবেন।

জওহরখানার দরজায় চাবি লাগালো স্টেট দপ্তর ; কড়া চিঠি গেল মহারাজার কাছে—যদি তাড়াতাড়ি হিসাব বুঝিয়ে না দেন তাহলে মুশকিলে পড়বেন।

মহারাজা বললেন : আমাকে আর পাঁচ সপ্তাহ সময় দিন।

এবারে কথা তিনি রেখেছিলেন। কিছু মণি-মুক্তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যে সাত-পাপড়ির হীরের হারটিও ছিল ; তবে সেটি ছিল অঙ্গহীন ; তার একটি পাপড়ি পাওয়া যায় নি। সেটি তৈরি করানোর একবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তার কারণ, ওরকম দক্ষ কারিগর পাওয়া গেল না ; দ্বিতীয়ত, ওটি গড়তে গেলে লাখ-লাখ টাকা খরচ হবে, এবং অনেকদিন সময় লাগবে। এত সময় আর অর্থব্যয় করেও ঠিক আগেকার মত সুন্দর

জিনিস যে তৈরি হবে তেমন কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারল না।

ওই ঘটনার ইতি হল ওইখানে।

সর্দার প্যাটেল তখন বোম্বাই-এ মৃত্যু শয্যায়।

মহারাজ প্রতাপ সিং গাইকোয়াড় নতুন চাল চাললেন।

অতগুলি নতুন স্টেট ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে, সে-সব জায়গাতেই নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়েছিল। নতুন ক্ষমতা হাতে পেয়ে মন্ত্রীরা যে রাতারাতি দক্ষ শাসক হয়ে উঠেছিল সেকথা সত্যি নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের মধ্যে দলাদলি মনোমালিন্যের ফলে বিভিন্ন স্টেটের জমসাধারণ তথাকথিত 'জনপ্রিয়' মন্ত্রীদের ওপরে বিরক্ত হয়েই উঠেছিলেন। কোথাও কোথাও প্রকাশ্য বিক্ষোভও দেখা দিয়েছিল।

এরই সুযোগ নিয়ে কিছু রাজা-মহারাজা তাঁদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করার স্বপ্ন দেখলেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে প্রাক্তন কিছু রাজা মহারাজা বোম্বাই-এ মিলিত হয়ে একটি "শাসক সংঘ" [Rulers' Union] গঠন করার চেষ্টা করলেন।

ব্যাপারটা আন্দাজ করেই স্টেট দপ্তর ভেবে পড়লেন। স্টেট দপ্তরের কর্ণধার সর্দার প্যাটেল ইতিমধ্যে [১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০] বোম্বাই-এ পরলোক গমন করেছেন। স্টেট দপ্তর তখন এন-গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের হাতে। রাজাদের এই ষড়যন্ত্রে ভারত-সরকারের বিব্রত হওয়ারই কথা।

কিন্তু ভি-পি মেনন চুপ করে বসে থাকার পাত্র ছিলেন না। তিনি রাজাদের সঙ্গে আবার আলোচনা করতে বসলেন, এবং ভারতীয় য়ুনিয়নের স্বার্থের পরিপন্থী এই সব ক্রিয়াকলাপের কী বিষময় ফল ফলতে পারে সে-কথা তাঁদের মগজে ঢোকানোর চেষ্টা করলেন।

তাঁর কথায় ভয় পেয়ে অনেকেই পিছু হটে এলেন; কিন্তু কিছু রাজা-মহারাজা তাঁকে গ্রাহ্য না করেই বোম্বাই-এ একটি "শাসক সংঘ"

গঠন করলেন। মহারাজা প্রতাপ সিং গাইকোয়াড় হলেন সেই সংঘের সভাপতি।

সময়টা হল ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস।

শাসক-সংঘটিকে জোরদার করে তোলার জন্যে মহারাজা প্রতাপ সিং বিভিন্ন স্টেটে শিকারের ছলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সে সব জায়গায় তিনি বিভিন্ন রাজা, জমিদার, আর জায়গীরদারদের সঙ্গে গোপনে শলাপরামর্শ করতে লাগলেন। জনসভা করে বক্তৃতাও দিলেন! সঙ্গে যোগ দিলেন যোধপুরের মহারাজা।

তাঁরা ঠিক করলেন পাকিস্তানের সঙ্গে একবার লড়াই বাঁধলেই তাঁরা সবাই এক সঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেন।

ইতিমধ্যে বরোদার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে মহারাজা প্রতাপ সিং স্বয়ং প্রেসিডেনট-এর কাছে আপীল করেছেন। সর্দার প্যাটেল আর তাঁর সাকরেদ ভি-পি-মেনন নাকি জোর ক'রে ভয় দেখিয়ে বোম্বাই-এর সঙ্গে বরোদার অন্তর্ভুক্তির দলিলটি তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছেন। এই অন্তর্ভুক্তির বৈধতার বিরুদ্ধেই প্রেসিডেনট-এর কাছে তিনি আর্জি পেশ করেছিলেন।

তা না হয় করুন। কিন্তু তিনি যে নাটের গুরু সেজে ভারতীয় য়ুনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছেন তার কী হবে?

স্টেট দপ্তর বুঝতে পারলেন এখনই এর একটা বিহিত করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত সরকারকে বিপদে পড়তে হবে।

প্রেসিডেনট ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, স্টেট দপ্তরের মন্ত্রী এন-গোপালস্বামী আয়েঙ্গার সকলেই ভি-পি-মেননের সঙ্গে একমত যে প্রতাপ সিং গাইকোয়াড়ের প্রতাপটিকে ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। তাঁকে এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে আর কোন উচ্চাভিলাষী রাজা মুখ তুলে ঘাস খেতে না পারেন। বোম্বাই-এর তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মোরারজি দেশাই। তিনিও এবিষয়ে ভারত-সরকারের সঙ্গে একমত।

ভারত-সরকারের হাতে পাশুপত অস্ত্র ছিলই। সেই অস্ত্র প্রয়োগ করা হল। ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৬ ধারার ২২নং বিধি অনুসারে প্রতাপ সিং গাইকোয়াড়ের মহারাজা উপাধি কেড়ে নেওয়া হল; তার পরিবর্তে সেই উপাধি দেওয়া হল তাঁর পুত্র যুবরাজ ফতেহ্ সিংকে।

তাতে হল কী?

প্রতাপ সিং সাড়ে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা হিসাবে বার্ষিক যে ভাতা পেতেন সেই ভাতা বন্ধ হয়ে গেল। এখন থেকে নতুন মহারাজা ফতেহ্ সিং পাবেন বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা।

এক অস্ত্রেই রাজারা কুপোকাত। "শাসক-সংঘ" ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এর পরে আর কোন রাজাই মাথা তুলতে সাহস করলেন না।

খেতাব খারিজের নির্দেশটি যথা সময়ে স্যার প্রতাপ সিং গাইকোয়াড়ের হাতে পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। সেই সঙ্গে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল যে এই নির্দেশের বিরুদ্ধে যদি তাঁর কিছু জানানোর থাকে তাহলে তা প্রেসিডেনট-এর কাছে এক মাসের মধ্যে জানাতে হবে।

প্রতাপ সিং প্রেসিডেনট-এর কাছে আপীল করেছিলেন টেস্ট দপ্তরের বিরুদ্ধে।

দীর্ঘ সেই আপীল। সেই আপীলের সারমর্ম হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে।

প্রেসিডেনট যদি তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হন তাহলে সমস্ত ব্যাপারটি বিবেচনার জন্যে ভারতীয় সংবিধানের ১৪৩ ধারা অনুসারে যেন তাঁকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করার অনুমতি দেওয়া হয়।

প্রেসিডেনট সে-অনুমতি দেন নি; কারণ খেতাব-খারিজ করবার পূর্ণ ক্ষমতা ভারত সরকারের রয়েছে।

আর কোন উপায় নেই দেখে মহারাণী শান্তা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতাপ সিং গাইকোয়াড় দিল্লীতে ছুটে এলেন। প্রেসিডেনট,

প্রধানমন্ত্রী, স্টেটদপ্তরের মন্ত্রী সকলের সঙ্গে দেখা করলেন, নিজের দুষ্কর্মের জন্যে অনুতাপ করলেন, আর কখনও ও-রকম কাজ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন ; কয়েকটি প্রভাবশালী বন্ধু এবং উপদেষ্টা যে তাঁকে বিপথে পরিচালিত করেছিল সেকথাও স্বীকার করলেন। মহারানীও অনেক ওকালতি করলেন স্বামীর জন্যে !

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এ-রকম আশ্বাস তিনি অনেক বারই দিয়েছেন ; একবারও তা রাখেন নি। অনেক সুযোগই তিনি পেয়েছেন ; একটিরও সদ্ব্যবহার করেন নি। জুয়াখেলার মধ্যে ভারত-সরকার আর নেই।

মহারাজা প্রতাপ সিং গাইকোয়াড়ের খেল খতম হয়ে গেল।

তাহলেও প্রতাপ সিং-এর ওপরে ভারত-সরকার একেবারে নির্দয় হ'তে পারেন নি। মহারাজা খেতাবটি তুলে নিলেও "হিউ হাইনেস" খেতাবটি তাঁকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল ; তাঁর ভরণপোষনের জন্যেও কিছু ভাতা বরাদ্দ করেছিলেন ভারত সরকার।

মহাভারতের কথা এইখানেই শেষ হল।